কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৪৭
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী
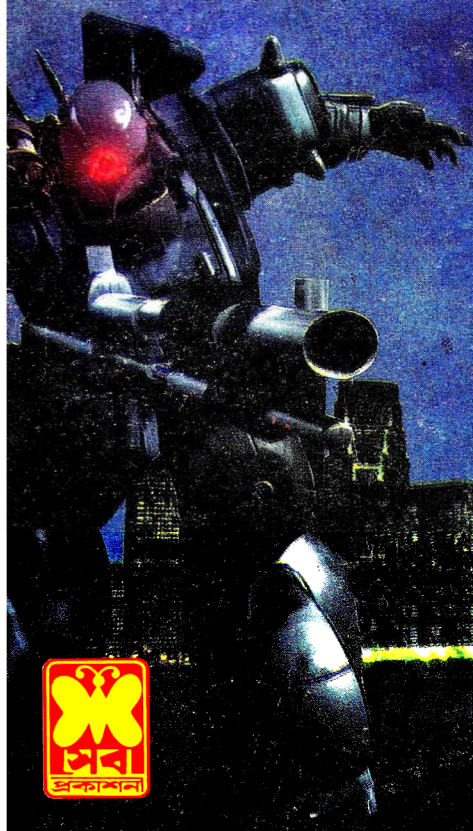
ভলিউম ৪৭

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
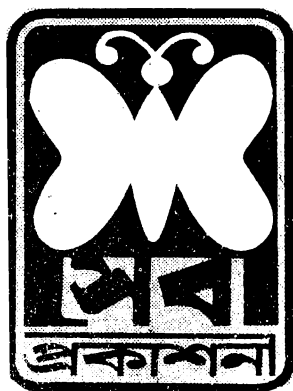
ISBN 984-16-1457-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

উনচল্লিশ টাকা

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-47
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

নেতা নির্বাচন	৫–৫০
সি সি সি	৫১–১১৬
তিন গোয়েন্দার আরও বই: যুদ্ধযাত্রা	১১৭–১৭৬

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১/২.	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	[illegible]/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-

তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২	(ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৩	(পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৪	(কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউন্সভিলে গণ্ডগোল)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৭৫	(কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭৬	(মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৭	(চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৮	(চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর)	৩৭/-

নেতা নির্বাচন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

আমি রবিন বলছি, তিন গোয়েন্দার রবিন মিলফোর্ড। একটা গল্প শোনাই তোমাদের, আমাদের একটা অ্যাডভেঞ্চার আর রহস্যভেদের কাহিনী। তিন গোয়েন্দা গঠিত হয়নি তখনও। আমরা তখন গ্রীনহিলসে থাকি। কিশোররা থাকে রকি বীচে। তবে গ্রীনহিলসে একটা বাড়ি কিনেছেন তার চাচা রাশেদ পাশা, মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে আসে কিশোর। আমাদের বন্ধু হয়ে গেছে।

একবার বড়দিনের সময় ছুটিতে বেড়াতে এল সে। মুসাদের ছাউনিতে কথা বলছি আমরা—আমি, মুসা, ফারিহা আর কিশোর। রহস্য করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব। হঠাৎ বলল, 'ক'দিন পরেই আমার জন্মদিন। ভাবছি এবার সবাইকে উপহার দিতে মানা করে দেব। যার দেয়ার ইচ্ছে, নগদ টাকা দেবে।'

'এই উদ্ভট ইচ্ছের মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

এ কথার জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'আমি যে তোমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি জানি, এটা কি স্বীকার করো?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দিল ফারিহা, 'জানি।'

আমি দ্বিধা করতে লাগলাম।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'তাতে কি?'

'তাতে আমি রহস্যভেদীদের নেতা হওয়ার যোগ্য।'

'কোন্ রহস্যভেদীর কথা বলছ?'

'আমরা। নিজেদের রহস্যভেদী বলতে আর অসুবিধে নেই আমাদের। দু-দুটো জটিল রহস্যের কিনারা করেছি।'

কোন রহস্যের কথা বলছে সে, জানি। বাড়ি পোড়ানো আর বিড়াল উধাও-র রহস্য।

মুসাও জানে। বলল, 'নেতা কিন্তু আমাকে নির্বাচন করা হয়েছিল।'

'হয়েছিল, আমরা তোমাকে ভোট দিয়েছিলাম বলে। দুটো কেসে তো নেতা থাকলে। এখন আমার মনে হচ্ছে, আবার নির্বাচন হওয়া দরকার। আরও মনে হচ্ছে, নেতাটা আসলে আমারই হওয়া উচিত।'

কিশোরের এ ভাবে কথা বলা অনেকের কাছেই ঔদ্ধত্য কিংবা অভদ্রতা মনে হতে পারে, কিন্তু আমি অন্তত সেটা মনে করি না। সহজ কথাটা সরাসরি বলা তার স্বভাব। আমার বরং ভালই লাগে। তাই মুচকি হাসলাম।

কিন্তু মুসা গেল রেগে। বলল, 'এমন কি জানো তুমি যা আমাদের অজানা?'

'অনেক কিছুই অজানা,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'যেমন?'

'এমন কালি দিয়ে লিখতে পারো যেটা দেখা যাবে না, অদৃশ্য থাকবে? তালার ফুটোয় বাইরের দিক থেকে চাবি লাগানো থাকলে ভেতর থেকে সেটা খুলতে পারবে?'

'না, পারব না। তুমিও পারবে না।'

'পারব। অনেক ধরনের সাঙ্কেতিক লেখাও আমি লিখতে পারি, অতি সহজ, অথচ সারা বছর মাথা ঘামালেও সেটার মানে বের করতে পারবে না তুমি। ছদ্মবেশ নিতে জানো? আমি শিওর, তা-ও জানো না। সাধারণ কিছু জিনিস ব্যবহার করে সহজেই বদলে ফেলা যায় চেহারাটাকে, বেশভূষা বদলে নিলে তখন তুমি হয়ে যাবে একেবারে অন্য মানুষ। কেউ চিনতে পারবে না।'

'সাংঘাতিক কাণ্ড!' চোখ বড় বড় করে বলল ফারিহা। 'তুমি শিখেছ এ সব?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল কিশোর। 'ভাল গোয়েন্দা হতে চাইলে এ সব শেখা জরুরী।'

'তাহলে আমাদের শেখাও না!' প্রায় হাত কচলে অনুরোধ করল ফারিহা।

'শেখাতে পারি, এক শর্তে।'

'কী! কী! জলদি বলো?'

'ওই যে বললাম, আমাকে নেতা বানাতে হবে।'

মুসার দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল ফারিহা, 'মুসা, দাও না ওকে নেতা বানিয়ে! অন্তত আগামী একটা রহস্যে কিশোরই নেতা হোক। অসুবিধে কি? কাজ দেখাতে না পারলে দেব ওকে নামিয়ে। আবার তোমাকে নেতা বানাব। ভোট তো আমাদের হাতেই।'

দ্বিধা করতে লাগল মুসা। গাল চুলকাল। বুদ্ধির লড়াইয়ে কিশোরের সঙ্গে পারবে না, বুঝে গেছে আগের দুটো কেসে। গায়ের জোরে বেশিদিন নেতাগিরি করা যায় না, এটাও বুঝেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা কাত করল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে ঠিকঠাক মত সব করতে না পারলে কি ঘটবে, সেটার জন্যেও তৈরি থেকো।'

'তা তো থাকবই,' হেসে বলল কিশোর।

'বেশ, আমার ভোটটা তোমাকেই দিলাম। ফারিহা তো দিয়েই দিয়েছে। রবিন, তোমার কোন আপত্তি আছে?'

মাথা নেড়ে জানালাম, নেই।

কিশোরকে নেতা ঘোষণা করার পর মুসা বলল, 'হ্যাঁ, এইবার শুরু করো। প্রথমেই আসা যাক অদৃশ্য লেখার ব্যাপারে…'

এই সময় মুসার আম্মার ডাক শোনা গেল, 'অ্যাই, কোথায় গেলি তোরা? আয়, চা দেয়া হয়েছে।'

সবাই ছুটে বেরোলাম ছাউনি থেকে। আগে খাওয়া। তারপর অন্য কথা।

গরম গরম স্কোন, স্ট্রবেরির জ্যাম আর কেক। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম আমরা। প্লেটগুলো খালি করে ফেলতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না।

দুই

খাওয়ার পর আবার এসে বসলাম ছাউনিতে।

আসার সময় হাতে করে একটা কমলালেবু আর একটা কাপ নিয়ে এসেছে কিশোর। খোসা ছাড়িয়ে কমলার রসটুকু চিপে বের করে নিল কাপে। বলল, 'ব্যস, হয়ে গেল। লেবু, কমলার রস, এ সব দিয়ে খুব ভাল অদৃশ্য কালি হয়।'

পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বের করে ভেতরের কালি ফেলে দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিল, যাতে নিব থেকে কালির দাগ না পড়ে। তারপর সাদা কাগজ বের করে কমলার রসে নিব চুবিয়ে বলল, 'একটা চিঠি লেখা যাক। কাকে লিখব?'

'ঝামেলা র‍্যাম্পারকটকে,' কোন কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম।

'ঠিক বলেছ। আমিও এ কথাই ভাবছিলাম।'

লিখলঃ

প্রিয় মিস্টার ঝামেলা,

আশা করি পরের রহস্যটার সমাধান অন্য সবার আগে আপনিই করতে পারবেন। তবে সেটা করতে হলে এক কাজ করতে হবে আপনাকে। মগজের জোড়াগুলোতে তেল দিয়ে নিতে হবে। মরচে পড়ে গেছে তো। খালি ক্যাঁচকোঁচ করে। ইতি—

আমরা কয়েকজন
খুদে গোয়েন্দা।

হাসতে লাগলাম আমরা। ফারিহার হাসি তো থামেই না।

লেখার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল কমলার রস। অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফারিহা বলল, 'কই, আর তো পড়া যায় না। বের করবে কি করে?'

মুসার দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'তোমাদের ইস্ত্রিটা নিয়ে এসো।'

'কোনটা আনব? বড়, না ছোট?'

'একটা আনলেই হবে।'

দৌড়ে গিয়ে ইস্ত্রি নিয়ে এল মুসা।

গরম করে সেটা কাগজের ওপর চেপে ধরল কিশোর। সরাতেই দেখা গেল, হালকা বাদামী রঙে আবার লেখাগুলো ফুটেছে। প্রিয় মিস্টার ঝামেলা…

আবার হাসতে শুরু করল ফারিহা।

মুসার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে হেসে বলল কিশোর, 'তাহলে বুঝলে তো, অদৃশ্য লেখা লেখাটা কত সহজ?'

মুসা বলল, 'তা তো দেখলামই। এবার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তালা দিয়ে রেখে আসব তোমাকে। দেখি, কি ভাবে বেরোও?'

'চলো।'

একটা চিলেকোঠায় কিশোরকে নিয়ে চলল মুসা। আমরাও সঙ্গে গেলাম।

ঘরে একটা দরজা আর একটামাত্র জানালা। তা-ও মোটা শিক লাগানো। দরজা বন্ধ থাকলে বেরোনো অসম্ভব। ওই মোটা শিক ভাঙা কিশোরের সাধ্যের বাইরে। আর যদি অলৌকিক শক্তি ভর করে তার শরীরে, ভাঙতে পারেও, তিনতলা থেকে মাটিতে লাফিয়ে নেমে তারপর যেতে হবে ছাউনিতে। মোটকথা, বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখলে বেরোতে পারবে না সে, আমাদের অন্তত সেটাই ধারণা।

কিশোর বলল, 'তালা দিয়ে চাবির ফুটোয় চাবিটা রেখে যেয়ো।'

মুচকি হাসল মুসা। 'তা নাহয় যাব। তবে সেটা নিতে হলে কার্টুন বনতে হবে তোমাকে। হাতটাকে তার বানিয়ে দরজার নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর চাবিটা খুলে আনতে হবে।'

মৃদু হাসল কিশোর। জবাব দিল না।

তাকে তালা দিয়ে নেমে এসে আবার বাগানের ছাউনিতে ঢুকলাম আমরা।

হেসে বলল মুসা, 'এইবার তার জারিজুরি খতম। দশ মিনিটের মধ্যেই নামিয়ে আনার জন্যে চিল্লানো শুরু করবে।'

চিৎকার না করলেও বেরোতে যে পারবে না, আমার সে-রকমই ধারণা হলো। তবে ফারিহা স্থির নিশ্চিত, বেরিয়ে চলে আসবে। কিশোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

দশ নয়, পাঁচ মিনিটের মাথায় ছাউনিতে দেখা গেল কিশোরের হাসিমুখ।

হাঁ হয়ে গেলাম আমি আর মুসা।

হাততালি দিয়ে হেসে উঠল ফারিহা, 'কি, বলেছিলাম না!' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, কি করে বেরোলে? জাদু জানো?'

'হ্যাঁ, জাদুই।'

মুখ গোমড়া করে মুসা বলল, 'এখন তুমি আমাদের নেতা। আমরা কিছু জানতে চাইলে তোমার জবাব দেয়া উচিত। কি করে বেরোলে?'

'এসো আমার সঙ্গে।'

আবার আমাদেরকে চিলেকোঠায় নিয়ে এল কিশোর। আমাকে আর ফারিহাকে ভেতরে থাকতে বলে মুসাকে বলল বাইরে থেকে আবার দরজার তালা আটকে দিতে।

আটকে দিল মুসা।

আমি আর ফারিহা দেখতে লাগলাম কিশোর কি করে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে, 'আটকা পড়েছি আমরা, তাই মনে হচ্ছে না? ধরে নেয়া যাক এটা একটা বিপদ। প্রথমে কি করতে হবে? মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।' একটা পুরানো খবরের কাগজ পড়ে আছে ঘরের কোণে। সেটা তুলে এনে ছড়িয়ে বিছাল মেঝেতে। তারপর দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে ঠেলে দিল বাইরে। পকেট থেকে সরু একটুকরো তার বের করে তালার ফুটোতে ঢুকিয়ে দিল। আলতো ঠেলা দিতেই চাবিটা খুলে পড়ে গেল কাগজের ওপর। কাগজটা কয়েক ভাঁজ করা থাকায় শব্দ হলো না। আস্তে করে টেনে তখন কাগজটা ভেতরে টেনে নিয়ে এল সে। চাবিটা পড়ে আছে তার ওপর। হাসিমুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে একবার

চোখ টিপল। চাবি দিয়ে দরজা খুলে বেরোল।

আমাদের মতই মুসাও হাঁ হয়ে গেছে।

কিশোর বলল, 'কায়দাটা আমি প্রথম আবিষ্কার করেছি স্কুলে। একটা ছেলে ঝগড়া করে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে আটকে রেখেছিল। আমার চেয়ে অনেক বড় হওয়াতে গায়ের জোরে তার সঙ্গে পারিনি। তালা লাগিয়ে চাবিটা ফুটোতে ফেলে গিয়েছিল দারোয়ানের চোখে পড়ার জন্যে, আমার চিৎকার শুনে যাতে খুলে দিতে পারে সে। বুঝতেই পারছ, দারোয়ান আসার অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম আমি।'

তিন

দু-দিন পর কিশোরের জন্মদিন। গ্রীনহিলসের বাড়িতেই পার্টি দেবে। আমাদের সবাইকে দাওয়াত করে গেল সে।

কিশোরের জন্মদিন। আমাদেরও অনেক মজা। দল বেঁধে গিয়ে হই-চই করে এলাম। উপহার দিলাম নগদ টাকা, সবাইকেই টাকা দিতে বলে দিয়েছে সে।

তার পরদিন এসে জানাল, হলিউডে যাচ্ছে, তার এক নানীর বাড়িতে। মেরিচাচীর খালা তিনি। সুতরাং কিশোরের নানী। আসতে দু-একদিন লাগবে। ইতিমধ্যে রহস্যের সন্ধানে থাকতে বলল আমাদের।

কিশোর চলে গেল।

রহস্যের সন্ধানে রইলাম আমরা।

দু-দিন পরও ফিরল না কিশোর। ভালই বেড়াচ্ছে নানীর বাড়িতে।

তৃতীয় দিনের দিন সকালে বাগানের ছাউনিতে বসে আছি আমরা। কিশোরের কথাই আলোচনা করছি। তার এই অনুপস্থিতি ভাল লাগছে না। কোন রহস্যও পাচ্ছি না যে তাতে মন দেব।

হঠাৎ বাইরে থেকে মুসার আম্মার ডাক শোনা গেল, 'কইরে, কোথায় গেলি তোরা? দেখ, কে এসেছে।'

অবাক হলাম। কে আবার এল? তাড়াতাড়ি বেরোলাম।

দেখি আন্টির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে একটা অচেনা ছেলে। চেহারাটা মোটেও ভাল না। ওপরের পাটির দুটো দাঁত খরগোশের দাঁতের মত বেরিয়ে নেমে এসেছে নিচের ঠোঁটের ওপর। নরম একধরনের বিদেশী টুপির নিচ থেকে বেরিয়ে আছে লম্বা লম্বা পাটের আঁশের মত চুল। গায়ে ঢোলা পোশাক। আমাদের দেখে এক পা এগোল। খুঁড়িয়ে হাঁটে। মনে হলো একটা পায়ে খুঁত আছে, নষ্ট।

আন্টি বললেন, 'এই ছেলেটা কিশোরের খবর নিয়ে এসেছে। ইংরেজি ভাল বোঝে না। কথা বলো।'

চলে গেলেন তিনি।

হাত বাড়িয়ে দিল মুসা, 'আমি মুসা আমান। তমি?'

'ফগরফ টগরফ গাট,' মুসার হাত ধরল ছেলেটা।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমরা। এ কি রকম নাম হলো? কোন দেশী? ইয়োরোপের কোনও দেশ?

আমার আর ফারিহার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কিশোরের কি খবর? ও কোথায়?'

পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিল ফগরফ টগরফ গাট। ইয়ে, শুধু গাটই বলা যাক, অত জটিল নাম বার বার বলতে গেলে দম ফুরিয়ে যাবে।

চিঠিটা পড়ার জন্যে ঝুঁকে এলাম আমরা সবাই। কিশোর লিখেছে, নানী কিছুতেই আসতে দিচ্ছেন না তাকে। আরও দু-চার দিন দেরি হতে পারে।

দমে গেল মনটা। কিশোরকে ছাড়া ভাল লাগে না। সে না থাকলে যেন রহস্যও হাজির হতে চায় না।

কয়েকটা প্রশ্ন করল মুসা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজির সঙ্গে অন্য কোন একটা ভাষা মিশিয়ে এমন সব জবাব দিল গাট, প্রায় কিছুই বুঝলাম না। এখানে কার সঙ্গে এসেছে, উঠেছে কোথায় জিজ্ঞেস করা হলো। জানলাম, একাই এসেছে, বেড়াতে। কিশোরদের বাড়িতে উঠেছে, তার বন্ধু। থাকবে কয়েকদিন।

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গাট। পা টেনে টেনে এগোল গেটের দিকে।

ফারিহার মন খুব নরম। ছেলেটার দুরবস্থায় যেন কেঁদেই ফেলবে। বলল, 'ওর পা-টা নষ্ট হলো কি করে, বলো তো?'

'কি করে বলব?' হাত উল্টে জবাব দিল মুসা। 'জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু যদি আরও দুঃখ পায় সে-জন্যে করলাম না।'

'ভালই করেছ,' আমি বললাম।

বাগানে বসে কিশোর আর গাটকে নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম আমরা।

রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে আন্টি ডাকলেন, 'অ্যাই, কিশোর ফোন করেছে! জলদি আয়!'

খানিক আগে চিঠি, আবার ফোন! বুঝলাম, বেচারা কিশোরও আসার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে। আমাদের জন্যে তারও মন খারাপ। তাড়াতাড়ি ছুটলাম ফোন ধরার জন্যে।

তিনজনেই ড্রয়িং রুমে এলেও ফোনটা আমিই ধরলাম।

শোনা গেল কিশোরের উল্লসিত কণ্ঠস্বর, 'হালো। চিনতে পারো?'

'পারব না কেন? কোত্থেকে করেছ?' উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'গ্রীনহিলস থেকে।'

ক্ষণিকের জন্যে কথা হারিয়ে ফেললাম। তোতলাতে শুরু করলাম, 'এ-এ-এই তো একটু আগে…'

'ফগরফ টগরফ চিঠি নিয়ে গেছে তো? কাল রাতে দিয়েছিলাম ওকে। সকালে উঠেই নানীকে একটা চিঠি লিখে রেখে পালিয়েছি। একা একা ভাল লাগে না।'

খুশি হলাম। বললাম, 'খুব ভাল করেছ। বসে আছ কেন? চলে এসো এখুনি।'

না, এখন আসতে পারছি না। একটা কাজ আছে। তারচেয়ে বরং বিকেলে

তোমরা চলে এসো, চায়ের দাওয়াত। গাটও থাকবে। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, কোন রহস্য পেয়েছ?'

নিরাশ কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'না।'

'হুঁ। ঠিক আছে, মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যখন রহস্য পাওয়া যায় যাবে। বিকেলে তাহলে আসছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। গুডবাই।'

লাইন কেটে দিল কিশোর।

চার

সেদিন বিকেলে মুসা আর ফারিহাকে নিয়ে কিশোরদের বাড়িতে রওনা হলাম। বাড়ির কাছে এসে দেখতে পেলাম গেটের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে গাট। পুলিশ কনস্টেবল ঝামেলা র‍্যাম্পারকটের সঙ্গে কথা বলছে।

তাড়াতাড়ি পা চালালাম কি বলে শোনার জন্যে।

কাছে পৌঁছে দেখি ঝামেলার হাতে একটা খাম। খামটা চেনা লাগল। আমাদের সাড়া পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েই মহাবিরক্তিতে কুঁচকে ফেলল ভুরু, বলল, 'আহ্, ঝামেলা!' কিন্তু 'যাও, ভাগো!' বলার সাহস করতে পারল না। বোধহয় ভয়, আবার যদি ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে বলে দিই?

আমাদেরকে পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গি করে গাটের দিকে তাকাল ঝামেলা, 'এই চিঠি কে দিয়েছে তোমাকে?'

খরগোশ-দাঁত দুটো সামনে ঠেলে দিল গাট। মোলায়েম হাসি হেসে ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'একটা ছেলে। চিনি না। আমি নতুন এসেছি তো এখানে। দিয়ে বলল, মিস্টার কটকে দিতে...'

'আমার নাম ফগর‍্যাম্পারকট,' শুধরে দিল ঝামেলা। খামটা খুলল। ভেতর থেকে বেরোল সাদা একটুকরো কাগজ। উল্টেপাল্টে দেখল সে। কুঁচকে কাছাকাছি হয়ে গেল ভুরুজোড়া। 'আমার সঙ্গে রসিকতা! পুলিশের সঙ্গে! জানো, এর ফল কি হবে? জলদি বলো, কে দিয়েছে এটা?'

চিনে ফেললাম কাগজটা। সেদিন কিশোর যে চিঠিটা লিখেছিল কমলার রস দিয়ে, সেটা।

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না,' নিরীহ স্বরে বলল ছেলেটা। আবার খরগোশ-দাঁত দেখাল। 'ইংরেজি ভাল বুঝি না। সাদা কাগজ? মনে হয় কোন রহস্য। আমাদের দেশে এ রকম সাদা কাগজ খুব বড় রহস্য।'

'রহস্য' শব্দটা ধাক্কা দিল ফগকে। সতর্ক হয়ে গেল। অচেনা একটা ছেলে, রহস্যময় চিঠি, সেই সঙ্গে আমাদের উপস্থিতি সুবিধের মনে হলো না তার কাছে। তাকিয়ে আছে সাদা কাগজটার দিকে।

মাথা দুলিয়ে বলল, 'হুঁ, কোন গোপন মেসেজ থাকতে পারে এতে। কে দিয়েছে বললে না?'

'বললামই তো। একটা ছেলে। চিনি না···'

'হুঁ। অদৃশ্য কালিতে লেখা হতে পারে। দেখব।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল ফারিহা। 'ও বুঝে ফেলেছে! লেখাটা যখন পড়বে···'

'চুপ!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল মুসা।

অনেক কথা বলেছে। এবার যেতে হবে। টুপি খুলে মাথা সামান্য নুইয়ে জাপানী কায়দায় ঝামেলাকে বাউ করল গাট। আমার আর মুসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে যেত।

এই যেন প্রথম দেখতে পেল আমাদের। অবাক হলো। 'ও, তোমরা। চায়ের দাওয়াত পেয়েছ? এসো।'

আমাদের সোজা কিশোরের ঘরে নিয়ে এল গাট।

কিশোরকে দেখলাম না।

ও কোথায়, জানতে চাইল ফারিহা।

'এখানেই,' জবাব দিল গাট।

ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগলাম আমরা। কই, কোথায়? পাগল নাকি ছেলেটা?

'পাগল ভাবছ?' যেন আমার মনের কথা পড়ে ফেলল গাট। 'দাঁড়াও, ওকে বের করে আনছি।'

টুপিটা ছুঁড়ে ফেলল বিছানায়। একটানে খুলে ফেলল মাথার পাটের আঁশের মত পরচুলা। খরগোশ-দাঁত দুটো টেনে টেনে খুলল।

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

চিৎকার করে উঠল ফারিহা, 'কিশোর, তুমি!'

হাসছে কিশোর। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, আমি। কেমন ছদ্মবেশ নিলাম? ঝামেলাও চিনতে পারল না।'

'কিশোর···তুমি···তুমি একটা সাংঘাতিক ছেলে···' প্রশংসা করতে গিয়ে কথা আটকে যেতে লাগল ফারিহার।

আমরা আর কি বলব? তাকিয়ে রইলাম চুপ করে।

কিশোর বলল, 'জন্মদিনে কেন টাকা নিয়েছি এখন বুঝতে পারছ?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

মুসা বুঝল না। জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ছদ্মবেশের জন্যে এ সব জিনিস কিনতে,' জানাল কিশোর।

'কিনে এনে কি গোলটাই না দিলে আমাকে···' রাগে ক্ষোভে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে মুসার, বুঝতে পারছি। কিশোরের কাছে এ ভাবে বোকা বনাটা তার মোটেও ভাল লাগেনি।

তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বললাম, 'শুধু তুমি কেন, আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে ও। ঝামেলাকেও বাদ দেয়নি।'

'কাজটা কিন্তু ঠিক হয়নি, বুঝলে,' মুসা বলল। 'চিঠিটা পড়ে ভীষণ খেপে যাবে

সে। বুঝে ফেলবে কার কাজ। ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে না ভরলেও মাকে বলে দিতে পারে। আমার ভয়ই লাগছে।'

হাসি উধাও হয়ে গেল ফারিহার মুখ থেকেও। তার মাথায়ও ঢুকেছে এতক্ষণে। 'খালা বকতে বকতেই মেরে ফেলবে আমাদের!'

ঝোঁকের মাথায় বোকামিটা করে ফেলে এখন কিশোরও চিন্তিত হলো। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। 'হুঁ, কাজটা ভাল হয়নি। ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে দেখালে তিনিও ভালভাবে নেবেন না। আমার চাচীও রেগে যাবে। তবে ফগের মুখের কথায় কাজ হবে না, প্রমাণ দেখাতে হবে। না পারলে বেঁচে যাব। চিঠিটা আবার ফেরত আনা দরকার।'

'কি করে আনব?' মুসার প্রশ্ন।

'আবার কেউ ছদ্মবেশ পরে নিয়ে…'

শুরুতেই বাধা পেল কিশোর, মুসা বলে উঠল, 'না বাপু, আমি পারব না! বাপরে বাপ, ঝামেলা চিনে ফেললে সোজা কান-ধরে নিয়ে যাবে মা-র কাছে।'

'আমিও ঝামেলার সামনে যেতে পারব না!' ফারিহা বলল।

আমারও সাহস নেই। জানালাম সে-কথা।

'বেশ,' কিশোর বলল, 'তোমরা কেউই যখন পারবে না, আমিই যাব, যাও। আবার নেব ছদ্মবেশ। ওই চিঠি আমি ফেরত আনবই।'

পাঁচ

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করে আনবে?'

'নিয়ে আসব এক ভাবে না এক ভাবে। উপায় একটা বেরোবেই।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল কিশোর। রান্নাঘর থেকে গিয়ে একটা কমলা নিয়ে এল। একটুকরো সাদা কাগজ ছিঁড়ে নিল, প্রথম চিঠিটার জন্যে যত বড় করে নিয়েছিল ঠিক সেই মাপে। কমলার রস দিয়ে তাতে লিখল:

প্রিয় মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,

আশা করি পরের রহস্যটার সমাধান আমাদের আগে আপনিই করতে পারবেন। গত দুটো কেসে আপনার সঙ্গে কাজ করে বুঝেছি, অনেক বুদ্ধি আপনার। কি, চ্যালেঞ্জটা নিতে আপত্তি আছে? ধন্যবাদ, এবং অনেক শুভেচ্ছা। ইতি—

আমরা কয়েকজন
খুদে গোয়েন্দা।

চিঠি পড়ে তো চোখ আমাদের কপালে। এ-কি!

বুঝিয়ে দিল কিশোর।

দৃশ্যটা কল্পনা করেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম আমরা।

আবার গাটের ছদ্মবেশ নিল সে। চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপরে সে এক

মজার ঘটনা। পরে এসে বলেছে আমাদের।

অচেনা ছেলেটার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে সোজা বাড়ি চলে গেল ফগ। ইস্ত্রি গরম করে চেপে ধরল কাগজে। ফুটে উঠল বাদামী লেখা। পড়ে রাগে কাঁই হয়ে গেল সে। বুঝে গেল, কাদের কাজ।

রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে চিঠিটা নিয়ে মুসাদের বাড়ি রওনা হলো সে। মুসার আম্মাকে দেখানোর জন্যে। কারণ ইতিমধ্যে বুঝে গেছে, আমাদের সবার বাবা-মায়ের মধ্যে কার মা সবচেয়ে কড়া, কার কাছে বিচার দিলে শাস্তিটা বেশি কঠোর হবে।

ফগের অপেক্ষাতেই তার বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করছিল কিশোর।

তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল ফগ। ওই তো, সেই খরগোশ-দেঁতো ছোকরা! যে তাকে চিঠিটা দিয়েছে। গটমট করে এগোল তার দিকে। কড়া গলায় ডাকল, 'অ্যাই, শোনো! ঝামেলা!'

এগিয়ে এল গাট। 'কিসের ঝামেলা?'

আরও রেগে গেল ফগ। 'কিসের ঝামেলা বুঝবে! আগে গিয়ে নিই মুসাদের বাড়ি!' চিঠিটা দেখিয়ে বলল, 'এতে কি লেখা আছে জানো?'

'দেখি তো?' কৌতূহলী হয়ে ওটা হাতে নিল গাট। নিরীহ ভঙ্গিতে উল্টেপাল্টে দেখার ভান করল। বলল, 'কই, কিছু তো নেই। সাদা কাগজ।'

'কে দিয়েছে জলদি বলো!' ধমকে উঠল ফগ।

'বললাম যে চিনি না।'

'ঝামেলা! দেখি দাও!' চিঠিটা ফেরত নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল ফগ।

দমকা বাতাস বয়ে গেল একঝলক। হাত থেকে কাগজটা ছেড়ে দিল কিশোর। উড়ে গিয়ে একটা ঝোপের ডালে আটকে গেল ওটা।

দৌড় দিল সে। কাগজটা আবার উড়ে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলল। পকেটে রেখে দিয়ে দ্বিতীয় চিঠিটা বের করে ফেলল চোখের পলকে। ফগ দেখতে পেল না কিছু।

ফিরে এসে কাগজটা বাড়িয়ে ধরতেই ছোঁ মেরে নিয়ে খামে ভরল ফগ। আর কিছু না বলে হনহন করে হাঁটা শুরু করল।

মুচকি হাসল কিশোর। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। এত সহজে হয়ে যাবে কাজটা ভাবেনি।

তাহলে মুসাদের বাড়ি যাচ্ছ তুমি ঝামেলা মিয়া, ভাবল সে। দাঁড়াও, আমিও আসছি।

ছদ্মবেশের উপকরণগুলো খুলে একটা ঝোপে লুকিয়ে রেখে সে-ও মুসাদের বাড়ি চলল।

হলঘরে ঢুকে শুনল, মুসার আম্মাকে একটা ইস্ত্রি আনার অনুরোধ করছে ফগ। কিশোরকে দেখে তিনি বললেন, 'তুমি? মুসাকে খুঁজতে এসেছ? সে তো বাড়ি নেই।...এসেছ, ভাল হয়েছে। বোসো। তোমাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছেন মিস্টার র‍্যাম্পারকট...'

'ফগর‍্যাম্পারকট,' শুধরে দিল ফগ।

'ওহ্, সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট।'

ইস্ত্রি আনতে চলে গেলেন তিনি।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল ফগ। ফুলে থাকা ভুরু প্রায় উরুর ওপর নেমে এসেছে। বিশাল দুই থাবা রেখেছে উরুতে। কথা বলল না। ভঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিল, শয়তানীর ফল পাবে এখনি!

ইস্ত্রি এল। গরম করে কাগজটায় চেপে ধরল ফগ। লেখা ফুটলে না পড়েই বাড়িয়ে দিল মুসার আম্মার দিকে, 'নিন, পড়ুন।'

পড়লেন মিসেস আমান, 'প্রিয় মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আশা করি পরের রহস্যটার সমাধান আমাদের আগে আপনিই করতে পারবেন। গত দুটো কেসে আপনার সঙ্গে কাজ করে বুঝেছি, অনেক বুদ্ধি আপনার। কি, চ্যালেঞ্জটা নিতে আপত্তি আছে? ধন্যবাদ, এবং অনেক শুভেচ্ছা। ইতি—আমরা কয়েকজন খুদে গোয়েন্দা।' ফগের দিকে তাকালেন, 'কই, ভাল কথাই তো লিখেছে। আপনি না বললেন খারাপ কথা?'

কোলাব্যাঙের চোখের মত হয়ে গেল ফগের চোখ, ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন। বিমূঢ়ের মত চিঠিটা মিসেস আমানের হাত থেকে নিয়ে পড়ল। বিশ্বাস করতে পারছে না। বিড়বিড় করল, 'ঝামেলা! প্রথম চিঠিটা তাহলে গেল কোথায়?'

হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, মনে হয় রহস্য একটা পেয়ে গেছেন?'

জবাব খুঁজে পেল না ফগ।

মিসেস আমানও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন।

উঠে দাঁড়াল ফগ। পালাতে পারলে এখন বাঁচে। আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে···সরি, মিসেস আমান! বিরক্ত করলাম। চলি, গুড-বাই। ঝামেলা!'

ফগের ব্যবহারে মিসেস আমানও অবাক হলেন। কিছু বুঝতে পারলেন না।

কিশোরও উঠে দাঁড়াল। প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চায় না। আন্টি জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে বলতে পারবে না। হলঘরে বিস্মিত ভদ্রমহিলাকে রেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল সে।

রাস্তায় বেরিয়ে ফগকে অনুসরণ করল।

যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই। ওদের বাড়িতেই চলেছে ফগ। নিশ্চয় গাটের ব্যাপারে খোঁজ নেবে।

হলঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পাতল কিশোর।

ঘরেই আছেন মেরিচাচী।

কুশল বিনিময়ের পর ফগ জিজ্ঞেস করল, 'সেই বিদেশী ছেলেটা কোথায়, মিসেস পাশা?'

'কোন বিদেশী ছেলে?' আকাশ থেকে পড়লেন যেন মেরিচাচী।

'ঝামেলা!···নামটা বিদঘুটে। ফগরফ টগরফ গাট। আপনাদের এখানে বেড়াতে এসেছে যে। দুটো দাঁত খরগোশের দাঁতের মত···'

'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। এখানে কোন বিদেশী ছেলে বেড়াতে আসেনি। একটাই ছেলে আছে এ বাড়িতে, আমার ছেলে কিশোর।'

ফগর‍্যাম্পারকটের ঠোঁট কেমন ০-এর মত গোল হয়ে গেছে কল্পনা করে নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল কিশোর।

'ও, কোন ছেলেই নেই তাহলে?'

'না। অন্য কোন ঠিকানা দেয়নি তো? ভুল শুনে আপনি হয়তো...'

'না, না, আমি ভুল শুনিনি। এ বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকতেও দেখেছি।'

'অবাক কাণ্ড! কে ছেলেটা?'

সামলে নিল ফগ। 'যে-ই হোক, তাকে আমি খুঁজে বের করবই। বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মিসেস পাশা...'

'না না, বিরক্ত আর কি?'

মেরিচাচীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বিড়বিড় করে বার দুই 'ঝামেলা! ঝামেলা!' করে বেরোনোর জন্যে দরজার দিকে এগোল ফগ। চট করে সরে গেল কিশোর।

ছয়

এতক্ষণ কিশোরের ঘরেই বসে ছিলাম আমরা।

সে ফিরে এসে সব কথা জানাল। শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড় আমাদের, চোখের পানি গড়াতে লাগল গাল বেয়ে। সবচেয়ে বেশি হাসছে মুসা। গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে।

কিছুই বুঝতে না পেরে টিটুও হাসিতে যোগ দিল কুকুরের ভাষায় ঘাউ ঘাউ করে। সারা ঘর দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। গালমুখ চেটে দিতে লাগল আমাদের।

হাসি কিছুটা কমে এলে কিশোর বলল, 'একটা জটিল রহস্য পেয়ে গেছে এখন ফগ। মাথা ঘামাবে এটা নিয়ে।'

'তা তো হলো,' টিটুর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে ফারিহা বলল, 'আমাদেরও তো একটা রহস্য দরকার।'

'যতদিন না পাই এ সব করেই কাটাব,' কিশোর বলল। 'গোয়েন্দা-গিরি প্র্যাকটিস করব। সেটাও কম মজা নয়।'

'তা বটে,' একমত হলাম আমরা সবাই।

'এক কাজ করা যাক,' প্রস্তাব দিল মুসা, 'আমরাও ছদ্মবেশ ধরি এক এক করে। ঘুরে আসি গাঁয়ের ভেতর থেকে। লোকের আচরণ দেখি।'

'তা দেখতে পারো। মন্দ হবে না,' কিশোর বলল। 'এখনই যেতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'বেশ, এসো, তোমাকে সাজিয়ে দিই।...ওহ্হো, জিনিসগুলো তো ফেলে এসেছি ঝোপের মধ্যে। বোসো তোমরা, আমি নিয়ে আসিগে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল কিশোর।

সাজিয়ে দিতে লাগল মুসাকে। পাটের আঁশের মত চুলওয়ালা পরচুলাটা

পরাল। ঘন একজোড়া ভুরু বের করে লাগিয়ে দিল। কোণদুটো ছবিতে দেখা শয়তানের ভুরুর মত ওপরে তোলা। খরগোশ-দাঁত দুটো কি করে লাগাতে হয় দেখিয়ে দিল।

লাগাল মুসা।

'দেখি, তাকাও তো?' এদিকে ফিরতে বলল কিশোর।

কিম্ভূত চেহারার এক নিগ্রো ছেলেতে পরিণত হয়েছে মুসা। ভয়ই লাগে দেখলে। ঘাউ ঘাউ করে হাঁক ছাড়তে শুরু করল টিটু। মুসার এই চেহারা তার পছন্দ হচ্ছে না।

ফারিহা বলল, 'অমাবস্যা রাতে তুমি এই চেহারা নিয়ে আমার সামনে এসো না! বাপরে বাপ! কি সাংঘাতিক!'

'এতটাই খারাপ? দেখি তো,' আয়নার কাছে এগিয়ে গেল মুসা। একবার তাকিয়েই আঁতকে উঠল, 'খাইছে! আমিই তো? নাকি তেঁতুল গাছের ভূত!'

'ভূতের চেয়ে খারাপ,' হাসতে হাসতে বললাম।

'যাই, ঘুরে আসিগে। গাঁয়ের শয়তান ছেলেগুলোকে খানিকটা ভয় দেখানো যাবে।'

'দেখো, ফগের সামনে পড়ো না যেন,' সাবধান করে দিল কিশোর। 'এই দাঁতের ওপর নিশ্চয় এখন সন্দেহ জেগেছে তার। তা ছাড়া গাঁয়ে এখন তোমার চেহারা অচেনা। চোখে পড়লেই এসে ক্যাঁক করে ধরবে সে।'

কিন্তু মুসার ভাগ্য খারাপ, একেবারে ফগের সামনেই গিয়ে পড়ল সে। কিংবা বলা যায় ফগ এসে পড়ল তার পেছনে।

হঠাৎ করেই খারাপ হয়ে গেল আকাশটা। কুয়াশা পড়তে লাগল। সুতরাং গাঁয়ের পথে কারও দেখা পেল না মুসা। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল একটা বাড়ির কাছে।

মোড় নিতেই পড়ে গেল এক বুড়ির সামনে। কুয়াশার মধ্যে তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল বুড়ি। একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে 'মাগো! বাবাগো!' করে দিল দৌড়। কাকতালীয় ঘটনা। পড়ল গিয়ে ফগের গায়ের ওপর। ওই পথ ধরেই আসছিল তখন কনস্টেবল।

কি হয়েছে জিজ্ঞেস করল ফগ।

হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ি বলল, 'সাংঘাতিক এক লোক! আমি তো ভূতই মনে করেছিলাম! মানুষের এমন দাঁত জনমে দেখিনি! খরগোশের মত...'

আর শোনার অপেক্ষা করল না ফগ। এই রকম দাঁতওয়ালা ছেলেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। দৌড়ে এল।

বুড়িকে ভয় পাইয়ে দিয়ে হাসছিল মুসা। মোড়ের ওপাশ থেকে স্বয়ং ফগ বেরোবে কল্পনাই করেনি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আরও বেশি করে বেরিয়ে পড়ল বড় বড় দুটো দাঁত।

গাটকে আশা করেছিল ফগ। তার বদলে দেখল কালো আরেকটা ছেলেকে। চমকে গেল। পরক্ষণেই থাবা মেরে চেপে ধরল মুসার ম্যাকিনটশের পিঠ, 'ঝামেলা! অ্যাই, কে তুমি?'

ম্যাকিনটশের চেন খোলা। ওটা ছাড়াতে পারবে না বুঝে মুচড়ে মুচড়ে গ থেকেই খুলে ফেলল মুসা। তারপর দিল দৌড়।

একটা মুহূর্ত যেন বোকা হয়ে ম্যাকিনটশটার দিকে তাকিয়ে রইল ফগ। তারপর সে-ও দৌড় দিল ছেলেটাকে ধরার জন্যে।

ক্রমেই ঘন হচ্ছে কুয়াশা। দশ হাত দূরের জিনিসও আর দেখা যায় না এখন। রাস্তা থেকে নেমে পাহাড়ের দিকে ছুটল মুসা। পেছনে দুপদাপ করে তেড়ে আসছে ভারি বুট পরা ফগ।

ছোট পাহাড়টা ডিঙিয়ে অন্য পাশে একটা বাড়ি চোখে পড়ল মুসার। পাতাবাহারের বেড়ার আড়ালে লুকানো যায় কিনা ভাবতে ভাবতে সেদিকে দৌড়ে চলল।

গেটের কাছাকাছি এসে চিনতে পারল বাড়িটা। অনেক পুরানো। আগের বার যখন এদিকে এসেছিল, কোন লোক দেখেনি। খালি পড়ে ছিল।

গেট দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল সে। লম্বা গাড়িপথ ধরে ছুটল।

তাকে ঢুকতে দেখল ফগ, কিন্তু ভেতরে ঢুকে হারিয়ে ফেলল। কুয়াশার মধ্যে ছেলেটা কোনদিকে গেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। এত ভারি শরীর নিয়ে মুসার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এতদূর যে আসতে পেরেছে, এই বেশি।

বাড়িটা ঘুরে পেছনের একটা বাগানে চলে এল মুসা। অযত্নে বেড়ে উঠেছে গাছপালা। বেড়ার কাছে লুকানোর চেয়ে গাছে উঠে পড়াটা ভাল মনে করল সে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল একটা গাছ বেয়ে।

বাড়ির কোণে দেখা দিল ফগ। গাছের ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছে মুসা। এতক্ষণে খেয়াল করল, ভুল গাছে উঠেছে। শীতে বেশির ভাগ পাতাই ঝরে গেছে গাছটার। ওপর দিকে ভাল করে তাকালে দেখে ফেলবে ফগ। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই। ভরসা কেবল কুয়াশা, আর এলোমেলো ডালপালা।

বাড়িতে লোকজন নেই, তাই বাঁচোয়া—ভাবল সে। নইলে কি হয়েছে দেখার জন্যে হুড়মুড় করে বেরিয়ে চলে আসত এতক্ষণে।

কাঠবিড়ালীর মত করে একটা ডাল আঁকড়ে ধরে ওটার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে। ডালটা ওপরতলার একটা জানালা বরাবর। শিক লাগানো।

ব্যাপারটা অবাক করল তাকে। এ ধরনের বাড়িতে সাধারণত জানালায় শিক থাকে না। তবে বাচ্চাদের ঘরে অনেক সময় লাগিয়ে দেয়া হয় নিচে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। কিন্তু ভেতরের জিনিসপত্র দেখে তো বাচ্চাদের মনে হচ্ছে না।

ধাক্কাটা হঠাৎ এল। জিনিসপত্র! লোকজন নেই, আসবাবপত্র থাকার কথা না। অথচ ঘরে প্রচুর জিনিস! সাজানো-গোছানো! এক ঘরের জিনিসের কথা ভুলে বাকি সব ঘরেরগুলো নিয়ে চলে গেছে লোকে? অবিশ্বাস্য! এ হতে পারে না।

সন্দেহ হতে লাগল মুসার, পুরানো খালি বাড়িটাতেই এসেছে তো? নাকি কুয়াশার মধ্যে ভুলে অন্য কোনও বাড়িতে ঢুকে পড়েছে? ভীষণ কৌতূহল হতে লাগল। ভালয় ভালয় এখন ফগ চলে গেলেই হয়, বাড়িটা ঘুরে দেখে যাবে একবার।

খুঁজে বেড়াচ্ছে ফগ। চারপাশ ঘিরে এমন করে পাতাবাহারের বেড়া, সেটা ভেদ করে কারও বেরোনো সম্ভব নয়। বাকি রইল গেট। সেটা দিয়ে যে বেরোয়নি ছেলেটা এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। তাহলে গেল কোথায়? একটি বারের জন্যেও গাছের ওপর তাকানোর কথা ভাবল না সে।

হাল ছেড়ে দিল অবশেষে। কোন ভাবে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে ছেলেটা ভেবেই ধীর পায়ে বাড়ির কোণের দিকে রওনা হলো সে, বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল ফগ।

তারপরেও একই ভাবে পড়ে রইল মুসা। নামল না। ফগ চলে গেছে এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত না হয়ে নামাটা উচিতও হবে না। তার চেয়ে জানালার ওপাশে কি আছে ভাল করে দেখার চেষ্টা চালাল।

ডাল বেয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে জানালার কাছে এসে ভেতরে তাকাল সে।

প্রচুর আসবাব। অনেক বড় একটা কাউচ, একটা আর্মচেয়ার, একটা টেবিল, দুটো ছোট চেয়ার, বুককেস ভর্তি বই, মেঝেতে কার্পেট। বৈদ্যুতিক হীটারও আছে। কোন লোক নেই। কিছুদিন ঘরে লোক বাস না করলে যে ভাবে ধুলোয় ঢেকে থাকে, ঢেকে আছে সে-ভাবে। তাজ্জব ব্যাপার!

জানালায় শিক। ডাল বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে কেউ ঢুকতে-বেরোতে পারবে না।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে ফগের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে এল মুসা। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগোল। বলা যায় না, কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে পারে ঝামেলা।

উত্তেজনা কমেছে। শীত অনুভব করল মুসা। ম্যাকিনটশটার কথা মনে পড়তে ভয় পেয়ে গেল। কোথায় ওটা জানতে চাইলে মাকে কি জবাব দেবে?

আরও ঘন হয়েছে কুয়াশা। এত বেশি, বাড়িটা ঘুরে দেখার আশা ছাড়তে হলো। এই কুয়াশার মধ্যে ভাল করে কিছু দেখবে না। সুতরাং ম্যাকিনটশ খোয়ানোর কি জবাব দেয়া যায় ভাবতে ভাবতে গেটের দিকে এগোল সে।

আরেকটা ভাবনা রয়েছে মনে, ক্রমে বড় হয়ে উঠল সেটা। দূর করে দিল ম্যাকিনটশের চিন্তা। সেই ঘরটা! বেশ রহস্যময় মনে হয়েছে তার কাছে। ভাবতে লাগল ওটার কথা।

গেটের কাছে এসে ফিরে তাকাল। একপাশে অনেক পুরানো নেমপ্লেট রয়েছে:
উইলসন হাউস

তারমানে নতুন কেউ আসেনি।

'রহস্যময়!' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কুয়াশার মধ্যে এবং রাতের অন্ধকারে অনেক সাধারণ ব্যাপারকেও রহস্যময় মনে হয়। শূন্য বাড়িতে আসবাবপত্রে সাজানো ঘরটাকে এই পরিবেশে তাই অনেক বেশি রহস্যময় বলে মনে হতে থাকল তার কাছে। মনে হতে লাগল, আরেকটা রহস্যই পেয়ে গেছে!'

সাত

মুসার উত্তেজিত ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝলাম, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করতে হলো না, ঢুকেই বলে উঠল সে, 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে! মনে হয় আরেকটা রহস্য!'

তাকে শান্ত হয়ে সব কথা খুলে বলতে বলল কিশোর।

গড়গড় করে বলে গেল মুসা। সবশেষে বলল, 'ভয়টা এখন মাকে নিয়ে। আমার ম্যাকিনটশ...'

'ভয় নেই,' কিশোর বলল। 'আমার কয়েকটা ম্যাকিনটশ আছে। একটা একেবারে তোমারটার মত। গায়ে দিয়ে চলে যেয়ো। আন্টি বুঝতেই পারবেন না। তোমারটায় নামটাম লেখা নেই তো ভেতরে?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'নেই।'

'তাহলে ঝামেলাও কিছু বুঝতে পারবে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিশ্চয় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবে না ওটা কার ম্যাকিনটশ। একটা সমস্যা গেল। ঘরটার ব্যাপারে আলোচনা করা যাক এবার। ঠিক রহস্য বলা যায় না এটাকে। অস্বাভাবিক বলতে পারো।'

'অস্বাভাবিকটাও এক ধরনের রহস্য,' আমি বললাম।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তা ঠিক। চুপ করে বসে থাকব না। জানার চেষ্টা করব এর পেছনে কি রহস্য আছে।'

'কি করে?' মুসার প্রশ্ন।

'হাউস-এজেন্টদের কাছে চলে যাব। নিশ্চয় ওদের কাছে খোঁজ পাওয়া যাবে বাড়িটা নতুন কেউ কিনেছে কিনা। ওদের কাছে সমস্ত বাড়ির খোঁজখবর থাকে। খালি বাড়ি হলে তো থাকবেই। মালিক ওদেরকে জানিয়ে যায় হয় বিক্রি করার জন্যে; নয়তো ভাড়া দেয়ার জন্যে।'

ফারিহা বলল, 'অনেক কিছু জানো তুমি, কিশোর; তোমার অনেক জ্ঞান!'

প্রশংসায় খুশি হলো কিশোর। বলল, 'তাহলে কাল থেকেই কাজ শুরু করব আমরা।'

'কেন, আজ নয় কেন?' ফারিহা জানতে চাইল।

'আজ হবে না। সময় নেই। তা ছাড়া দেখছ না কেমন কুয়াশা। এর মধ্যে কিছু করা যাবে না।'

'তাহলে কি ঘরে বসে থাকব?'

'তো আর কি করব? কেরম-টেরম খেলে কোনমতে কাটিয়ে দেয়া যাবে। খারাপ লাগবে না।'

পরদিন ভোরে উঠেই দেখি আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে মুসাদের বাড়ি রওনা হলাম। আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে মুসা আর

ফারিহা। তিনজনে মিলে চললাম কিশোরদের বাড়ি। ওখানেই আমাদের মিলিত হওয়ার কথা।

কিশোর আর টিটুকে নিয়ে দল বেঁধে চললাম উইলসন হাউসে। চমৎকার রোদ উঠেছে। পাহাড় পেরিয়ে চোখে পড়ল ছড়ানো মাঠ।

বাড়িটা আমিও চিনি। কিশোর চেনে না। গেটের কাছে এসে বললাম, 'এটাই উইলসন হাউস।'

আঙিনায় ঢুকলাম আমরা। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ঘরে ঢোকার কোন পথ বের করতে পারলাম না। শেষে কিশোর বলল, 'আমি এজেন্টের কাছে যাচ্ছি। দেখি কারও কাছে চাবি পাওয়া যায় কিনা?'

'থাকলেই তোমাকে দেবে কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'না দেয়াটাই স্বাভাবিক। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? তোমরা এখানে থাকো। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। টিটু, তুইও থাক।' হেঁটে এসে গরম হয়ে উঠেছে গা। গায়ের উলের পুলওভারটা খুলে গেটের কাছে ফেলে কুকুরটাকে বলল, 'তুই এটা পাহারা দিবি। কেউ এলে ওদেরকে জানাবি। ঠিক আছে?'

তার সব কথাই যেন বুঝতে পারল টিটু। জবাব দিল, 'ঘাউ!'

ও কি বুঝল, তা জানি না। তবে একটা ব্যাপার জানি, ওই পুলওভারের কাছ থেকে আর নড়ানো যাবে না ওকে। ওটার ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে, যতক্ষণ না কিশোর এসে সরায়।

কিশোর চলে গেল।

আমরা বসে না থেকে সেই গাছটায় চড়লাম। ডালপালাগুলো এমন ভাবে ছড়ানো, সহজেই চড়া যায়। ফারিহারও চড়তে অসুবিধে হলো না। জানালার কাছে এসে ভেতরটা দেখতে লাগলাম।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়—কথাটা যে কে বলেছিল জানি না। তবে অক্ষরে অক্ষরে যে সত্যি তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। নইলে যে লোকটাকে এখন সবচেয়ে বেশি ভয় সে-ই চলে আসবে কেন!

উইলসন হাউসের পথ ধরেই তখন সাইকেলে করে দূরের এক চাষীর বাড়িতে চলেছে ফগ। এক চাষীর একটা গরু ছুটে গিয়ে আরেক চাষীর খেতের ফসল নষ্ট করেছে। যার গরুতে করেছে তাকে সাবধান করার জন্যে যাচ্ছে সে।

তার আসার শব্দ শুনতে পেয়েছে টিটু। এমনকি গন্ধও নাকে গেছে। ফগকে সে দু-চোখে দেখতে পারে না। কাছাকাছি আসতেই গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল।

কুকুরের ডাক কৌতূহলী করে তুলল ফগকে। সাইকেল থেকে নেমে দেখতে এল। টিটুকে সে চেনে। জানে ওটার মালিক কিশোর পাশা।

টিটু ডাক শুরু করতেই চমকে গেলাম আমরা। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে দেখতে এলাম কি হয়েছে। ফগকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেই দুরুদুরু শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ঝোপে লুকিয়ে দেখতে লাগলাম কি করে।

টিটুকে দেখে থমকে গেল ফগ। বলল, 'ঝামেলা, এটা আবার এখানে কি করছে? তারমানে মোটকা ছেলেটা আছে!' এগিয়ে গিয়ে পুলওভারটা তোলার চেষ্টা

করল সে।

গাঁক করে তার আঙুলে কামড়ে দিতে গেল টিটু।

ঝট করে হাত সরিয়ে নিল ফগ। 'ঝামেলা! বাপরে বাপ কি শয়তান কুত্তা! পিটিয়ে একদিন ছাল না তুলেছি তো আমার নাম ফগর‍্যাম্পারকট নয়!…এই কুত্তা, তোর মালিক কোথায়?'

ফগের এই আচরণে হাসি চাপতে পারল না ফারিহা। বেশ জোরেই হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত চাপা দিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ফগের কানে চলে গেছে। মুখ তুলে তাকাল সে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

হালকা ঝোপের মধ্যে ফারিহার লাল হ্যাটটা ঠিকই চোখে পড়ল তার। আঙুল নেড়ে ডেকে বলল, 'অ্যাই, কে ওখানে? বেরিয়ে এসো!'

কি আর করবে? বেরোতেই হলো ফারিহাকে।

সে যখন বেরিয়েছে, আমাদেরও লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি আর মুসাও বেরোলাম।

এতজনকে একসঙ্গে দেখে গোল চোখ আরও গোল হয়ে গেল ফগের। একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'ঝামেলা!' ধমকে উঠল পরক্ষণে, 'এখানে কি?'

'খেলতে এসেছি,' ভয়ে ভয়ে জবাব দিলাম।

'খেলতে এসেছ! অন্যের জায়গায়!' আরও জোরে ধমকে উঠল ফগ। 'পেয়েছ কি? ক্যাপ্টেন রবার্টসনের বন্ধু বলেই মনে করেছ মাথা কিনে নিয়েছ, যা ইচ্ছে করবে! তা করতে পারবে না। বেআইনী কাজ আমি কিছুতেই করতে দেব না। দাঁড়াও, তোমাদের বাবা-মাকে গিয়ে বলব। দেখি কি বিচার করেন?'

মুসা বলল, 'সত্যি বলছি মিস্টার কট…'

'ফগর‍্যাম্পারকট!'

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, এটা বেআইনী। খালি বাড়ি দেখে লুকোচুরি খেলতে ঢুকেছি…'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল ফগ। 'লুকোচুরি খেলতে ঢোকোনি। আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না এ কথা। বলো কেন ঢুকেছ?'

'সত্যি বলছি, খেলতে…'

'হুঁ!' গোল গোল চোখ মেলে আমাদের দেখতে লাগল ফগ। 'খেলতে? কোন একটা শয়তানি তো অবশ্যই আছে। আগে হোক পরে হোক, জানবই, আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

সন্দিহান চোখে আমাদের আরেকবার দেখল সে। তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

আট

দ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলাম, রহস্যের কথাটা কি টের পেয়ে গেল ফগ? সন্দেহ যে কটা করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর গাছে উঠতে সাহস করলাম না। থে বেরিয়ে কিশোরের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিশোর ওদিকে কি করেছে, সেটা বলি এখন।

গাঁয়ের ভেতরে গিয়ে হাউস-এজেন্টের অফিসের খোঁজ করল। জানল, দু-জন জেন্ট আছে। বড়টার অফিসে ঢুকল।

ডেস্কে বসে আছে এক বুড়ো। তাকে দেখে ভুরু কোঁচকাল, 'কি চাই?'

'রাস্তা থেকে দূরে কোন বাড়ি আছে?' বড়দের মত করে বলল কিশোর। আমার চাচী একটা বাড়ি কিনতে চান। বড় বাগানওয়ালা, গাঁয়ের বাইরে হলে ভাল ।'

'তোমার চাচীকে গিয়ে বোলো টেলিফোনে হোক, চিঠিতে হোক, আমার সঙ্গে যাগাযোগ করতে। কিংবা ঠিকানাটা দিয়ে যাও, আমিই করব।'

এ রকম জবাব শুনবে আশা করেনি কিশোর। গাঁইগুঁই করে বলল, 'কি ধরনের বাড়ি চায় আমাকে বলে দিয়েছে চাচী। ওই যে পাহাড়ের গোড়ায় উইলসন হাউসটা আছে...'

'কতর মধ্যে কিনতে চান উনি?'

আরেক বিপদে পড়ল কিশোর। অনেক ব্যাপারে অনেক জ্ঞান তার, কিন্তু এই এলাকার জায়গা-জমি সম্পর্কে কোন খোঁজ রাখে না। আন্দাজে বলে দিল, 'এই হাজার দুয়েক?'

খেপে গেল বুড়ো। 'আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছ? হাজার দুয়েক দিয়ে উইলসন হাউস! যাও, কাটো। যত্তসব ইঁচড়ে পাকা ছেলেছোকরার দল!' গজগজ করতে লাগল সে।

আর থাকতে সাহস করল না কিশোর। বেরিয়ে এল। এসেছিল চাবি নিয়ে যেতে, সেটা দূরে থাক, সামান্যতম তথ্যও জোগাড় করতে পারল না। এ ভাবে খালি হাতে গেলে হাসির খোরাক হবে বন্ধুদের কাছে। সুতরাং দ্বিতীয় অফিসটাতে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিল সে। ঠিক করল, দাম জিজ্ঞেস করলে এবার পঞ্চাশের কম বলবে না। কম বলাতে এক এজেন্ট খেপেছে, বেশি বলে দেখা যাক আরেকজনের কি প্রতিক্রিয়া হয়।

ঢুকে দেখল, তার চেয়ে কয়েক বছরের বড় একটা ছেলে বসে আছে ডেস্কে। রক্তশূন্য চেহারা। নাকের ডগা টকটকে লাল। বার বার চিমটি কাটছে সেখানে। কশোরকে দেখে কাটল একবার।

'গুড মর্নিং,' ভারিক্কি চালে বড়দের মত করে বলল কিশোর।

'মর্নিং.' আরেকবার চিমটি কাটল ছেলেটা। নার্ভাস নার্ভাস লাগছে ওকে। 'কি

চাও?'

'আমি চাই না, আমার চাচী চায়। একটা বাড়ি কিনবে, পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে।'

চোখ কপালে উঠে গেল ছেলেটার। ঘন ঘন চিমটি কাটল কয়েকবার নাকে। 'পঞ্চাশ হাজার! এর অর্ধেক দামের বাড়িও নেই এখানে কোথাও। তা তোমার চাচীটি কে?'

'আমার চাচার স্ত্রী।'

হেসে ফেলল ছেলেটা। নাকে চিমটি কাটল নার্ভাস ভঙ্গিতে। 'মনে হচ্ছে অনেক বড়লোক। কিন্তু এই পচা গাঁয়ে এত দাম দিয়ে বাড়ি কেনার শখ হলো কেন তাঁর?'

'কেন আর, গ্রামটা খুব পছন্দ হয়েছে,' পকেট থেকে এক প্যাকেট লজেন্স বে করল কিশোর। একটা দিল ছেলেটাকে। আরেকটা নিজের মুখে পুরল। 'ভাল বা থাকলে বলো। চাচীকে বলব।'

'অনেক বাড়িই তো আছে—এলমার, হুইটল্যাণ্ড, করমোর‍্যান্ট···'

'সোয়ানসন লেনে কোন বাড়ি নেই?' জিভ দিয়ে ঠেলে লজেন্সটা গালে একপাশ থেকে অন্যপাশে নিয়ে এল কিশোর।

একটা বড় খাতা বের করল ছেলেটা। লজেন্স চুষতে চুষতে পাতা ওল্টাল বলল, 'আছে। অত ভাল না বাড়িটা। হেমিংটনরা থাকত···'

'উইলসন হাউসটার কি খবর? ওটাও তো খালি দেখলাম।'

নাক চুলকাল ছেলেটা। 'ওটা নেই। এক বছর আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।'

'তাই? তাহলে মালিক থাকতে আসে না কেন?'

'কি জানি?' অবশিষ্ট লজেন্সটুকু চিবিয়ে খেয়ে ফেলল ছেলেটা। 'খুব ভা জিনিস। কোত্থেকে কিনেছ?'

'লস অ্যাঞ্জেলেস। আরেকটা খাবে?' আরেকটা লজেন্স বের করে দি কিশোর। 'নাও, খাও।···আচ্ছা, মালিকরা আসবে-টাসবে নাকি? জানো?'

'তা তো বলতে পারব না। কোন বাড়ি বিক্রি কিংবা ভাড়া হয়ে যাওয়ার ওটা সম্পর্কে আর আগ্রহ থাকে না আমার আব্বার। তা তোমার চাচীর ওই বাড়ি ওপর নজর পড়েছে নাকি?'

কিশোর বুঝতে পারল, ছেলেটার বাবা হাউস-এজেন্ট। 'হ্যাঁ, পড়েছে।'

'বন-জঙ্গলের মধ্যে থাকতে যাওয়া কেন? আরও তো অনেক ভাল বাড়ি আ পাহাড়ের এদিকটায়।'

'কখন যে কার কোন জায়গা পছন্দ হয়ে যায়, ঠিক আছে নাকি,' ব দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'একটা উপকার করতে পারো? বাড়িটা কিনেছে যদি ঠিকানাটা দাও, তার কাছে গিয়ে দেখতে পারি। বেশি দাম দি চাচীকে আবার দিয়েও দিতে পারে ওই লোক।'

একটা ফাইল বের করল ছেলেটা। নামের লিস্ট। ময়লা লেগে থাকা আঙু কাগজ ঘাঁটতে শুরু করল।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে কিশোর।

অবশেষে মুখ তুলে ছেলেটা জানাল, 'হ্যাঁ, আছে। মিস হলি কেইন, সিক্সথ জুন লেন, ডাভহিলস। ইচ্ছে করলে লিখে নিতে পারো। আমাদের পাশের গাঁয়েই থাকেন মহিলা।' নাকে একবার চিমটি কেটে আনমনে বিড়বিড় করল, 'কিন্তু এতদিন হয়ে গেল, থাকতে আসেন না কেন? আর যদি না-ই থাকবেন, কিনেছেন কেন? দাম তো কম না, বারো হাজার ডলার।'

কিশোর বলল, 'হয়তো কেনার পর আর ভাল মনে হয়নি। তাই আসছেন না। তাহলে ভালই হবে। চাচীকে বেচে দিতেও পারেন। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। চলি।'

বেরোনোর আগে ছেলেটাকে আরেকটা লজেন্স দিল কিশোর। অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। খুশি হলো সে। তাড়াতাড়ি ফিরে চলল উইলসন হাউসে, যেখান বন্ধুদের ফেলে এসেছে।

তার অপেক্ষায় আমরা রাস্তায় বসে আছি দেখে অবাক হলো সে। ব্যাপার কি জানতে চাইল।

বললাম সব।

গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে কিশোর বলল, 'টিটুটা তাহলে ডোবাল! ও কোথায়?'

'বসে আছে পুলওভারের ওপর। পাহারা দিতে বলে গেছ, সে কি আর সরে।'

'নিয়ে আসিগে। তোমরা আস্তে আস্তে এগোও।'

কিশোরকে দেখে আনন্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল টিটু।

তাকে সরিয়ে পুলওভারটা নিয়ে গায়ে দিল কিশোর। বাড়িটা একবার ঘুরে দেখার ইচ্ছে হলো। দেখেটেখে সবে একপাশ দিয়ে বেরিয়েছে, চমকে উঠল ভারি খসখসে কণ্ঠ শুনে, 'ঝামেলা! এখানে কি? একটু আগে না মানা করে গেছি না ঢোকার জন্যে?'

সর্বনাশ! আবার এসেছে ঝামেলা র‍্যাম্পারকট! সাইকেল ঠেলে এগিয়ে এল সে।

দ্রুত এদিক ওদিক চোখ বোলাতে শুরু করল কিশোর, যেন কোন জিনিস খুঁজছে। 'মুসা বলল রুমালটা ফেলে গেছে...'

'রুমাল কি ঘরের মধ্যে থাকে নাকি? জানালা দিয়ে উঁকি দিতে দেখলাম তোমাকে?'

'থাকতে অসুবিধে কি? জায়গা হবে না ভাবছেন?'

'খবরদার, বেশি চালাকি কোরো না! অন্যের জায়গায় বেআইনী ভাবে ঢুকেছ, ইচ্ছে করলেই অ্যারেস্ট করতে পারি এখন তোমাকে। জানো সে-কথা? জলদি বলো, এ বাড়ির ওপর চোখ পড়ল কেন?'

'না বললে?'

'তোমাদের বাবা-মাকে গিয়ে বলে দেব।'

'তাহলে তাই করুনগে।'

একটা মুহূর্তও আর দাঁড়াল না কিশোর। ফগের পাশ কাটিয়ে আসতে গেল। থাবা দিয়ে তার হাত চেপে ধরল ফগ।

লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল টিটু। ফগের পা কামড়ে ধরতে গেল। কামড় লাগল প্যান্টে।

লাথি মেরে তাকে সরিয়ে দিল ফগ।

আবার কামড়াতে গেল টিটু।

আবার লাথি দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল ফগ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুকুরের কামড় খাওয়ার চেয়ে সরে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল সে। একলাফে সাইকেলে চড়ে প্যাডাল ঘোরাতে শুরু করল।

পেছন পেছন গেট পর্যন্ত তাকে তাড়া করে গেল টিটু। তারপর 'খাউক! খাউক!' করে কয়েকটা চূড়ান্ত ধমক দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

হাসতে হাসতে তখন পেট ফাটার অবস্থা কিশোরের।

নয়

কিশোর যে চাবি আনতে পারেনি এটা শুনে হতাশ হলেও অবাক হলাম না আমরা।

বললাম, 'বাড়িটা কিনেও তাতে কেন আসছেন না মিসেস কেইন, ভাবতে অবাক লাগছে। আরও অবাক লাগছে, মাত্র একটা ঘরকে ওরকম করে সাজালেন কেন?'

'গিয়ে জিজ্ঞেস করব নাকি?' মুসার প্রশ্ন। 'বলব, গাছে উঠেছিলাম। জানালা দিয়ে দেখেছি।'

'মাথা খারাপ,' কিশোর বলল। 'বললেই হাজারটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। তার চেয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করতে পারি।'

'করলেই জবাব দেবেন কেন?'

'এমন ভাবে করব, যাতে দেন। ভাল গোয়েন্দা হতে চাইলে লোকের পেট থেকে কথা আদায়ের কৌশল শিখতেই হবে।'

'ঠিকানা এনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। গ্রামের নাম বলল।

'সাইকেলে করেই চলে যেতে পারি তাহলে,' বললাম।

'কিন্তু মিস কেইনকে কি বলব?' ফারিহার প্রশ্ন। 'কি বলব তাঁকে?'

'সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' জবাব দিল কিশোর। 'উপায় একটা বেরিয়েই যাবে।'

'তোমরা তো যাবে সাইকেলে। আমি? আমাকে নেবে না?'

'হ্যাঁ, নেব। আমাদের কারও সাইকেলে তুলে নিলেই হবে।'

ঠিক হলো, দুপুরে খাওয়ার পর ডাভহিলসে রওনা হব আমরা।

খাওয়া সেরে সাইকেল নিয়ে চলে এলাম মুসাদের বাড়িতে। সেখান থেকে ফারিহা আর মুসাকে নিয়ে চললাম কিশোরদের ওখানে। নিজের সাইকেলের ক্যারিয়ারে ফারিহাকে তুলে নিল মুসা।

গেটের কাছে অপেক্ষা করছে কিশোর। আমাদের দেখে টিটুকে সাইকেলের বাস্কেটে তুলে নিয়ে এগিয়ে এল।

দল বেঁধে ডাভহিলসে চললাম আমরা।

বিশ মিনিটের মত লাগল পৌঁছতে। একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

সুন্দর একটা পুরানো আমলের বাড়ি। উঁচু চিমনি। সামনে চমৎকার বাগান। উইলসন হাউসের চেয়ে অনেক সুন্দর।

সাইকেল থেকে নামতে নামতে কিশোর বলল, 'এ জন্যেই ওই ভূতের বাড়িতে থাকতে যান না মিস কেইন। এটা অনেক ভাল।'

কিন্তু ঢোকার কি উপায়? একটা ছুতো দরকার। কারও মাথা থেকেই বেরোল না ফন্দিটা। কিশোরের উর্বর মস্তিষ্ক থেকেও নয়।

তবে এবারের কেসটায় অনেক কিছুই কাকতালীয় ভাবে ঘটে যাচ্ছে। এখানেও সে-রকম একটা কাণ্ড ঘটল।

ঝুড়ি থেকে টিটুকে নামিয়ে দিল কিশোর। ছাড়া পেয়েই গেটের দিকে দৌড় দিল সে। কি করে যেন বুঝে গেছে এখানে ঢুকতেই এসেছি আমরা।

এই সময় ঘটল বিপত্তি। ঘাউ ঘাউ করে বিকট হাঁক ছেড়ে লাফ দিয়ে এসে পড়ল বিরাট এক কুকুর।

ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল টিটুর। কুকুরটাকে দেখে একবিন্দু ঘাবড়াল না, তার চেয়ে অনেক বিশাল দেখেও না। বরং ঘরঘর করে পাল্টা জবাব দিল।

ভয় পেয়ে ফারিহা বলল, 'আরে ধরো না! লেগে যাবে তো কামড়াকামড়ি!',

কিন্তু কিশোর কিছু করার আগেই টিটুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বড় কুকুরটা। টিটুও ছাড়ল না। বেধে গেল মারামারি।

হাঁকডাক, হই-চই শুনে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মোটাসোটা একজন মাঝবয়েসী মহিলা। কুকুর দুটোকে মারামারি করতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এলেন।

ধমক দিয়ে বড় কুকুরটাকে বললেন, 'অ্যাই রোজার, রোজার, ছাড়! ছাড় বলছি! ছাড়লি!'

অতবড় কুকুরের সঙ্গে পারবে না টিটু, ঘাড় মটকে মেরে ফেলবে এই ভয়ে কাঁদতে শুরু করল ফারিহা।

ঘরের পাশে কল। বাগানে পানি দেয়ার পাইপ। তার কাছে পড়ে আছে একটা বালতি। তাতে পানি ভরা।

দৌড়ে গিয়ে সেটা তুলে এনে কুকুর-দুটোর গায়ে ঢেলে দিল মুসা।

বরফের মত ঠাণ্ডা পানি গায়ে পড়তেই ভীষণ চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বড় কুকুরটা। গা ঝাড়া দিয়ে পানি ফেলতে লাগল।

কষে এক থাপ্পড় লাগালেন মহিলা। 'শয়তান কুত্তা! খালি মারামারির তালে থাকে! দাড়া, আর বেরোতে দেব না তোকে! খোঁয়াড়ে আটকে থাকলে বুঝবি কেমন মজা!'

আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'দাঁড়াও, এটাকে রেখে আসি।'

গলার বেল্ট ধরে কুকুরটাকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

বললাম, 'ইনিই মিস কেইন নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'মনে হয়।...আরি, টিটুর পায়ে কামড় লেগেছে! রক্ত বেরোচ্ছে!'

ফুঁপিয়ে উঠল ফারিহা। রক্ত সইতে পারছে না। তাড়াতাড়ি গিয়ে টিটুর কাছে বসে পড়ল।

ক্ষত চাটছে টিটু।

হাসতে হাসতে মুসা বলল, 'যা-ই বলো, দারুণ একখান ফাইট দিয়েছে। টিটু আরেকটু বড় হলেই কুত্তাটার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ত।'

ফিরে এলেন মিস কেইন। ফারিহার কান্না দেখে অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। হাত ধরে তাকে টেনে তুললেন। সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, 'তোমার কুকুর? আহা, বেচারা! শক্ত কামড় খেয়েছে!'

নরম কথা শুনে ফোঁপানি আরও বেড়ে গেল ফারিহার। ককিয়ে বলল, 'রক্ত তো বন্ধ হচ্ছে না!'

'ঘরে নিয়ে এসো। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই।'

খুশি হয়েই এই প্রস্তাবে সাড়া দিলাম আমরা।

ডলে ডলে চোখের পানি মুছল ফারিহা।

'সাইকেলগুলো বাগানেই রেখে এসো,' মিস কেইন বললেন। 'কিছু হবে না। ও, আমার নাম মিস হলি কেইন। আমার ভাইয়ের সঙ্গে থাকি।'

নিজের এবং সঙ্গীদের পরিচয় দিল কিশোর। হাত মেলানোর পালা শেষ করে মহিলার পিছে পিছে ঘরের দিকে এগোলাম আমরা।

টিটুর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতে হতে ঘরে বানানো কেক নিয়ে এল মিস কেইনের রাঁধুনি।

ইতিমধ্যে ফারিহার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে মিস কেইনের। হাত ধুতে গেলেন তিনি।

ফিসফিস করে ফারিহাকে বলল কিশোর, উইলসন হাউসের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে।

কি ভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না ফারিহা। সুবিধে করে দিলেন মিস কেইন। সবাইকে প্লেটে কেক তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ি কোথায় তোমাদের?'

'এই তো পাশের গাঁয়ে,' জবাব দিল ফারিহা। 'গ্রীনহিলসে।'

'তাই?' টিটুর দিকেও একটুকরো কেক ছুঁড়ে দিলেন মিস কেইন। 'বছরখানেক আগে আমিও ওখানে বাস করব ঠিক করেছিলাম। উইলসন হাউস চেনো?'

'হ্যাঁ, চিনি,' প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম আমরা সবাই।

একটা ভুরু উঁচু হলো মিস কেইনের। বাড়িটা এত পরিচিত ভাবতে পারেননি তিনি।

'বাড়িটা আমি কিনেছিলাম,' কেক চিবাতে চিবাতে বললেন মিস কেইন। 'আমার ভাই একদিন বলল, এই অঞ্চলটা তার খুব পছন্দ হয়েছে, এদিকেই কোথাও থাকবে। সে-জন্যেই কিনেছিলাম।'

'ও!' কিশোরের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ক্ষণিকের জন্যে দিশেহারা হয়ে গেল ফারিহা। চুপ করে না থেকে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'তাহলে ওখানে থাকলেন না কেন?···মানে, এখানে কেন?'

'বাড়িটা কেনার পর পরই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল।'

জবাব শুনে কান খাড়া হয়ে গেল আমাদের।

সামনে ঝুঁকল ফারিহা, কেকে কামড় দেয়ার কথা ভুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটনা?'

'একটা লোক এসে বার বার অনুরোধ করতে লাগল বাড়িটা বেচে দেয়ার জন্যে। বাড়িটার মালিক নাকি ছিল তার মা। টাকার জন্যে বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। কিছু টাকা জমে যাওয়াতে আবার কিনে নিতে চায়। সেখানে তার স্ত্রী আর বাচ্চাদের নিয়ে বাস করবে। আমি যত দিয়ে কিনেছি, তার চেয়ে বেশি দিতে চাইল।'

'বারো হাজারের বেশি?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা। চেয়ারের নিচে দিয়ে কিশোরের কড়া লাথি খেয়ে 'আঁউক!' করে উঠল। বোকার মত দিয়েছে ফাঁস করে। মিস কেইন এখন কিছু সন্দেহ না করে বসলেই বাঁচোয়া।

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তাঁর দৃষ্টি। 'তুমি জানলে কি করে?'

মহাবিপদ! উদ্ধারের জন্যে মুখ কাঁচুমাচু করে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

মুখের কেকটুকু গিলে নিল কিশোর। হাসল। তারপর বলল, 'ইয়ে, বললে বিশ্বাস করবেন না, ও আন্দাজেই অনেক সময় একেবারে ঠিক কথাটা বলে ফেলে। সাংঘাতিক এক ক্ষমতা। ওর সামনে কোন কথা গোপন করতে গিয়ে তো অনেক সময় ভয়ই পেয়ে যাই আমরা। যদি আন্দাজ করে ফেলে?'

ব্যাপারটা নিয়ে বোধহয় বিশেষ মাথা ঘামালেন না মিস কেইন, তাই এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন না তুলে বললেন, 'তোমরা গ্রীনহিলস থেকে এসেছ, আমি খুশি হয়েছি। ওই গ্রামটা খুব সুন্দর।···হ্যাঁ, যা বলছিলাম, লোকটা চাপাচাপি শুরু করল। এদিকে এই বাড়িটা পেয়ে গেলাম। ওটার চেয়ে সুন্দর। দামও কম। তাই ওটা তাকে দিয়ে, এটা নিয়ে নিলাম।'

'ভাল করেছেন,' কিশোর বলল। 'কি যেন নাম বললেন ভদ্রলোকের?'

'কই, কোন নাম তো বলিনি?···ইচ্ছে করলে গিয়ে দেখে আসতে পারো তাকে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।'

উইলসন হাউসে যে কোন লোক দেখিনি, এ কথা মহিলাকে বললাম না আমরা। ক্রমেই গভীর হচ্ছে রহস্য।

'তা যাওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোকের নাম কি উইলবার নাকি?'

'ভুলে গেছি। দাঁড়াও, দেখি। আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল। ফেলে দিয়ে না থাকলে টেবিলেই কোথাও আছে।' উঠে গিয়ে একটা খাম টেনে নিলেন তিনি। 'এহ্‌হে, আমার চশমা গেল কোথায়?'

চশমা ছাড়া তিনি পড়তে পারেন না, বোঝা গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে গেল মুসা। চশমাটা টেবিলের পাশে চেয়ারে পড়ে আছে, দেখেছে সে। সেটা আড়াল করে রেখে হাত বাড়াল, 'দিন, আমি পড়ে দিই।'

'কিন্তু চশমা যাবে কোথায়?'

কিছুতেই ওটা তাঁর চোখে পড়তে দিল না মুসা। শেষ পর্যন্ত খামটা মিস কেইনের হাত থেকে নিয়ে ছাড়ল। নামটা পড়ল জোরে জোরে, 'নিকলসন বোমার।'

'হ্যাঁ, বোমার। তা তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি তোমাদের?'

'না,' ফারিহা জানাল। 'তবে এবার যাব। ওদের বন্ধু হতে আপত্তি নেই আমাদের।' টিটুর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে বলে অনেক ধন্যবাদ দিল মিস কেইনকে।

যা জানার জেনেছি। আর দেরি করলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে যাবে, বলে, আরও একবার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম আমরা।

দশ

বাইরে বেরিয়েই মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'বোমারের ঠিকানা মনে রেখেছ?'

'কি মনে হয়? বাড়ির দাম বলে দিয়েছি বলে কি এটাও মনে রাখতে পারব না?'

'দিয়েছিলে তো আরেকটু হলেই সর্বনাশ করে। বলো ঠিকানাটা। রবিন, লিখে নাও। পরে আবার ভুলে যেতে পারে।'

ঠিকানা বলল মুসাঃ ১১, সেভেন্থ আগস্ট রোড, হেরিং বীচ। ফোন নম্বর, ১১২১।

'কথা হলো,' মুসা বলল, 'বাড়িটার প্রতি এত আগ্রহ কেন বোমারের?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'হতে পারে শিশুকালটা ওই ঘরেই কেটেছে তার। স্মৃতিতে গেঁথে আছে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা। তাই আবার ওখানে বাস করার ইচ্ছে জেগেছে।'

এই ব্যাখ্যা কারও সঠিক মনে হলো না। কিশোরের নিজের কাছেও না। বলল, 'ভাল গোয়েন্দার কোন সম্ভাবনাই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।'

আমি বললাম, 'কোন্ সময় বোমার ওই বাড়িতে বাস করত জানা দরকার। প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।'

'তা ঠিক। হেরিং বীচে এখনও থাকে কিনা সেটাও জানতে হবে।'

'হেরিং বীচ অনেক দূর,' মুসা বলল। 'এতদূরে আমাকে যেতে দেবে না মা।'

'ফোন নম্বর আছে। না গেলেও চলে।'

অন্ধকার হয়ে আসছে। দ্রুত প্যাডেল চালালাম আমরা।

গ্রীনহিলসে ঢুকলাম। কিশোরদের বাড়িটা আগে পড়ে। সে সেদিকে চলে গেল। আমার বাড়ি সবার শেষে। মুসা আর ফারিহা ঢুকে গেল তাদের গেটে। আমি বাড়ি রওনা হলাম। মনে একটাই ভাবনা, বোমাররা কখন থাকত উইলসন হাউসে, কি করে জানা যাবে?

রাতে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত সমস্যাটা নিয়ে ভাবলাম। কোন লাভ হলো না।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে মুসাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে সবে দরজা খুলেছি, দেখি সাইকেল থেকে নামছে বুড়ো পোস্টম্যান রেনার। ব্যাগ থেকে একগাদা চিঠি নিয়ে বেছে বেছে আমাদেরগুলো বের করতে লাগল।

বুদ্ধিটা এল মাথায়। চিঠি বিলি করে বেড়ায় পোস্টম্যান। অনেককে চেনে। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখি না কেন?

এগিয়ে গেলাম। 'অ্যাই যে রেনার-দাদু, কেমন আছ? আমার চিঠি আছে?'

'ভাল। তোমার জন্মদিন-টন্মদিন নাকি? চিঠি আসার কথা?'

'না। এমনি বললাম। দাদু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এই যে ব্যাগ ভর্তি চিঠি, সব কি বিলি করে অফিসে ফিরবে? কোনটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না?'

'হ্যাঁ। যদি ভুল ঠিকানা না থাকে।'

'এই যে এত ঠিকানা, সব তোমার মনে থাকে? সবাইকে চেনো?'

'সব্বাইকে। নইলে বিলি করি কি ভাবে? আমার বুড়ি বলে, জীবনে নাকি কোন নাম মনে রাখতে ভুল করিনি আমি। এই তোমাদের বাড়ির কথাই ধরো না। তোমরা আসার আগে কে কে থেকেছে, সব মনে আছে। প্রথমে এলেন মিসেস গোবরাট। তাঁর নামে চিঠি এলেই ভয় পেতাম। ভয়ানক দুটো কুত্তা ছিল তাঁর। গেটে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাঁর আগে ছিলেন ক্যাপ্টেন ইয়ারলিং। খুব ভদ্রলোক। তাঁর আগে...'

নিজের বাড়ি সম্পর্কে জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার। বুড়োকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব মনে রাখতে পারো তো তুমি! দাঁড়াও, তোমার ক্ষমতাটা একটু পরখ করি। সময় আছে?'

মাথা কাত করল বুড়ো, 'দশ মিনিট।'

'তাহলে বলো তো বহুবছর আগে উইলসন হাউসে কে বাস করত?'

'উইলসনদের তিন মেয়ে। খুব ভাল করেই মনে আছে।'

অবাক হলাম। 'তুমি শিওর? উইলসনদের আগে বোমার নামে কেউ থাকত না?'

'নামটাও শুনিনি জীবনে,' কুঁচকানো কপালের ভাঁজ গভীর করে মনে করার চেষ্টা চালাল রেনার। 'ওই বাড়িটা বানানোর কথাও মনে আছে। জেনারেল উইলসন বানিয়েছিলেন। তিন মেয়ে নিয়ে বাস করেছেন। মেয়েদের নামও মনে আছে। ডলি, পলি আর নেলি। খুব ভাল মেয়ে। কেউ বিয়ে করেনি।'

'অনেক দিন থেকেছে?'

'নিশ্চয়। প্রথমে মারা গেলেন জেনারেল উইলসন, তারপর একে একে তাঁর দুই মেয়ে ডলি আর পলি। দু-জনেই বুড়ো হয়ে মরেছে। এত একা হয়ে গেল তখন নেলি, আর থাকতে পারল না। এক বন্ধুর সঙ্গে বাস করার জন্যে চলে গেল। সেটা ছয় বছর আগে।'

শিক লাগানো জানালাটার কথা ভাবলাম। 'উইলসন হাউসে কোন ছেলেমেয়ে থাকত না কখনও? শিশু?'

'নাহ্। বললাম না, জেনারেলের তিন মেয়ে কখনও বিয়ে করেনি। ওরা যখন এসেছে, তখন যুবতী। ছোট ছেলেমেয়ে কখনও দেখিনি। আসবে কোত্থেকে?'

‘ও। মিস নেলি উইলসন চলে যাওয়ার পর কারা এল?’

‘মিস ব্যারলার নামে এক মহিলা ভাড়া নিয়েছিল বোর্ডিং হাউস করার জন্যে। চালাতে পারল না। দুই বছর কোনমতে টিকে থেকে চলে গেল। তারপর থেকে খালি পড়ে আছে বাড়িটা। বছরখানেক আগে নাকি কে একজন কিনেছে আবার, কিন্তু থাকতে আসেনি। দেখিইনি নতুন মালিককে। কোন চিঠি বিলি করতে আসিনি।’

‘বোমার নামে কেউ কক্ষনো থাকেনি? তুমি একদম শিওর?’

‘একদম।’ আমার চোখে চোখ রাখল রেনার। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। ‘বোমারের ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন?’

চোখ সরিয়ে নিয়ে কোনমতে বললাম, ‘এমনি। নামটা কোথাও দেখেছি, তাই…’

‘বোমার একজন আছেন, গাঁয়ের উত্তর মাথায় থাকেন। তাঁর কথা বলছ না তো?’

‘না আমি বিশেষ কারও কথাই বলছি না। আন্দাজে একটা নাম বানিয়ে বলে দিয়ে তোমার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করলাম। *তোমার বুড়ি* ঠিকই বলে—কোন নামই ভালো না তুমি। দাদীকে বলবে, তোমার কাছে আমি হেরে গেছি।’

হেসে, আমাদের চিঠিগুলো আমার হাতে দিয়ে চলে গেল রেনার।

ভাবতে লাগলাম, মিস কেইনকে একগাদা মিথ্যে বলল কেন নিকলসন বোমার? কি রহস্য রয়েছে এর পেছনে?

এগারো

মুসাদের বাড়িতে এসে দেখি লিভিং রুমে মুসা আর ফারিহার সঙ্গে কিশোর বসে আছে।

সব শুনে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, ‘বোমার তাহলে এতগুলো মিথ্যে বলল কেন?’

ফারিহা বলল, ‘কোন গুপ্তঘর নেই তো?’

‘কি করে বলব? বোমার লোকটা রহস্যময়। আরও খোঁজ নেয়া দরকার।’

‘কিন্তু হেরিং বীচে তো যেতে পারব না আমরা…’

‘বললাম না ফোন নম্বর আছে।’

দুই হাত তুলে নাড়তে নাড়তে বলল মুসা, ‘আমি বাপু করতে পারব না। পারলে তুমি করো। কি বলতে কি বলে ফেলব…’

‘ঠিক আছে আমিই করব,’ কিশোর বলল। ‘কিন্তু তোমাদের এটা দিয়ে করা ঠিক হবে না। আন্টি আবার কোনখান থেকে কি শুনে ফেলবেন। জবাব দিতে দিতে জান সারা হবে। আমি বরং বাইরের কল-বক্স থেকেই করে আসি।’

‘যাও। টিটু এখানেই থাক। খোঁড়া পা নিয়ে ওর অত হাঁটাহাঁটি ঠিক হবে না।’

নিজের নাম শুনে কান খাড়া করল টিটু। কিশোর উঠে দরজার দিকে রওনা হতেই সে-ও পিছে পিছে চলল। কিছুতেই থাকতে চাইল না। চাপাচাপি করায় এমন করুণ চোখে তাকাতে লাগল, রেখে যেতে আর পারল না কিশোর। বলল, 'কথা যখন শুনবি না, আমার কি? পা ব্যথা করলে তখন আর কিছু বলতে পারবি না বলে দিলাম।'

বক্সে ঢুকে রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর। স্লটে পয়সা ফেলল। ডায়াল করল।

ওপাশে রিঙ হচ্ছে। উত্তেজনায় বুক কাঁপছে তার। ধরবে তো?

ধরল। ভেসে এল একটা কণ্ঠ, 'হালো?'

'হালো,' কণ্ঠস্বর বড়দের মত ভারি করে জানতে চাইল কিশোর, 'মিস্টার নিকলসন বোমার আছেন?'

থমকে গেল কণ্ঠটা। এক মুহূর্ত নীরব থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কত নম্বরে করেছেন?'

নম্বর বলল কিশোর।

প্রশ্ন হলো, 'এই নম্বরে বোমারকে পাওয়া যাবে কে বলেছে আপনাকে? আপনি কে?'

বানিয়ে নিজের একটা নাম বলে দিল কিশোর।

আবার নীরবতা। 'কি নাম বললেন?'

নামটা আরেকবার বলে কিশোর বলল, 'আপনি কি বলতে পারবেন, মিস্টার বোমার এখন হেরিং বীচে আছেন, না গ্রীনহিলসের বাড়িতে চলে গেছেন?' ভাল করেই জানে সে বোমার যায়নি, লোকটাকে চমকে দেয়ার জন্যেই বলল।

এতটাই চমকাল লোকটা, লাইনই কেটে দিল। কয়েকবার হালো হালো করেও আর জবাব পেল না কিশোর।

নিরাশ হয়ে টিটুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল ফগের মুখোমুখি। সন্দেহ হওয়ার পর থেকেই আমাদের পিছু লেগে আছে লোকটা। দেখেই গরগর শুরু করে দিল টিটু।

'কার কাছে ফোন করলে?' জানতে চাইল ফগ।

'সেটা আপনার জানার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না,' মোলায়েম স্বরে জবাব দিল কিশোর, এই স্বর শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে ফগ। তাকে রাগানোর জন্যেই এ রকম করে বলল সে।

ফগের মুখ দেখে মনে হলো, ঠাস করে চড় মারার ইচ্ছেটা কোনমতে দমন করল সে। পরে এ সব কথা আমাদের বলার সময় হাসিতে ফেটে পড়েছে কিশোর।

'উইলসন হাউসে আর গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল ফগ।

'উইলসন হাউস?' আকাশ থেকে পড়ল যেন কিশোর। 'সেটা আবার কোথায়?'

এতটাই রেগে গেল ফগ, আর সহ্য করতে পারল না, হাত তুলল চড় মারার জন্যে। চোখের পলকে লাফ দিয়ে গিয়ে তার পায়ের কাছে পড়ল টিটু। কামড়ে দেয়ার জন্যে মুখ খুলল।

লাথি দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল ফগ।

'খবরদার, আরেকবার মারলে ভাল হবে না!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

কিশোরের হুমকিকে ভয় না পেলেও টিটুকে ভয় পায় ঝামেলা র‍্যাম্পারফুট। ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্যে তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠে পড়ল।

ফিরে এসে সব কথা আমাদের জানাল কিশোর। হাসতে লাগলাম। হাসির মাঝেই রেগে উঠল ফারিহা, 'ওই লোকটাকে আচ্ছামত একটা শিক্ষা দেয়া দরকার! খালি টিটুকে লাথি মারে!...এই, টিটু, খুব ব্যথা পেয়েছিস?'

কি বুঝল কুকুরটা কে জানে, তার পায়ে,গা ঘষতে ঘষতে নরম গলায় জবাব দিল, 'খউ! খউ!'

কাজের কথায় এলাম, 'কিশোর, ওই লোকটাকে সতর্ক করে দিয়ে এসেছ তুমি। ও এখন সন্দেহ করে বসবে এখানে তার বাড়িতে কিছু একটা ঘটছে। চলে আসতে পারে দেখার জন্যে।'

তুড়ি বাজাল কিশোর, 'সেটাই তো আমি চাই। আমরা যখন তার কাছে যেতে পারছি না, তাকেই আমাদের কাছে আনাব। দেখব, এসে কি করে, কড়া নজর রাখব বাড়িটার ওপর।'

'দিনে নাহয় রাখলাম,' মুসা বলল, 'রাতে তো আর পারব না। যদি তখন আসে?'

'আমিও পারব না,' বললাম। 'সারারাত আমাকে বাইরে থাকতে দেবে না মা।'

'তাহলে আমি থাকব,' কিশোর বলল। 'চাচীকে ফাঁকি দেয়াটা কঠিন হবে না।'

আঁতকে উঠল ফারিহা। 'অন্ধকারের মধ্যে! একা!'

'অন্ধকারে কি খেয়ে ফেলবে নাকি?...তবে অন্ধকার থাকছে না। অনেক বড় চাঁদ থাকবে, পূর্ণিমার দেরি নেই। দুটো কম্বল নিয়ে যাব সঙ্গে করে। ঠাণ্ডাও লাগবে না। বাগানের কোণে ভাঙা যে ছাউনিটা আছে, তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকব। কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।'

তার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। বুদ্ধি যেমন আছে, সাহসও আছে কিশোরের। নেতা হওয়ার যোগ্য। ফারিহার তো প্রশ্নই ওঠে না, মা যেতে দিলেও আমি বা মুসা একা গিয়ে ওই নিরালা বাড়িতে একলা রাত কাটাতে পারব না।

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'টিটুকে নেবে সঙ্গে?'

'ভেবে দেখতে হবে। নিলে কাজে লাগবে। সঙ্গী পাব। আপদে-বিপদে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু কাউকে দেখলে চিৎকার করে সব গড়বড়ও করে দিতে পারে।'

'যদি বৃষ্টি নামে? আকাশ তো ভাল না। বেশি নামলে কেউ এলেও টের পাবে না। ছাউনি থেকে বাড়িটা বেশ দূরে।'

'সাবধান থাকতে হবে আরকি। দরকার হয় বাইরেই কোথাও বসে থাকব। যখনকারটা তখন দেখা যাবে, এখন অত ভেবে লাভ নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।'

'তো, এখন কি করব?' মুসার প্রশ্ন। 'গেলে তো রাতে যাবে। সারাটা দিন কি করা? যাবে একবার? দেখে আসা যায় নতুন কিছু ঘটল কিনা।'

আমি বললাম, 'ঠিক। গেলে মন্দ হয় না।' টিপির টিপির করে বৃষ্টি পড়ছে। মাটি ভেজা। বাড়িটায় কেউ এলে, দরজা কিংবা জানালার নিচে নরম মাটিতে পায়ের ছাপ পড়বে। সে-কথা বললাম।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, আজকে গিয়ে লাভ হবে না। আমাদের বোমার সাহেব এলে আজ রাতে আসবে। কাল আসেনি, আমি শিওর। অহেতুক এই বৃষ্টির মধ্যে না বেরিয়ে বরং কেরম খেলা যাক।'

বারো

সন্ধ্যা থেকেই ঝড়বৃষ্টি এমন ভাবে শুরু হলো, আর হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়ল, উইলসন হাউসে গিয়ে গোয়েন্দাগিরির আশা ছাড়তে হলো কিশোরকেও। রাত দশটায় তার চাচী শুয়ে পড়লে দু-একবার বেরোনোর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। তার মনে হলো, এই দুর্যোগের মধ্যে আসবে না বোমার। সে-জন্যেই ততটা গরজ করল না।

পরদিন সবাই মিলে উইলসন হাউসে রওনা হলাম আমরা। রাস্তায় কাদা, পানি জমে আছে নিচু জায়গাগুলোতে।

ফগ যে চুরি করে আমাদের পিছু নিয়েছে, আমরা কেউই টের পাইনি, কিন্তু টিটুর তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তিকে ফাঁকি দিতে পারল না সে। পেছনে ফিরে গরগর করতে শুরু করল।

ফিরে তাকালাম আমরা। পলকের জন্যে দেখলাম একটা গাছের আড়ালে চলে গেল পুলিশের ইউনিফর্ম পরা একজন লোক। ঝামেলা র‍্যাম্পারকট ছাড়া যে আর কেউ নয়, কোন সন্দেহ রইল না তাতে আমাদের।

'মহা মুশকিল!' হতাশ হয়ে কপাল চাপড়াল মুসা। 'এই লোকটাকে খসাতে না পারলে কোন কাজই করতে পারব না! কি করা যায়?'

ঘন ঘন কয়েকবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। তারপর বলল, 'এক কাজ করব। একটা নোট লিখে ফেলে যাব। ঝামেলাকে অন্যদিকে চালান করে দিতে হবে।'

আমরা যে দেখে ফেলেছি, এটা ফগকে বুঝতে দিলাম না আমরা। কিশোরের পরামর্শে এগিয়ে চললাম। এক জায়গায় পথের মোড় পেরিয়ে অন্যপাশে আসতেই একটা বাড়ি পড়ল। এখানে থামতে বলল আমাদের সে। কাগজ-কলম বের করতে বলল আমাকে। কি লিখতে হবে বলতে লাগল:

কিশোর,

গহনা চুরি করেছে যে চোরগুলো, তাদের সন্ধান পেয়ে গেছি। অলিভার হিলসে এসে দেখা করো। জিনিসগুলো কোথায় লুকিয়ে আবার বের করে নিয়ে গেছে দেখাব,

—রবিন।

নোটটা পকেটে ভরে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম।

কিছুদূর এগিয়ে চট করে একবার ফিরে তাকাল মুসা। লুকিয়ে পড়তে দেখল ফগকে। মুচকি হেসে আমাদের জানাল সে-কথা।

গরগর শুরু করল টিটু। তাকে চুপ থাকতে বলল কিশোর। স্বর নামিয়ে আমাদের বলল, 'এখন কোনভাবে কাগজটা ফেলতে হবে, যাতে ফগের চোখে পড়ে।'

'এক কাজ করলেই হয়,' বুদ্ধি বাতলে দিল ফারিহা। 'তোমরা খেলতে শুরু করো। ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি করো। তখন কাগজটা পড়ে থাকতে দেখলে মনে করবে পকেট থেকে পড়ে গেছে।'

'বাহ্,' হাসল কিশোর, 'ভাল গোয়েন্দা হয়ে যাচ্ছ।'

প্রশংসায় খুশি হলো ফারিহা।

দুম করে কিশোরের পিঠে এক কিল মেরে বসল মুসা। বাঁকা হয়ে গেল কিশোর। তাড়া করল মুসাকে মারার জন্যে। আমি তার পিছু নিলাম। শুরু হয়ে গেল ছোটাছুটি। এক ফাঁকে কাগজটা মাটিতে ফেলে দিলাম।

আরেকটু হলেই সর্বনাশ করে দিয়েছিল টিটু। অসাবধানে পড়ে গেছে ভেবে শুঁকতে যাচ্ছিল, কড়া ধমক লাগাল কিশোর, 'ছুঁবি না, গাধা কোথাকার!'

অবাক হলো টিটু। সে তো ভাল কাজই করতে যাচ্ছিল। এর জন্যে কেন ধমক খেতে হলো, বুঝতে পারল না।

আবার আমাদের পথে চললাম আমরা।

খানিক দূর এগিয়ে যাওয়ার পর একটা বাড়ির আড়ালে সরে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

রাস্তার ওই জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছে ফগ। তাকিয়ে আছে আমাদের এদিকে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আচমকা নিচু হয়ে মাটি থেকে তুলে নিল কাগজটা। খুলে পড়ল। দূর থেকে তার মুখের ভঙ্গি কেমন হলো বুঝতে পারলাম না।

মুচকি হাসল কিশোর।

মুসা বলল, 'ফগের যা স্বভাব, ঠিক দেখতে চলে যাবে।'

কিশোর বলল, 'ফগকে অতটা বোকা ভাবা ঠিক না। দেখা যাক, কি করে। আমাদের চেষ্টা আমরা করলাম। চলো।'

উইলসন হাউসের গেটের ভেতরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠল মুসা, 'দেখো, দেখো!'

সবাই দেখলাম। সদর দরজার সামনে মাটিতে জুতোর ছাপ।

'কেউ এসেছিল,' উত্তেজিত হয়ে বলল কিশোর।

'নিশ্চয় বোমার,' আমি বললাম।

'এল কি করে, এই বৃষ্টির মধ্যে?' ফারিহার প্রশ্ন।

'গাড়ি ছাড়া আর কি?' নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর।

খুঁজতে লাগলাম আমরা। বাড়ির বাইরে পথের একপাশে বৃষ্টিভেজা মাটিতে দেখা গেল লম্বা, চওড়া দুটো দাগ। গাড়ির চাকার দাগ চিনতে পারলাম।

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'কিশোর, তোমার টেলিফোনে কাজ হয়েছে। দেখতে এসেছে লোকটা। কে, বোমারই? নাকি অন্য কেউ?'

আমি প্রস্তাব দিলাম গাছে উঠে ঘরের ভেতরটা দেখার জন্যে, কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

দেখা গেল হয়েছে।

'ওই যে স্টোভের ওপর চায়ের কেটলি,' ফারিহা বলল। 'আগের বার ছিল না।'

'তাকে দেখো,' মুসা বলল, 'খাবারের টিন! ওগুলোও ছিল না।'

'জানালায় রাখা বইগুলোও ছিল না,' কিশোর বলল। 'ঘরের ধুলোও পরিষ্কার করা হয়েছে। সোফায় পড়ে আছে দুটো কম্বল।'

'মানে কি এ সবের?'

'কেউ এসেছিল থাকার জন্যে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'কিংবা থাকতে আসার জন্যে তৈরি করেছে। আসবে। নিকলসন বোমার না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বাড়িটা তার, পয়সা দিয়ে কিনেছে। চুরি করে আসবে না। বাইরে গাড়ি রেখে হেঁটে ঢুকেছে রাতে বৃষ্টির মধ্যে, এ থেকেই বোঝা যায় চুরি করে ঢুকেছে। বাড়ির মালিক চুরি করে ঢুকবে কেন? যে লোকটা গোপনে এসেছে সে বাড়িতে থাকতেও চায় এমন ভাবে, যাতে কেউ টের না পায়।'

'ভেতরে ঢুকে দেখতে পারলে কাজ হত। কিন্তু পথ দেখতে পাচ্ছি না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল কিশোর। বলে উঠল, 'আমার মনে হয় পথ একটা দেখেছি।'

'কোনদিকে?' একসঙ্গে বলে উঠলাম আমরা তিনজন।

'এসো আমার সঙ্গে।'

গাছ থেকে নেমে কিশোরের সঙ্গে এগোলাম। বাড়ির পাশ ঘুরে রান্নাঘরের কাছে চলে এলাম। মাটিতে ম্যানহোলের ঢাকনার মত গোল একটা ধাতব জিনিস দেখাল। চারপাশ ঘিরে ঘাস জন্মে আছে। কিছু কিছু ঘাস দেখে মনে হলো, জুতো দিয়ে মাড়ানো হয়েছে। আগেই ব্যাপারটা চোখে পড়েছে তার। সে-জন্যেই আমাদের নিয়ে এসেছে। বলল, 'কোল-হোলের ঢাকনা। বাড়ির বাইরের কয়লা রাখার ঘরের। পুরানো অনেক বাড়িতে দেখেছি আমি এই জিনিস। ভেতর থেকেও মাটির নিচের কয়লা রাখার ঘরে ঢোকা যায়, বাইরে থেকেও। সুতরাং এটা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারব।'

'চলো ঢুকে পড়ি!' উত্তেজিত হয়ে বলল ফারিহা।

'গাধা!' রেগে উঠল মুসা, 'ঢুকি, তারপর কয়লায় কাপড়-চোপড়ের বারোটা বাজুক, মা ধরে ধোলাই দিক! কয়লার কালি কি করে লেগেছে, মাকে কি জবাব দেব?'

দমে গেল ফারিহা। করুণ চোখে তাকাল কিশোরের দিকে।

কিশোর বলল, 'কালি লাগুক আর না লাগুক, আমি ঢুকবই আজ রাতে।'

'রাতে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'রাতেই সুবিধে। লোকটা আবার এলে রাতেই আসবে। তা ছাড়া দিনে ঢুকে

ফগের চোখেও পড়তে চাই না। লোকটা কোনদিক থেকে উঁকি মেরে বসে থাকবে কে জানে!'

ফারিহা বলল, 'এত ঝামেলায় না গিয়ে ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ব্যাপারটা জানালেই পারি আমরা!'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'সত্যিই কিছু ঘটছে কিনা এখানে, না জেনে তাঁকে জানাব না। রহস্য ভেদ করার আগেই যদি পুলিশের কাছে গিয়ে ধরনা দিয়ে বসে থাকি, কি গোয়েন্দা হলাম?'

তেরো

বিকেলটা মুসাদের বাগানে কাটালাম আমরা। সন্ধ্যায় টিটুকে ওখানে রেখে চলে গেল কিশোর। রাতে বাড়ি থাকবে না, কুকুরটা একলা থেকে চেঁচামেচি শুরু করলে মেরিচাচী উঠে আসতে পারেন দেখার জন্যে।

সে-রাতে আমরা তো শুয়ে রইলাম বাড়িতে, কিশোর কি করল সেটা শোনো এবার। তার মুখ থেকে সব শুনে আমার মত করে লিখছি।

রাত ন'টায় ছদ্মবেশ নিতে বসল সে। পাটের আঁশের মত চুল আর খরগোশ-দেঁতো ফগরফ টগরফ সাজল।

চাচা-চাচী রকি বীচে গেছেন, কাজে, আসতে আসতে দু-তিন দিন।

রাত দশটায় জানালা টপকে বাইরে বেরোল কিশোর।

আকাশ তখন ভাল। অনেক বড় চাঁদ উঠেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। রাস্তা ধরে এগোতে কোন অসুবিধেই হলো না তার।

পাহাড় ডিঙিয়ে নেমে এল উইলসন হাউসের কাছে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল ভেতরে কেউ আছে কিনা। নেই। একটা পেঁচা ডাকল। ভাবতেই গা ছমছম করছে আমার। কিন্তু কিশোর নাকি ভয় পায়নি। ও আসলেই বড় দুঃসাহসী।

যাই হোক, বাড়ির আঙিনায় ঢুকল সে। চলে এল সেই জানালাটার নিচে। আলো নেই। তারমানে আসেনি তখনও কেউ।

বাগানের কোণের ছাউনিটাতে ঢুকল সে। কম্বল গায়ে দিয়ে আরাম করে বেড়ায় ঠেস দিয়ে বসল। কান পেতে রইল গাড়ির শব্দের আশায়।

কখন যে ঢুলতে আরম্ভ করেছে বলতে পারবে না। চমকে জেগে গেল হঠাৎ। ঘড়িতে দেখে বারোটা বাজে।

সর্বনাশ! এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল! লোকগুলো কি এসেছে? কিছুই তো টের পায়নি।

উঠে পড়ল সে। বাইরে বেরোল। চোখে পড়ার ভয়ে সরাসরি জানালার দিকে না গিয়ে বেড়ার ধার ঘেঁষে এগোল।

না, এখনও আসেনি কেউ। জানালা অন্ধকার।

দূর, আর ছাউনিতে গিয়ে ঢোকার কোন মানে হয় না, ভাবল সে। তার চেয়ে ঢুকে পড়ি। যা হয় হবে।

কোল-হোলের ঢাকনার কাছে এসে দাঁড়াল। টর্চের আলো ফেলে দেখল একবার। তারপর আঙটা ধরে টানল।

ভেবেছিল জোর লাগবে। তাকে অবাক করে দিয়ে সহজেই উঠে এল ঢাকনাটা। ভেতরে আলো ফেলে দেখল মেঝে কতটা নিচে। লাফিয়ে নামতে পারবে কিনা।

দেখল, এখনও অনেক কয়লা রয়েছে। বেশি নিচে না। ওই স্তূপের ওপর সহজেই নামতে পারবে। গায়ে কালি লাগবে আরকি। লাগুক, পরোয়া করে না। মেরিচাচী হয়তো জিজ্ঞেস করবেন কি করে লেগেছে, মুসার আম্মার মত বকাঝকা করবেন না। আর করলে করবেন। আগে কাজটা তো হয়ে যাক।

লাফ দিয়ে স্তূপের ওপর নেমে পড়ল সে। টর্চের আলোয় দেখল ঘরটা। একপাশ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে। স্তূপ থেকে নেমে গিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

সিঁড়ির মাথায় দরজা। নব ঘুরিয়ে খুলে ঢুকল একটা বড় ঘরে। একেবারে শূন্য, কোন আসবাব নেই। আরেক দরজা দিয়ে ঢুকল অন্য একটা ঘরে, রান্নাঘর। মেঝেতে দেখল কাদামাখা বড় বড় জুতোর ছাপ। কোল-হোলের ঘাস মাড়ানো, এখানে জুতোর ছাপ, তারমানে এদিক দিয়েই ঢুকেছিল লোকটা। কে সে? কি জন্যে এভাবে চুরি করে ঢুকেছে?

একের পর এক ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগল কিশোর। কোন ঘরেই আসবাব নেই। কোন লোকেরও সাড়া পেল না।

নিচতলার ঘরগুলো দেখা শেষ করে উঠে এল দোতলায়।

এখানেও কিছু নেই।

বাকি রইল তিনতলা। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে উঠে এল। কেউ থাকলে এখানে থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

সিঁড়ির পাশে প্রথম যে ঘরটা পড়ল তাতে ঢুকল। শূন্য। পরেরটাও শূন্য। তৃতীয় ঘরটায় পা দিয়েই বুঝল এটাই সেই ঘর, গাছে চড়লে যেটা দেখা যায়।

খোলা জানালা দিয়ে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। অনেক কিছুই চোখে পড়ে সেই আলোয়। ভাল করে দেখার জন্যে টর্চ জ্বালল সে। দিনের বেলা বাইরে থেকে দেখেছে অনেক কিছু। তবু বাইরে থেকে আর ভেতর থেকে দেখার মধ্যে অনেক ফারাক।

বালি ঝাড়া হয়েছে। তাকে রাখা টিনের খাবার। স্টোভে রাখা কেটলিতে পানিও ভরা আছে। টেবিলে একটিন চা পাতা। জানালায় রাখা বইগুলোর দু-একটা তুলে উল্টেপাল্টে দেখল বিদেশী ভাষায় লেখা, ভাষাটা সে চেনে না।

অনেক বড় সোফায় দুটো কম্বল রাখা। ইচ্ছে করলে বিছানা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ছাউনিতে না গিয়ে এখানেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল সে। কেউ এলে শব্দ শুনতে পাবে সহজেই। তখন চলে যেতে পারবে অন্য ঘরে। এতবড় বাড়িতে

সহজে তাকে খুঁজে বের করতে পারবে না লোকটা। তা ছাড়া সে যে আছে এটাই বা জানবে কি করে?

একটা দেয়াল আলমারির দরজা চোখে পড়ল। কৌতূহলী হয়ে উঠে এসে দাঁড়াল ওটার কাছে। ডিটেকটিভ বই পড়ে জেনেছে সে, নানা রকম তালা খোলার জন্যে বিশেষ ধরনের চাবি ব্যবহার করে গোয়েন্দারা, এই চাবিকে বলে স্কেলিটন কী। দোকানে খোঁজ করলে নাকি পাওয়া যায়।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোন দোকানে পাওয়া যায় জানতে পারেনি সে। শেষে ঠিক করেছে নিজেই বানিয়ে নেবে। নিজের ইচ্ছেমত অনেকগুলো নানা আকারের নানা ধরনের চাবি বানিয়ে গোছা করে নিয়েছে। গোছাটা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। অনেক ভারি। ঝুলে গেছে কোটের এক পকেট।

আলমারির তালা খোলার জন্যে সেটা বের করল। তাড়াহুড়ো না করে এক এক করে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতে লাগল তালায়। তাকে অবাক করে দিয়ে একটা চাবি সত্যি লেগে গেল, খুলে গেল তালা। যাক, কষ্ট করে চাবি বানানো সার্থক হয়েছে। নিশ্চিত হয়ে গেল, ভবিষ্যতেও অনেক কাজে লাগবে এই চাবির গোছা।

আলমারিতে একটা ছোট নোটবুক ছাড়া আর কিছুই নেই। ভেতরে অনেকগুলো নম্বর আর নাম লেখা। বোঝা গেল না কিছু। ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কাজে লাগতে পারে ভেবে বইটা পকেটে রেখে আবার আলমারির তালা লাগিয়ে দিল সে।

আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

সোফায় এসে বসল।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে। শীত লাগছে। পরনের কাপড়ে মানছে না। শুয়ে পড়ে গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিল সে। এবং ভুলটা করল।

কারণ, আরাম পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল তার। গভীর ঘুম।

চোদ্দ

কথার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের।

চোখ মেলে দেখে ঘরে আলো জ্বলছে। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে দু-জন লোক।

তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালার ভারি পর্দা টেনে দিল একজন, যাতে বাইরে আলো যেতে না পারে।

আরেকজন প্রশ্ন করল, 'কে ছেলেটা?'

একটানে কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে বসল কিশোর। সে-রাতে বোকার মত দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে মনে মনে কয়েকশো লাথি মারল নিজেকে।

দু-জনের মধ্যে একজন বেশ লম্বা, দাড়ি আছে, কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকটের মত গোল গোল চোখ। অন্যজন বেঁটে, পাতলা ঠোঁট, কুচকুচে কালো চোখ, মড়ার

মত রক্তশূন্য মুখের চামড়া।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল লম্বা লোকটা।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোর। যা ঘটার ঘটে গেছে, সেটা নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। এখন বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। না বোঝার ভান করল সে।

'কি হলো, কথা কানে যায় না?' ধমকে উঠল লোকটা।

'বুঝতে পারছি না,' বাংলায় বলল সে।

তার ভাষা বুঝতে পারল না লোকটা। 'কি বলছ?'

'বাংলা।'

'ইংরেজি জানো না?'

জবাব দিল না কিশোর। দিলেই বুঝে ফেলবে লোকটা, সে ইংরেজি জানে। হাঁ করে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

খাটো লোকটার দিকে ফিরে দাড়িওয়ালা বলল, 'কোন ভাষা বলল?'

'কি জানি?' গাল চুলকাল বেঁটে। 'জীবনেও শুনিনি! আমাদের বোকা বানাচ্ছে হয়তো। ব্যবস্থা করছি...'

পকেট থেকে বড় একটা ছুরি বের করল সে। ঝিক করে উঠল ফলা। এগিয়ে এসে কিশোরের একটা কান চেপে ধরে গোড়ায় ছুরি লাগাল। কঠিন ভয়ঙ্কর স্বরে বলল, 'তিন পর্যন্ত গুনব, এর মধ্যে জবাব না দিলে একটা কান কাটব। তারপর আরেকটা।'

মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে কিনা বুঝতে পারল না কিশোর। তবে অহেতুক ঝুঁকিও আর নিল না। লোকটা তিন বলার আগেই চেঁচিয়ে উঠল ইংরেজিতে, 'কান ছাড়ুন! ব্যথা লাগছে!'

হাসল লোকটা, 'সব রোগেরই ওষুধ আছে। এবার বলে ফেলো তো বাছাধন, এখানে কি?'

'আমি এতিম। বাড়িঘর নেই। খালি দেখে ঘুমাতে ঢুকেছি।'

'কি করে ঢুকলে?' জিজ্ঞেস করল লম্বা লোকটা।

'কোল-হোল দিয়ে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল বেঁটে লোকটার, 'এখানে এসেছ যে আর কেউ জানে?'

'কি করে জানব? কাউকে দেখিয়ে তো আর ঢুকিনি।'

'আবার চালাকি! ধরে এমন ধোলাই দেব, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব।'

ভয় পেল কিশোর। মনে হলো, *মড়াটাকে* দিয়ে সবই সম্ভব।

সে কিছু বোঝার আগেই ঠাস করে চড় পড়ল কানের ওপর। সামলে নেয়ার আগেই অন্য কানে আরেক থাবড়া। দুনিয়া আঁধার দেখতে লাগল কিশোর।

পানি এসে গেল চোখে। কয়েকবার মিটমিট করে নিয়ে তাকাল।

নিষ্ঠুর হাসিতে পাতলা ঠোঁট একটার ওপর আরেকটা চেপে বসল মড়াটার। বলল, 'এইবার চালাকি বন্ধ হবে আশা করি?'

ঢোক গিলল কিশোর, 'বলুন, কি জানতে চান?'

'ঘরটা খুঁজে পেলে কি করে?' প্রশ্ন করল দাড়িওয়ালা।

'আমার এক বন্ধু গাছে চড়েছিল। জানালা দিয়ে দেখে ফেলে।'

'আর কে কে জানে?'

'আমি আর আমার তিন বন্ধু।

'বয়স্ক কেউ জানে না?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। এর বেশি কিছু জানি না আমি। দয়া করে এবার ছেড়ে দিন।'

দ্রুত নিজেদের মধ্যে কথা বলল লোক দু-জন। একটা বর্ণও বুঝতে পারল না কিশোর।

আবার তার দিকে ফিরল লম্বা লোকটা। বলল, 'তোমার বন্ধুদের একটা চিঠি লিখে দাও, বলো—সাংঘাতিক একটা জিনিস পেয়ে গেছ এখানে। ওরা যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে।'

'কেন, ওদেরকেও আটকাবেন? অত বোকা ভাববেন না আমাকে। চিঠি আমি লিখব না।'

'লিখবে না, না?' শীতল হাসি হাসল মড়ার মত লোকটা। পকেট থেকে ছুরি বের করল আবার।

শিউরে উঠল কিশোর। এই লোকটার দৃষ্টিটাও ভয়ঙ্কর। বুকের ভেতর কাঁপুনি তোলে।

'এখনও বলো লিখবে কিনা?' ছুরি নাচিয়ে ধমক দিল লোকটা।

ঢোক গিলল কিশোর। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল।

লম্বা লোকটা বলল, 'ভাল চাও তো যা বলছি করো। কিছুক্ষণের জন্যে তোমাকে এখানে আটকে রেখে যাব আমরা। এসে যদি দেখি চিঠিটা লেখা হয়নি, বুঝবে মজা।'

দরজা লাগিয়ে দিয়ে গেলে এখান থেকে যে বেরোতে পারবে না, বুঝতে পারছে কিশোর। তবু লোকগুলো খানিকক্ষণের জন্যে চলে যাবে শুনে আশা হলো। হয়তো একটা ফন্দি বের করেও ফেলতে পারবে।

'কি লিখবে?' ধমক দিল লোকটা।

আস্তে ঘাড় কাত করে সায় জানাল কিশোর।

কাগজ-কলম বের করে দিল বেঁটে। বলল, 'কম কথা লিখবে। কোন চালাকি নয়। কি নাম তোমার?'

'কিশোর পাশা।'

হুঁ, লিখে ফেলো। তোমার বন্ধুরা এলে জানালা দিয়ে এটা ওদের সামনে ফেলে দেব। খবরদার, আমরা আসার আগে কিছু করার চেষ্টা করবে না। তাহলে মরবে।'

বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল লোকগুলো।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল পদশব্দ।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন আর কারও কোন সাড়াশব্দ পেল না, পকেট থেকে স্কেলিটন কী বের করল কিশোর। গিয়ে বসল দরজার কাছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তালা খুলতে পারল না। একটা চাবিও লাগল না তালায়।

শূন্য দৃষ্টিতে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে মনে মনে আরও কয়েক হাজার লাথি মারল নিজেকে।

পনেরো

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আকাশের অবস্থা খুব খারাপ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে থেকে থেকে। কুয়াশা তো আছেই।

কিশোর কি করেছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে দৌড় দিলাম মুসাদের বাড়ি। সে আর ফারিহাও অস্থির। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। বলল, একটা জরুরী কাজে মা দু-জনকেই আটকে দিয়েছেন, বেরোতে পারছে না। কিশোরও আসছে না। ওর একটা খোঁজ নেয়া দরকার।

ছুটলাম ওদের বাড়ি। গিয়ে দেখি নেই। বুক কেঁপে উঠল। তবে কি খারাপ কিছু ঘটেছে?

দিলাম আবার ছুট। ধরতে গেলে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতেই পাহাড় ডিঙিয়ে পৌছলাম উইলসন হাউসে। খুঁজতে লাগলাম কিশোরকে। ছাউনিতে দেখলাম কম্বল পড়ে আছে, তারমানে রাতে এখানে ছিল সে। দৌড়ে এলাম জানালার কাছে। তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকলাম।

ওপর দিকে তাকিয়ে জানালায় নড়াচড়া দেখলাম মনে হলো। হ্যাঁ, ঠিকই তো। বেরিয়ে এল একটা হাত। কিশোরের হাতই। একটা কাগজ ফেলল।

তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলাম সেটা।

একটা নোট। লিখেছে:

রবিন, মুসা, ফারিহা,

একটা মজার জিনিস পেয়েছি গোপন ঘরটাতে। বের করা দরকার। একা পারছি না। সবাই ঢোকো কোল-হোলের ভেতর দিয়ে। চেঁচামেচি কোরো না।

—কিশোর পাশা।

ধকধক করতে লাগল বুক। একবার মনে হলো কিশোরকে ডেকে জিজ্ঞেস করি ব্যাপার কি? কিন্তু চেঁচামেচি করতে নিষেধ করেছে সে। আমাদের তিনজনকে ঢুকতে বলেছে। তারমানে মুসা আর ফারিহাকেও দরকার। এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুট দিলাম মুসাদের বাড়িতে।

ওদের ছাড়া পেতে দেরি আছে। কাজ শেষ না করলে বেরোতে দেবেন না আন্টি। বারবার চিঠিটা পড়লাম আমরা।

ফারিহাও হাতে নিয়ে পড়ল। কি পেয়েছে জানার জন্যে তর সইছে না আমাদের। কিন্তু উপায় নেই। যেতে পারছি না।

নাক কুঁচকে কি যেন শুঁকতে লাগল ফারিহা। তার নাকের ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। বিড়াল উধাও রহস্যের সমাধান করার সময়ই বুঝেছি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কমলার গন্ধ!'

কি ভেবে শুঁকল কিশোরের নোটটা। 'আরি, গন্ধটা তো এতেই!'

ঘর মোছার ন্যাকড়াটা ছুঁড়ে ফেলে থাবা দিয়ে তার হাত থেকে নোটটা নিয়ে নিল মুসা। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল। বলল, 'এই রবিন, অদৃশ্য লেখা নেই তো এতে! পকেটে কমলা নিয়ে যাওয়ার কথা ওর!'

নোটটা আমি হাতে নিলাম। এই প্রথম মনে পড়ল, আমাদের কাছে চিঠি লিখলে কখনও নিচে 'কিশোর' ছাড়া আর কিছু লেখে না। এখানে লিখেছে পুরো নাম, কিশোর পাশা। এটা কি কোন সূত্র? আমাদের সন্দেহ জাগানোর জন্যে?

উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'মুসা, ইস্ত্রি!'

মুসার আগেই দৌড় দিল ফারিহা। ইস্ত্রি নিয়ে এল।

গরম করে কাগজে চেপে ধরতেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল আমাদের। কলমে লেখা লাইনগুলোর মাঝের ফাঁকে কমলার রসের অদৃশ্য কালি দিয়ে আরেকটা নোট লিখেছে কিশোর:

ভয়ানক বিপদে পড়েছি। আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে ফাঁকি দিয়ে তোমাদেরও এখানে ঢোকাতে চায়, যাতে আটকে ফেলতে পারে। খবরদার, বড় কাউকে না নিয়ে একা আসবে না। কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে ওদের, এখনও বুঝতে পারিনি,

—কিশোর।

হতবাক হয়ে বসে রইলাম আমরা। সবার আগে সামলে নিল ফারিহা, 'ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করো!'

ঠিক বলেছে। দরজায় গিয়ে দাঁড়াল মুসা, তার মা আসে কিনা পাহারা দিতে লাগল। আমি ডায়াল করলাম।

কিন্তু কপাল খারাপ, ক্যাপ্টেনকে পাওয়া গেল না। জরুরী কাজে বেরিয়েছেন।

কি করা যায়, ভাবতে লাগলাম। মুসা বলল, 'আর কোন উপায় নেই। ফগের কাছেই যেতে হবে।'

'যদি বিশ্বাস না করে?' বললাম।

'করবে। কারণ উইলনস হাউসে যে ঘোরাফেরা করেছি আমরা, দেখেছে।'

কিন্তু তাকেও পাওয়া গেল না। তার বাড়িঘর সাফসুতরো করে দেয় মহিলা, সে জানাল, সারারাত জ্বর-সর্দির জন্যে বেরোতে পারেনি মিস্টা ফগর‍্যাম্পারকট, এই খানিক আগে বেরিয়েছে। কোথায় গেছে, জানে না।

ফিরে এসে মুসা আর ফারিহাকে জানালাম দুঃসংবাদ।

মুসা বলল, 'তাহলে এবার আমাদেরই কিছু করতে হয়। ইস্, আমার মা-টাও আর সময় পেল না, এই সময় আটকাল…' কপালে চাপড় মারল সে।

'না আটকালেই বা কি হত?' বললাম, 'কিশোর আমাদের একা যেতে মানা করেছে। পুলিশ না নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। দেখি, খানিক পর আবার ফোন করব ক্যাপ্টেনকে।'

আমরা যখন কিশোরকে উদ্ধার করার জন্যে ছুটাছুটি করছি সে তখন কি করেছে বলে নেয়া যাক।

আবার ফিরে এল লোকগুলো। দেখল, লক্ষ্মী ছেলের মত চিঠি লিখে বসে আছে কিশোর। ওরা সবাই তখন আমাদের যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু আমাকে একা দেখে হতাশ হলো লোকগুলো, যদিও কিশোর খুশি হলো। তাকে বলল জানালার বাইরে আমাকে দেখিয়ে নোটটা ফেলার জন্যে।

আমি চলে যাওয়ার পর আবার অপেক্ষা করতে লাগল। আশা করল, খুব শীঘ্রি সবাইকে নিয়ে চলে যাব আমি।

কিন্তু গেলাম না দেখে অপেক্ষা করে করে অস্থির হয়ে উঠল ওরা। জরুরী কাজ ফেলে এসেছে। যেতেই হবে। বিদেশী ভাষায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ওরা। কিশোরের দিকে ফিরল লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটা। বলল, 'আমরা যাচ্ছি। আবার আসব। চালাকি করতে গেলে মরবে। একজন লোককে রেখে যাচ্ছি পাহারায়। সুতরাং পালানোর চেষ্টা করবে না। তোমার বন্ধুরা এলে কি করে আটকাতে হবে, বলে যাব ওকে।'

চুপ করে রইল কিশোর।

হাসল লোকটা। 'ভাবছ, ওরা এলে জানালা দিয়ে চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করে দেবে তাকে? পারবে না। এ ঘরে রাখবই না আর তোমাকে আমরা।'

কিশোরকে বের করে নিচতলায় নিয়ে এল ওরা। রান্নাঘরে ঢোকাল। তারপর কিছু খাবার আর পানি দিয়ে বলল, 'থাকো এখানে। যত তাড়াতাড়ি পারি কাজ শেষ করে চলে যাব আমরা। এ বাড়িটা আর নিরাপদ নয় বুঝতে পারছি। যাওয়ার আগে তোমার বাবা-মাকে ফোন করে দিয়ে যাব।'

'কিন্তু থাকব কি করে এখানে?' মিনমিন করে বলল কিশোর। 'ভয়ানক ঠাণ্ডা। দুটো কম্বল অন্তত দিয়ে যান?'

খিকখিক করে হাসল বেঁটে লোকটা। বলল, 'না, ওসব কিচ্ছু পাবে না। ঠাণ্ডার মধ্যেই থাকো। তোমার শাস্তি।'

তবে তাতে রাজি হলো না লম্বা লোকটা। বলল, 'না, এত ঠাণ্ডার মধ্যে থাকলে মরে যাবে। তার চেয়ে বটলকে বলো দুটো কম্বল এনে দিক। আটকে রাখলেই শাস্তি হবে। অহেতুক কৌতূহল দেখানো ভুলে যাবে জীবনের জন্যে।'

কম্বল এনে দিল বটল। দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকগুলো। অন্ধকারে একা একা বসে রইল কিশোর।

খিদেয় মোচড় দিচ্ছে পেট। খালিপেটে মাথা ঠিকমত কাজ করে না। তাই দেরি না করে স্যান্ডউইচ তুলে কামড় বসাল।

খাওয়ার পর ভাবতে বসল। লোকগুলো বলেছে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে যাবে। আর আসবে না এ বাড়িতে। তার আগেই বেরোতে হবে, ওদেরকে ধরতে হলে। কিন্তু বেরোবে কি করে সে? পাহারায় রয়েছে বটল।

এক কাজ করা যেতে পারে। কোল-হোল! তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখল সে, যে দরজাটা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছিল, সেটাতেও তালা লাগিয়ে দিয়েছে বটল। পকেট থেকে স্কেলিটন কী বের করল কিশোর।

এবারে ভাগ্য ভাল লেগে গেল একটা চাবি। আশায় আনন্দে দুলে উঠল মন। নিঃশব্দে বেরিয়ে আবার লাগিয়ে দিল তালাটা। পরের ঘরটা পার হয়ে এসে দাঁড়াল কয়লার ঘরের সিঁড়ির মাথায়। ভাবল, সে যে নেই এটা দেখে যদি এ পথে ধরতে আসে বটল? স্কেলিটন কী বের করে সিঁড়ির তালায় লাগাল। কপাল ভাল, প্রথম

চাবিটাই লেগে গেল। এদিক দিয়ে আর তাকে ধরতে আসতে পারবে না কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে নামতে শুরু করল সে।

অর্ধেক নামতেই কার যেন ভারি নিঃশ্বাস পড়ল। ধক করে উঠল কিশোরের বুক। লোক আছে এখানে!

লোকটাও উঠে আসতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। তার বাড়ানো হাত লাগল কিশোরের গায়ে।

শেষ মুহূর্তে আবার ধরা পড়তে চায় না কিশোর। লোকটা কে জানারও চেষ্টা করল না। যে-ই হোক, শত্রুপক্ষের, তাতে কোন সন্দেহ নেই তার। গায়ের জোরে এক ধাক্কা মেরে বসল।

এই আক্রমণ বোধহয় আশা করেনি লোকটা। পড়ে গেল নিচে। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল।

একটা মুহূর্তও নষ্ট করল না কিশোর। প্রায় লাফ দিয়ে পড়ল নিচের অন্ধকারে, কয়লার স্তূপের ওপর। ওপরে তাকিয়ে আবছা আলো চোখে পড়ল, কোল-হোলের ঢাকনার গোল ফোকর দিয়ে আসছে।

কয়লার স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে মরিয়া হয়ে লাফ দিল সে। ধরে ফেলল ফোকরের কিনার। হাতের ওপর ভর রেখে টেনে তুলে নিতে লাগল শরীরটা।

তার পা চেপে ধরল লোকটা।

গায়ের জোরে লাথি মেরে ছাড়িয়ে নিল কিশোর।

আবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল লোকটা।

ফোকরের বাইরে বেরিয়েই ঢাকনাটা নামিয়ে দিল কিশোর। তালা লাগানোর যে হুড়কোটা আছে, তাতে ঢুকিয়ে দিল একটা শক্ত কাঠি। নিচ থেকে ঠেলে আর কিছুতেই ঢাকনা খুলে উঠে আসতে পারবে না লোকটা।

একে শীতের দিন, তার ওপর আকাশ খারাপ, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে অসময়ে। বাড়ি যাওয়ার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে কিশোর, এই সময় কানে এল ভারি ইঞ্জিনের শব্দ। লরিটরি জাতীয় কোন গাড়ি হবে। কে আসছে? লোকগুলো? দেখার কৌতূহল সামলাতে না পেরে তাড়াতাড়ি এসে ঢুকল ছাউনিতে।

গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল একটা বড় গাড়ি। পাঁচজন লোক নামল। আবছা আলোতেও লম্বা আর বেঁটে লোকটাকে চিনতে পারল কিশোর। অন্য তিনজন অচেনা। সামনের দরজা খুলে ঘরে ঢুকে গেল ওরা।

যা দেখার দেখেছে। এইবার পালাতে হবে—সে যে পালিয়েছে লোকগুলো জানার আগেই। পা টিপে টিপে ছাউনি থেকে বেরিয়ে বেড়ার কাছে এসেছে, ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে খপ করে তার কাঁধ চেপে ধরল একটা হাত। কানের কাছে বেজে উঠল ভারি কণ্ঠ, 'কে তুমি?'

কণ্ঠস্বরটা কিশোরের অতি পরিচিত। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও ঘরের লোকগুলোর কথা ভেবে স্বর নামিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন রবার্টসন, আপনি!'

ষোলো

'তুমি আমাকে চেনো?' অবাক হলেন ক্যাপ্টেন। 'কে তুমি?'

ছদ্মবেশী কিশোরকে চিনতে পারেননি তিনি।

'ক্যাপ্টেন, আমি, কিশোর পাশা। ছদ্মবেশ নিয়েছি। আপনি এলেন কি করে এখানে?'

'তোমার বন্ধুদের ফোন পেয়ে। ওদের কথা থেকে তেমন কিছু বুঝতে পারিনি। তবে রহস্যময় মনে হয়েছে। তাই দেখতে এসেছি।...তোমাকে নাকি আটকে রেখেছিল? বেরোলে কি করে?'

সংক্ষেপে দ্রুত সব কথা জানাল কিশোর। পকেট থেকে বের করে দিল নোটবুকটা।

পাতা উল্টে একনজর দেখেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'হুঁ, বুঝেছি! কোডে লিখেছে, লোক আর চোরাই মালের নাম...কিশোর, আরেকটা কাজ করতে হবে তোমাকে। জলদি গিয়ে একটা ফোন করে আমার নাম করে বলবে এখানে ফোর্স পাঠাতে। আমি নির্দেশ দিয়ে এসেছি, খবর পেলেই যেন লোক পাঠায়। জলদি যাও।' নম্বরটা বললেন তিনি। একটা কোড নম্বরও বললেন। শুনলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের কথা বিশ্বাস করে ডিউটি অফিসার। মুখস্থ করে নিল কিশোর।

সবচেয়ে কাছের ফোন-বক্সটায় এসে ফোন করল।

কোড শুনেই সতর্ক হয়ে গেল অফিসার। বলল, 'ক্যাপ্টেনকে বোলো, রওনা হয়ে গেছি!'

বক্স থেকে বেরিয়ে কিশোরের মনে হলো, লোকগুলোকে ধরা হচ্ছে, দেখার এই মজাটা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয় তার বন্ধু, অর্থাৎ আমাদের। তাই বলার জন্যে মুসাদের বাড়িতে ছুটে এল সে।

ক্যাপ্টেনকে ফোনে সব কথা জানানোর পর সাংঘাতিক অস্থির হয়ে ছিলাম আমরা। তিনি আমাদের যেতে নিষেধ না করলে কোনকালে চলে যেতাম উইলসন হাউসে।

সারা গায়ে কালি মেখে ভূত সেজে থাকা কিশোরকে দেখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তুললাম। দু-চার কথায় আমাদের জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বলল সে। উইলসন হাউসে যেতে হবে মজা দেখার জন্যে।

এত দীর্ঘ সময় পর কিশোরকে দেখে যেন পাগল হয়ে গেল টিটু। ডাকাডাকি করে, নেচে-কুঁদে, হাত আর গাল চেটে দিয়ে অস্থির করে তুলল।

দল বেঁধে উইলসন হাউসে ছুটলাম আমরা।

গিয়ে দেখি পৌঁছে গেছে পুলিশ ফোর্স। ঘিরে ফেলেছে সারা বাড়ি। ঢোকার জন্যে তৈরি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন। আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন।

অনুরোধ করলাম, 'প্লীজ, ক্যাপ্টেন, আমাদের চলে যেতে বলবেন না। দেখতে এসেছি।'

দ্বিধা করলেন ক্যাপ্টেন। হাসলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, এসো।'

এগিয়ে গিয়ে সদর দরজায় টোকা দিলেন তিনি।

সাড়া এল না।

জোরে জোরে থাবা দিলেন।

এইবার খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছে বটল। বিস্ময়ে গোল হয়ে যেতে লাগল মুখের হাঁ। পেটে ঠেকল পিস্তলের নল। কঠিন গলায় নিচু স্বরে আদেশ দিলেন, 'টুঁ শব্দ করবে না!'

তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরও তিনজন অস্ত্রধারী পুলিশ।

আদেশ পালন করল বটল।

দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। নিঃশব্দে এগোলেন ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে। আমরা চললাম পেছনে।

তিনতলার সেই ঘরটার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। তালার ফুটো দিয়ে আলো আসছে। তারমানে ভেতরে আছে লোকগুলো।

আচমকা এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেললেন ক্যাপ্টেন। উদ্যত পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে কভার দিল তিনজন পুলিশ অফিসার।

'খবরদার, কেউ নড়বে না!' ধমক দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। 'বাড়ি ঘিরে আছে পুলিশে। তোমাদের খেল খতম।'

নড়ল না কেউ।

ঘরে চোখ বুলিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'বাসাটা ভালই বানিয়েছ, নটিংটন। এখন নিশ্চয় নিকলসন বোমার নাম নিয়েছ। ছদ্মনামের তো অভাব নেই তোমার,' লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। 'বিংহ্যাম, তুমিও আছ দেখি।' দাড়িওয়ালার দোসর বেঁটে লোকটাকে বললেন তিনি।

চুপ করে রইল দু-জনে।

তৃতীয় একজন বলল, 'আমি এর মধ্যে নেই, ক্যাপ্টেন। ফাঁকি দিয়ে বাড়ি দেখানোর নাম করে আমাকে নিয়ে এসেছে ওরা।'

'তাই, না?' কঠিন হাসি হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'ভেবেছ চিনতে পারিনি? অ্যানটিক চুরি বাদ দিলে কবে থেকে, বুখারভ? তোমাদের সবার ছবি আছে পুলিশের ফাইলে। বেলজিয়ান কাউন্টের অনেক দামী চীনা ভাসটার জন্যে ওখানকার পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে। জানি আমি।'

চতুর্থ আরেকজনের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুমিও বলবে নাকি, জিঁত্রো, ফাঁকি দিয়ে আনা হয়েছে তোমাকে? লাভ নেই। ফ্রান্সের পুলিশ খুঁজছে তোমাকে প্যারিসের গ্যালারি থেকে কয়েক লক্ষ ডলারের একটা ছবি চুরির অভিযোগে।'

পঞ্চম লোকটা নিজেই হাত তুলে বলল, 'থাক, আমাকে আর কিছু বলতে হবে না, ক্যাপ্টেন। নটিংটন গাধাটা যে এমন একটা বোকামি করবে কল্পনাই করিনি!'

'বোকামি নয়, সব অপরাধেরই শেষ আছে। সেটাই হয়েছে আরকি। চমৎকার একটা আস্তানা করেছিল তোমাদের নটিংটন। আন্তর্জাতিক ভাবে কুখ্যাত চোরদের

সঙ্গে হাত মিলিয়ে দু-হাতে টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করেছিল। চোরাই মাল নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখত এ বাড়িতে, তারপর খদ্দের ঠিক করে সুযোগ বুঝে পাচার করে দিত। বেশ চালাকির সঙ্গে করছিল কাজটা। কিছুতেই ধরতে পারছিল না পুলিশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেল কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ের কাছে।'

'বাচ্চা?' ভুরু কুঁচকাল নটিংটন।

বারান্দার দিকে ফিরে ডাকলেন ক্যাপ্টেন, 'এই, এসো তোমরা।'

সবার আগে ঢুকল ছদ্মবেশ পরা কিশোর।

তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল নটিংটন, 'তুমি বেরোলে কি করে! বটল গাধাটা কি করছিল?'

'নিশ্চয় বসে বসে বোতলামি করছিল। বটল থেকে ঢেলে মদ খাচ্ছিল। কি করে বেরিয়েছি, বলব না। সব গোপন কথা সবাইকে বলা যায় না।'

কিশোরের রসিকতায় হাসলাম আমরা।

ঘরে ঢুকল একজন পুলিশ। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'স্যার, নিচের কোন ঘরে মনে হয় আরেকজন লোক আছে।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল নটিংটন, 'অসম্ভব! আর নেই। আমরা ছয়জনই।'

'কিন্তু আছে। চিৎকার শুনতে পেয়েছে আমাদের একজন লোক। অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারছে না কোত্থেকে চিৎকার আসছে।'

ঘুরে তাকাল কিশোর, 'মনে হয় আমি পারছি। আসুন আমার সঙ্গে।'

পিস্তলের মুখে বন্দিদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিশ অফিসাররা।

ক্যাপ্টেন আর কিশোরের সঙ্গে চললাম আমরা।

সোজা আমাদেরকে কোল-হোলের ঢাকনার কাছে নিয়ে এল কিশোর। ঢাকনার হুড়কো থেকে কাঠিটা সরিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'পিস্তল রেডি রাখুন, স্যার।'

পুলিশের শক্তিশালী ইলেকট্রিক লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে অনেকখানি জায়গা। সেই আলোয় দেখা গেল, কয়লা রাখার ঘর থেকে অনেক কষ্টে মোড়ামুড়ি করে বেরিয়ে এল একটা ভূত। মানুষই, কয়লার কালিতে ভূতের মত লাগছে।

এ-কি! এ যে ঝামেলা র‍্যাম্পারকট!

এত পুলিশ দেখে সে অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেনের দিকে। কিছু বুঝতে পারছে না। তোতলাতে শুরু করল, 'ক্যা-ক্যা-ক্যা…'

'হ্যাঁ, আমি। এখানে আসার আগে তোমার ওখানে গিয়েছিলাম। শুনলাম অনেকক্ষণ থেকে তুমি গায়েব।'

'এখানেই আসছিলাম স্যার…' বলতে বলতে চোখ পড়ল ছদ্মবেশী কিশোরের ওপর। এগিয়ে এসে খপ করে চেপে ধরল তার হাত, 'ঝামেলা! এইবার পেয়েছি তোমাকে, খরগোশ-দেঁতো! আর ছাড়ছিনে!'

'ছাড়ো ওকে, গাধা কোথাকার!' ধমক দিলেন ক্যাপ্টেন। 'ওর জন্যেই তো ধরা পড়ল চোরগুলো।'

কিশোরের হাত ছেড়ে দিল ফগ। তাকে বোবা বানিয়ে দিয়ে একে একে পরচুলা, আলগা দাঁত টেনে টেনে খুলল কিশোর।

যাই হোক, ফগের কথায় জানা গেল, আমাদের চিঠিটা পেয়ে সেদিন ঠিকই অলিভার হিলসে গিয়েছিল সে। অনেক পরে বুঝেছে, বোকা বনেছে। কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি লেগে গিয়েছিল তার। ফলে কিশোর যে রাতে উইলসন হাউসে গিয়েছে, সে-রাতে আর বেরোতে পারেনি। পরদিন শরীর একটু ভাল লাগতেই বেরিয়ে পড়েছে। উইলসন হাউসের কাছে এসে গাড়ির চাকার দাগ দেখেছে। ভেতরে ঢুকে পায়ের ছাপ দেখেছে। কোল-হোলটা খোলা পেয়েছে। তার চারপাশে জুতোর চাপে ঘাস দেবে যেতে দেখেছে। সুতরাং দুয়ে-দুয়ে চার মিলিয়ে ঢুকে পড়েছে কয়লা রাখার ঘরে। আর এমনই কপালের কপাল, তার সামান্য পরেই ওখানে ঢুকেছে কিশোর। একটাই ভুল হয়েছে ফগের, সঙ্গে করে টর্চ নেয়নি। কিশোরের ওপর আলো ফেলতে পারলে হয়তো ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিত। তবে মাটির তলার ঘরে যে ঢুকতে হবে, এটা কল্পনাও করেনি ফগ, তাহলে টর্চ সঙ্গে না নেয়ার মত বোকামি করত না।

যাই হোক, আরেকটা চমৎকার রহস্যের সমাধান করলাম আমরা। তবে এর জন্যে বাহাদুরিটা প্রায় পুরোটা কিশোরের প্রাপ্য। আমরা তেমন কিছুই করতে পারিনি।

নেতা নির্বাচন সার্থক হয়েছে আমাদের।

****
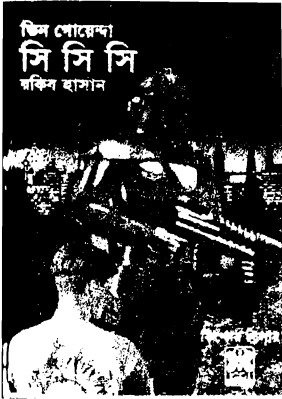
সি সি সি

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

'আমাকে তোমাদের নেতার কাছে নিয়ে যাও, হে মানবজাতি,' অদ্ভুত কণ্ঠে বলল ভিনগ্রহবাসী প্রাণীটা। 'কিংবা এমন কোনখানে, যে জায়গাটাকে তোমরা বেকুব পৃথিবীবাসীরা খাওয়ার জায়গা বলে থাকো।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভিনগ্রহবাসী প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর পাশা। কুকুর আর মানবাকৃতির রোবটের মিশ্রণ এই প্রাণীটা। বড় বড় কোঁকড়া চুলে ঢাকা রোমশ দেহ। চোখ দুটো একবার নীল একবার লাল হয়ে জ্বলছে। মাথার দুই পাশে দুটো সরু রূপালী অ্যান্টেনা নাড়া লাগলেই দুলে উঠছে। সামনের দুই পায়ের থাবায় পরেছে তিন আঙুলওয়ালা ধাতব দস্তানা।

পেছনের দুই পায়ে ধাতব বুট, হাঁটার তালে তালে ঝমঝম করে বাজে। কিশোর পাশা আর তার সহকারী গোয়েন্দা রবিন মিলফোর্ডের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। হাঁপানোর মত ফোঁসফোঁস শব্দ বেরোচ্ছে নিঃশ্বাসের তালে তালে।

'মনে হচ্ছে কুকুর-গ্রহ থেকে আগমন ঘটেছে এই উদ্ভট কুকুরে প্রাণীটার,' কিশোর বলল। 'চেটে চেটে আমাদের গা আঠা করতে আর সারা রাত চিৎকারে কান ঝালাপালা করে জ্বালানোর জন্যে।'

'আমার তা মনে হয় না,' রবিন বলল। 'যেখান থেকে আসুক না কেন, পৃথিবীতে তিষ্ঠোতে পারবে না এই হতচ্ছাড়া প্রাণী। যেখান থেকে এসেছে, শীঘ্রি আবার সেখানে ফেরত যেতে বাধ্য হবে। এখানকার অতিরিক্ত অক্সিজেনে শ্বাস নিতে পারবে না এটা।'

'কুকুরে-গ্রহ নয়,' জবাব দিল প্রাণীটা, 'আমি এসেছি জেপ্টন থেকে। জেপটনের আতঙ্ক আমি।'

তিন আঙুলওয়ালা থাবা তুলে একটানে কাঁধ থেকে আস্ত মাথাটা খুলে নিল প্রাণীটা। নিচে আরেকটা মাথা দেখা গেল। তাতে মুসা আমানের হাসি হাসি মুখ।

মুচকি হাসল কিশোর।

রবিন হাসল শব্দ করে।

'বাপরে, কি গরম এখানে!' মুসা বলল। 'আমার মাথায় ঢুকছে না, এ পোশাকটা যে আমার কাছে বেচেছে সে পরে থাকত কি করে!'

'পারত না বলেই হয়তো তোমার কাছে বেচে দিয়ে বেঁচেছে,' রবিন বলল।

'এ সম্মেলনের পুরোটা সপ্তা ধরেই পরে থাকবে নাকি তুমি এটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরে নাহ্,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আজকে পরেছি তার কারণ আজ সম্মেলনের পয়লা দিন। কাল রাতেও পরব, সি সি সি-তে। ফার্স্ট প্রাইজ কি জানো? ফ্লোরিডার টিকেট। মহাশূন্যে একটা রকেট নিক্ষেপ দেখার জন্যে।'

'দারুণ,' হেসে বলল রবিন। 'রকেটটায় চড়ে বসার অনুমতি জোগাড় করতে পারো নাকি দেখো। তাহলে সত্যিকারের স্পেস ক্যাডেট হয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করে আসতে পারবে। তা সি সি সি'টা কি জিনিস?'

'কসমিক কস্টিউম কনটেস্ট।'

'ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়াটা অত সহজ বলে মনে হচ্ছে না,' চারপাশে চোখ বুলিয়ে ভ্রূকুটি করল মুসা।

রকি বীচ ইন-এর লবিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তিন গোয়েন্দা। শহরের বাইরে চারতলা একটা বড় মোটেল। এক পাশের দেয়ালজোড়া জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে পড়ন্ত সূর্যের আলো। উল্টো দিকে এলিভেটরের দরজা। লবির দু'দিক থেকে চলে গেছে দুটো হলওয়ে। বেরিয়ে আছে খিলানের মত বাঁকা ছাতটা ধরে রাখা বড় বড় কাঠের বীমগুলো । একধারে পাথরের একটা ফায়ার প্লেস। তার কাছে সবুজ চামড়ায় মোড়া কিছু চেয়ার আর কাউচ রাখা।

দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়ে রাখা হয়েছে রঙিন পোস্টার। নানা রকম মহাকাশযান আর ভিনগ্রহ থেকে আসা দৈত্য-দানবের ছবি সেগুলোতে। কিশোরের মাথার ওপরে একটা কালো ব্যানার। তাতে লেখা রয়েছে: রকি বীচের প্রথম সাইন্স ফিকশন সম্মেলন রকিকন-এ স্বাগতম।

লবিতে এসে ঢুকল কতগুলো আজব প্রাণী।

কৌতূহলী চোখে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী মহিলা। কাঁধের কাছ থেকে বেরিয়ে গেছে ঘন পালকওয়ালা দুটো বড় বড় ডানা। তার দু'জন সঙ্গীর একজন সাত ফুট লম্বা একটা রোবট, ধাতব হাত-পা। অন্য সঙ্গীটি সবুজ আঁশওয়ালা একটা জীব। কুমিরের মত মুখ। কাঁধে বসে আছে একটা বড় পাখি। ওদের খানিক দূরে সম্মেলনে যোগ দিতে আসা আরও দুটো প্রাণীকে দেখা গেল। আদিম মানুষের মত সাজসজ্জা একজনের, অন্যজন একটা দানবীয় মাকড়সার মত।

'এ কোথায় এসে পড়লাম!' কিশোর বলল। 'এ তো পৃথিবী মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে অ্যানড্রোমেডা গ্যালাক্সিতে ঢুকে পড়েছি।'

'আজব এক অনুভূতি হচ্ছে আমার,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল রবিন। 'আমার নিজের দেহটা সত্যি তো, না ওরা স্বাভাবিক?'

'তোমারটাই স্বাভাবিক,' কিশোরের কাঁধের কাছ থেকে শোনা গেল একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর। 'এরা সব সাইন্স ফিকশন ফ্যান। বলতে গেলে একেবারে

খেপা ভক্ত। ওপরের ওসব উদ্ভট কস্টিউমের নিচে দেহটা তোমার-আমার মতই স্বাভাবিক।'

ঘুরে তাকাল কিশোর। কথা বলেছে আঠারো-উনিশ বছরের এক তরুণ। সারা মুখ তিলে ভর্তি। চুলের রঙ বাদামী। মুসার চেয়ে তিন-চার ইঞ্চি খাটো। গায়ে হলুদ শার্ট, পরনে কালো জিনস। বগলের নিচে চেপে ধরে রেখেছে বড় একটা ম্যানিলা খাম।

'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'আমাদের স্কুলেই পড়ো, তাই না?'

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে জবাব দিল ছেলেটা। 'আমি রোজার অরওয়েল। কয়েক মাস হলো রকি বীচে এসেছি।'

'হ্যাঁ, চিনেছি। মাত্র কয়েক মাসেই তো ভাল সুনাম কামিয়ে ফেলেছ। অংকের ক্লাসে নাকি কোন প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি করো না তুমি।'

'বাড়িয়ে বলে,' হাসল রোজার। 'তবে অংক ভাল লাগে আমার। এরা কি তোমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ও রবিন। আর আলফা সেঞ্চুরি থেকে আসা ওই রোবট কুকুরটার নাম মুসা আমান।'

তিন আঙুলওয়ালা চকচকে একটা থাবা বাড়িয়ে দিল মুসা। লাল-নীল চোখ উল্টে দিয়ে ভারী স্বরে বলল, 'তোমাকে জিপটনের স্বাগতম।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' হেসে জবাব দিল রোজার। 'এইমাত্র এলে নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন। 'এখনও বোঝার চেষ্টা করছি, কি সব ঘটে চলেছে এখানে। এ ধরনের সা-ফি কনভেনশনের সঙ্গে পরিচিত নই আমরা।'

'হুঁ,' ভুরু কুঁচকাল রোজার। 'তারমানে খানিকটা জ্ঞান তোমাদের দিতেই হচ্ছে। প্রথম কথাটাই হলো, সা-ফি শব্দটা ভুলেও উচ্চারণ করবে না। সাইন্স ফিকশনের ভক্তরা সেটাকে ভালভাবে নেবে না। সংক্ষেপে যদি বলতেই হয়, আদ্যক্ষর দুটোকে নিয়ে এস এফ বলবে, কিংবা সাদামাঠা সাইন্স ফিকশনই বলবে। আর এ ধরনের কনভেনশনকে সংক্ষেপে কন বলে ভক্তরা।'

'বাপরে!' মুসা বলল। 'সা-ফি···মানে, সাইন্স ফিকশনের ব্যাপারে বহুত কিছু জানা এখনও বাকি আমাদের।'

'সাইন্স ফিকশন কনভেনশনে এসে···ইয়ে, কন-এ এসে সাধারণত কি করে লোকে?' জানতে চাইল রবিন। পকেট থেকে ছোট একটা পুস্তিকা টেনে বের করে রোজারকে দেখাল। এখানে ঢোকার টিকেট কাটার পর দিয়েছে এটা। 'বেশ কিছু অদ্ভুত শব্দ আছে এতে, কি মানে ওগুলোর, কিছুই বুঝিনি। এই যেমন কন পার্টি, হাকস্টার রুম, ফিল্ক সিংগিং।'

শব্দ করে হাসল রোজার। 'কন পার্টি মানে কনভেনশন পার্টি, সেটা তো বুঝতেই পারছ এখন। তাতে সাইন্স ফিকশন ভক্তরা আসার সুযোগ পায়। কখনও কখনও সাইন্স ফিকশন লেখকরাও চলে আসে, আড্ডা দিতে।'

‘বুঝলাম। শুনতে খারাপ লাগছে না,’ রবিন বলল।

‘কিন্তু শুধুই কি আড্ডা দিতে আসে?’ কিশোরের প্রশ্ন।

‘প্রোগ্রামে তো দেখলাম আরও অনেক কিছুর কথা লেখা আছে।’

মাথা ঝাঁকাল রোজার। ‘আছে। কালকে আর রোববারে অডিটরিয়ামে যে আড্ডা বসবে, তাতে সাইন্স ফিকশন লেখক আর গবেষকরা সাইন্স ফিকশন নিয়ে আলোচনা করবেন। ভক্তদের প্রশ্নের জবাব দেবেন।’ বগলের খামটায় পরম যত্নে হাত বোলাল সে। ‘আর আমার মত যদি সংগ্রাহক হও, তাহলে এখানে এসে নানা রকম জিনিস জোগাড় করতে পারবে। পুরানো সাইন্স ফিকশন মুভির পোস্টারের কথাই ধরা যাক, সাংঘাতিক সব পোস্টার দেখতে পাবে। অনেক পুরানো এস এফ ম্যাগাজিনও পেয়ে যাবে খোঁজ-খবর করলে।’

‘না, ওসব সংগ্রহ শুরু করিনি আমরা এখনও,’ জবাব দিল রবিন। ‘করব বলেও মনে হয় না।’

‘আজ রাতে,’ রবিনের কথাটা শুনল বলে মনে হলো না রোজার, ‘একটা দুর্দান্ত ছবি দেখানো হবে।’

‘হ্যাঁ, শুনেছি,’ উজ্জ্বল হলো মুসার মুখ। ‘ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস। স্পেস হান্টার সিরিজের চারটে ছবিই দেখে ফেলেছি আমরা। নতুনটা দেখার জন্যে তর সইছে না।’

‘তা ঠিক,’ কিশোর বলল। ‘সব সময় তো আর রকি বীচে ভাল ছবির প্রিমিয়ার শো হয় না। শুনলাম ডিরেক্টর ওরটেগা মারলিন নিজে আসছেন ছবির শো দেখানোর জন্যে। তাঁর ফিল্ম সম্পর্কে নাকি বক্তৃতাও দেবেন।’

‘ঠিকই শুনেছ।’ ঘড়ি দেখল রোজার। ‘ছবি শুরু হতে আর ঘণ্টাখানেকও নেই।’

‘তাহলে তো দৌড়ে গিয়ে এই যন্ত্রণাগুলো খুলে রেখে আসতে হয়,’ দেহের সাজপোশাকগুলো দেখাল মুসা। ‘গাড়িতে কাপড় আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলো খুলে ফেলতে না পারলে সেদ্ধ হয়ে যাব।’

‘জলদি যাও তাহলে,’ বলতে গেল রবিন। কিন্তু ততক্ষণে ভিড় ঠেলে দৌড়াতে শুরু করেছে মুসা। পেছন থেকে চিৎকার করে বলল রবিন, ‘চিন্তা নেই। তোমার জন্যে সীট রেখে দেব আমরা।’

সম্মেলনের অনুষ্ঠানাদির তালিকায় আর কি কি অনুষ্ঠান আছে রোজারকে জিজ্ঞেস করতে যাবে কিশোর, থেমে গেল তীক্ষ্ণ এক চিৎকার শুনে। ‘উইলি, বুড়ো ভাম কোথাকার! আমি জানতাম তুমি আসবে। কি করে লিখতে হয়, ভক্তদের কাছে লেকচার দেয়ার সুযোগ কি আর তুমি ছাড়ো। লেখাফেখা বাদ দিয়ে টাকা উপার্জনের জন্যে সৎ কোনও পেশা ধরো না কেন?’

‘গলাবাজি থামাও,’ চিৎকার করে উঠল দ্বিতীয় আরেকটা কণ্ঠ।

‘ঘটনাটা কি?’ রোজারের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর। ‘মারামারি বাধাবে নাকি?’

‘না না। ওরা উইলিয়াম আরডেন আর হিরাম কারলু,’ রোজার জানাল। ‘প্রতি কনেই যোগ দিতে এসে এই কাণ্ড করে। ভয় নেই। প্রচুর চেঁচামেচি করে বটে,

কিন্তু এমনিতে ওরা বড়ই নিরীহ।'

লবির এক কোণে দু'জন লোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে জনতা। একজনের বয়েস পঁয়ষট্টি মত হবে। রোগাটে শরীর। পাতলা হয়ে এসেছে চুল। গায়ের সুতীর শার্ট আর প্যান্ট দুটোই অতিরিক্ত ঢোলা। অন্যজন বয়েসে তার অর্ধেক হবে। চোখা, ধারাল চেহারা। মাথায় কোঁকড়া বাদামী চুল।

'এখানে তোমাকে ঢুকতে দিল কে?' ঠাট্টা করে বলল বয়স্ক লোকটা। 'সামনের দরজা দিয়েই ঢুকেছ, নাকি অন্য কোন পথে, কিলবিল করে—তুমি যে প্রাণী?'

'কেউ তো কাউকে দেখতে পারে না এরা,' রবিন বলল।

'এত তাড়াতাড়িই মন্তব্য করে বোসো না,' রোজারের মুখে মৃদু হাসি। 'যা করছে, সব অভিনয়। এস এফ ভক্তরা হয়তো ভেবে ভয় পাচ্ছে, না জানি কোন্ সময় একজন আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরে। মনে মনে ভক্তদের কথা ভেবে মজা পাচ্ছে দু'জনে। খানিক পরেই দেখবে আর সবার মত ওরাও বসে বসে খোশগল্প করছে।'

তর্কাতর্কি করেই চলেছে লোক দু'জন। সেদিকে তাকিয়ে রোজারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'দু'জনেই লেখক নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রোজার। বয়স্ক লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'আরডেন একজন ওল্ড প্রো। সাইন্স ফিকশনের তথাকথিত স্বর্ণযুগের সময়কার যে কয়জন হাতে গোণা লেখক বেঁচে আছে এখনও, তাদের একজন। সাইন্স ফিকশন ম্যাগাজিনগুলোতে নিয়মিত লেখে এখন। এই সম্মেলনের খুব সম্মানিত অতিথি।'

'আর অন্য লোকটা? হিরাম কারলু?'

'বর্তমান সময়কার খুব জনপ্রিয় লেখক,' রোজার জানাল। 'লেখার জন্যে বহু পুরস্কার পেয়েছে। দোষ একটাই, বেশি কথা বলে। এই বদ স্বভাবের জন্যে মাঝে মাঝেই বিপদে পড়ে।'

'বেশি কথা তো দু'জনেই বলছে,' কিশোর বলল।

আবার ওদের দিকে তাকাল সে। বাগাড়ম্বর চালিয়েই যাচ্ছে দু'জনে ঘিরে রাখা ভক্তদের মাঝে দাঁড়িয়ে। ভক্তদের হাসাচ্ছে।

'ছবির তো দেরি হয়ে যাচ্ছে,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'তাড়াতাড়ি না গেলে ভাল সীট পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক বলেছ,' রোজার বলল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

লবির পেছন দিকে ওদেরকে নিয়ে এল সে। একটা হল পার করিয়ে এনে 'কনফারেন্স রুম' লেখা একটা দরজা দিয়ে অডিটরিয়ামে ঢুকল। বলল, 'এখানেই সিনেমা দেখানো হবে।'

বিশাল ঘরটায় সারি সারি ফোল্ডিং চেয়ার পাতা। অর্ধেক সীট ভরে গেছে ইতিমধ্যেই। দরজা দিয়ে এখনও ঢুকতেই আছে লোক স্রোতের মত। মোটামুটি পেছনে পাশাপাশি কয়েকটা সীট খালি দেখতে পেয়ে আর দেরি করল না ওরা। তাড়াতাড়ি বসে পড়ল সেগুলোতে। তিনটে সীটে নিজেরা বসল, আরেকটা রেখে

দিল মুসার জন্যে।

সীটে বসে চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। চওড়া একটা পর্দা টানানো হয়েছে সামনের দিকে। দুই ভাগ করা সীটের সারির মাঝখানের সরু গলিটার পেছনের চাকাওয়ালা টেবিলে বসানো হয়েছে মুভি প্রজেক্টর। পর্দার একপাশে একটা রঙচঙে পোস্টার। তাতে লাল রঙে লেখা রয়েছে ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস। লেখার পাশে লম্বা চুলওয়ালা, পেশিবহুল একজন লোকের ছবি। কালো রঙের দেহঢাকা বর্ম পরা। তার পেছনের পটভূমিতে রয়েছে তারকাখচিত কালো আকাশ, মহাকাশযানের ছবি আর বিস্ফোরণের দৃশ্য।

মুসার মতই ছবিটা দেখার জন্যে রবিনেরও তর সইছে না। 'স্পেশাল ইফেক্ট নিশ্চয় অনেক বেশি এটাতে। এর আগেরটা, ওয়ারিঅরস অভ দা ফরগটেন স্টার ছবিটাতে যে পরিমাণ ছিল, সাংঘাতিক! শুনেছি, নতুনটায় ওটাকে ছাড়িয়ে গেছে।'

'কি ব্যাপার, মিস করলাম নাকি কিছু?' মুসা বলে উঠল। বসে পড়ল ওর জন্যে দখল করে রাখা চেয়ারটায়। হাতে একটা মস্ত পপকর্নের ব্যাগ। বাড়িয়ে দিল বন্ধুদের দিকে।

'না, সময় মতই এসেছ,' ব্যাগ থেকে এক মুঠো পপকর্ন তুলে নিল কিশোর। পর্দার দিকে দেখাল।

পর্দার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কালো চুল এক মহিলা। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। হাতে মাইক্রোফোন। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করল।

'সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, মারলিন ওরটেগার নতুন ছবি ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস দেখতে আসার জন্যে আপনাদের অভিনন্দন,' আড়চোখে বার বার বাঁয়ের দরজাটার দিকে তাকাচ্ছে সে।

প্রচুর হাততালি আর শিস শোনা যেতে লাগল। সেটা কমে এলে চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে দিয়ে আবার বলল মহিলা, 'আমি মারলা ওয়েইন। এই সম্মেলনের চেয়ারওম্যান। এ ছাড়া রকি বীচ সাইন্স ফিকশন সোসাইটি, যেটাকে বি-এস-এফ-এস নামে চেনে সবাই, সেটার প্রেসিডেন্ট।' উচ্চারণটা শোনাল অনেকটা 'বিস্ফস্'।

'ছবির এই প্রিমিয়ার নিয়ে সবাই বেশ উত্তেজিত হয়ে আছি আমরা,' বলে চলল মহিলা। 'কারণ এই স্পেস হান্টার সিরিজটা সাইন্স ফিকশন ভক্তদের খুব পছন্দ। সে-জন্যেই মিস্টার ওরটেগা তাঁর নতুন ছবির প্রিমিয়ার শো'টা কোনও এস এফ কনে দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রকি বীচ কনকে তিনি বেছে নেয়ায় সত্যি আমরা খুব গর্বিত।'

ঘড়ি দেখল মহিলা। আবার তাকাল দরজার দিকে। মনে হলো অস্বস্তি বোধ করছে। 'আপনারা হয়তো আমাদের "বিস্ফস্"-এর ব্যাপারে জানতে আগ্রহী হবেন। ছবিটা দেখানোর আগে সে-সম্পর্কে দু'চারটে কথা বলে নিই।'

'আমরা এখন ছবি দেখতে চাই!' চিৎকার করে উঠল একজন দর্শক।

'আসলে, আমরা এখনও ছবিটা দেখানোর জন্যে তৈরি হতে পারিনি,' মহিলা জবাব দিল। 'মিস্টার ওরটেগার তো এতক্ষণে চলে আসার কথা। তিনি নিজে ছবিটা ইনট্রোডিউস করতে চান...'

দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল মহিলা। তাকে অনুসরণ করে চোখ ফেরাল কিশোর। সুদর্শন একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোককে দেখা গেল সীটের মাঝের গলি ধরে এগিয়ে আসতে। রোদে পোড়া চামড়া, মাথায় ইস্পাত রঙের চুল তাঁর। বেশ ব্যক্তিত্ব নিয়ে হেঁটে আসছেন। সঙ্গে আসছে সুট পরা আরও কয়েকজন মানুষ।

দেখেই চিনে ফেলল কিশোর। পত্রিকায় ছবি দেখেছে মারলিন ওরটেগার। তাঁর গা ঘেঁষে হেঁটে আসছে দু'জন বিশালদেহী লোক। বডিগার্ড হবে। পেছন পেছন যারা আসছে তাদের কেউ প্রাইভেট সেক্রেটারি, কেউ বা স্টুডিও এক্সিকিউটিভ। রুক্ষ চেহারার, লাল কোঁকড়া চুল, গোঁফওয়ালা একজন লম্বা মানুষকে চেনা চেনা লাগল কিশোরের।

মারলা ওয়েইনের পাশে দাঁড়ালেন মারলিন।

'মিস্টার মারলিন!' চিৎকার করে উঠল মারলা। 'কি যে খুশি লাগছে আপনাকে দেখে। আপনার নতুন ছবিটা দেখার জন্যে সবাই অস্থির হয়ে আছি আমরা।'

মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন ওরটেগা। তুমুল করতালি দিয়ে স্বাগত জানাল তাঁকে দর্শকরা। সিনেমার পর্দার একপাশে সরে গেল মারলা।

মুখ থমথমে করে রেখেছেন মিস্টার ওরটেগা। রাগত, ভারী কণ্ঠে জানালেন, 'আজ রাতে সিনেমা দেখানো হবে না।'

'দেখানো হবে না মানে?' রেগে উঠল একজন দর্শক। 'কতদূর থেকে এসেছি আমি জানেন!'

শ্রাগ করলেন ওরটেগা। 'ছবিটা দেখানোর কোন উপায় নেই। আজকে তো নয়ই, শীঘ্রি দেখানো যাবে এমনও কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।'

'কেন?' জানতে চাইল আরেকজন দর্শক।

'কারণ, ফিল্মটা নেই!' জবাব দিলেন ওরটেগা। 'চুরি হয়ে গেছে!'

দুই

'চুরি?' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'কি করে?'

'আমার এক অ্যাসিসট্যান্ট, একটা গাধা আমার শত সাবধান করা সত্ত্বেও ফিল্মটা গাড়িতে ফেলে রেখে এসেছিল। মোটেলে ঢোকার পর তার মনে পড়ল, গাড়ির মধ্যে রেখে এসেছে ওটা। দৌড়ে গেলাম পার্কিং লটে। পেলাম না আর ছবিটা।'

'ওসব বুঝিটুঝি না! আমার টাকা ফেরত দিন!' চিৎকার করে উঠল কে যেন।

'প্রচুর পয়সা খরচ করে কনভেনশনে এসেছি।'

'সেটা আমার সমস্যা নয়,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার ওরটেগা। 'কনভেনশনের ব্যবস্থা যে করেছে তাকে গিয়ে ধরুনগে। আরেকটা কথা,' জ্বলন্ত ঘূর্ণায়মান চোখে দর্শকদের দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি, 'আমার ফিল্মটা যে চুরি করেছে সে যদি এই অডিটরিয়ামে থেকে থাকো, তাহলে জেনে রাখো, সাত দিনের মধ্যে সেটা ফেরত দিতে হবে। নইলে আমি তোমাকে ছাড়ব না। যদি কেউ ছবিটার বুটলেগ কপি তৈরি করে বিক্রির চেষ্টা করে, তাকেও ছাড়ব না। বোঝা গেছে?'

কেউ তাঁর কথার জবাব দিল না।

মাইক্রোফোনের সামনে থেকে সরে গিয়ে, নিজের লোকদের সঙ্গে দু'চারটা কথা বলে সোজা দবজার দিকে রওনা দিলেন তিনি।

পরিচালক চলে যাওয়ার পর আবার মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়াল মারলা। সামান্য কয়েক কথায় দর্শকদের কাছে ক্ষমা চাইল। কেউ তাকে পাত্তা দিল না। সবাই উত্তেজিত।

'কাণ্ডটা কি ঘটল,' মুসা বলল। 'সারাটা সপ্তা অপেক্ষা করলাম আজকের দিনটার জন্যে, আর আজই কিনা ছবিটা চুরি হয়ে গেল।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'যা-ই বলো, মিস্টার ওরটেগার রেগে যাওয়াটা কিন্তু স্বাভাবিক। আমার জিনিস এ ভাবে চুরি হয়ে গেলে আমিও রেগে যেতাম। একটা ছবি বানানো কি যা তা কষ্ট।'

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না,' আবার বলল মুসা। 'ছবি চুরি করতে আসবে কে? আর কেনই বা করবে?'

'সেটা বলা কঠিন,' জবাব দিল রবিন। 'হয়তো বিক্রি করে দেবে।'

'কে কিনবে?' রোজারের প্রশ্ন।

'ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করে বেচলে অনেকেই কিনবে,' কিশোর বলল। 'সবার বাড়িতেই ভিসিআর আছে।'

তুড়ি বাজাল রবিন, 'ঠিক। বুটলেগ ভিডিও টেপ, মিস্টার ওরটেগা তো বলেই গেলেন। এ সম্পর্কে সেদিন একটা আর্টিক্যাল পড়লাম। নতুন ছবির ভিডিওটেপ বিক্রির বিশাল কালোবাজার আছে। বিশেষ করে যেগুলো মুক্তি পায়নি এখনও, এই ছবিটার মত।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মিস্টার ওরটেগার বানানো নতুন ছবির জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে দর্শকদের মাঝে।'

'পেলে আমিই তো কিনে ফেলতাম একটা কপি,' বলল মুসা। সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'কোথায় পাওয়া যাবে?'

মুসার হাতে ধরা ব্যাগ থেকে এক মুঠো পপকর্ন তুলে নিয়ে রবিন বলল, 'জেলে যেতে চাও নাকি? মিস্টার ওরটেগা কি হুমকি দিয়ে গেলেন ভুলে গেছ?'

'কিন্তু প্রশ্ন হলো,' দর্শকদের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে কিশোর বলল, 'এদের মধ্যে কে ছবিটা চুরি করল? ফিল্মকে ভিডিও টেপে রূপান্তর করতে যে

মেশিন দরকার, তার অনেক দাম। এখানে কে আছে সে-রকম টাকা খরচ করার মত লোক? কাকে সন্দেহ করা যায়?'

'সন্দেহ?' কুঁচকে গেল রোজারের ভুরু। 'সত্যি সত্যি তোমরা গোয়েন্দা, তাই না? শুনেছি, রকি বীচ পুলিশকে নাকি বেশ কিছু জটিল মামলায় সাহায্য করেছ তোমরা।'

'তা করেছি।'

'তারমানে মিস্টার ওরটেগার ছবিটা তোমরা খুঁজে বের করে তাঁকে ফিরিয়ে দেবে?'

'যদি তিনি আমাদের সাহায্য নিতে আগ্রহী হন।'

দরজার দিকে তাকাল কিশোর। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ওরটেগা। মারলা ওয়েইনের সঙ্গে কথা বলছেন। এ রকম একটা ঘটনায় হকচকিয়ে গেছে মহিলা। মিস্টার ওরটেগার রাগ এখনও যায়নি।

'চেহারা দেখে যা বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল, 'এই লোকের সঙ্গে বনবে না আমাদের। চোর ধরার ভারটা পুলিশের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল।'

উঠে দাঁড়াল মুসা। 'তাহলে আর কি। গোয়েন্দাগিরিও হলো না, ছবি দেখাও হলো না। বরং চলো কোন ফাস্ট ফুডের দোকানে চলে যাই।'

'মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'রোজার, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? খেয়েদেয়ে আবার ফিরে আসব এখানে।'

'যাব,' সানন্দে রাজি হলো রোজার। 'চলো।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল জনাকীর্ণ হলওয়ে ধরে দলবল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ওরটেগা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দৌড়ে চলেছে মারলা।

'প্লীজ, মিস্টার ওরটেগা,' অনুনয় করতে লাগল সে, 'দয়া করে বক্তৃতা দেয়াটা বন্ধ করবেন না। আপনার কথা শুনতে চাই আমরা।'

কিন্তু তাঁর কথা কানেই তুললেন না পরিচালক। গট্‌গট্‌ করে সোজা চলে যেতে লাগলেন লবির দিকে।

'বেচারি মারলা,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রোজার। 'এই কনটা ঠিক রাখার জন্যে বড় কষ্ট করছে। ওরটেগাই ছিল এই সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ।'

'আসলেই তাই,' রবিন বলল।

একজন সহকারীকে উকিল ডাকতে বললেন ওরটেগা। স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত হট্টগোল। জনতা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

লবির দিকে তাকিয়ে আচমকা রোজারকে অবাক হয়ে যেতে দেখল কিশোর। খাটো, টাকমাথা এক লোকের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তিরিশের কোঠায় বয়েস হবে লোকটার। হোটেলের সামনের প্রবেশপথের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার,' দ্রুতপায়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল রোজার। পেছনে গেল তিন গোয়েন্দা।

'আংকেল ম্যাক!' চিৎকার করে উঠল রোজার। 'তুমি এখানে কি করছ? আমি

তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে ম্যাসাচুসেটসে চলে গেছ তুমি।'

মুচকি হাসলেন আংকেল ম্যাক। ভঙ্গি দেখে মনে হলো কোন গোপন কথা চেপে রেখেছেন। চাচা-ভাতিজার চেহারায় বেশ মিল। গোলগাল মুখ দু'জনেরই।

'তোকে এখানে দেখতে পাব কল্পনাই করিনি,' আংকেল ম্যাক বললেন।

গোয়েন্দাদের দিকে ঘুরল রোজার। পরিচয় করিয়ে দিল, 'কিশোর, আমার চাচা, ম্যাক। ম্যাক অরওয়েল। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। চাচা, ওরা আমার বন্ধু। কিশোর, মুসা আর রবিন।'

তিনজনের সঙ্গেই হাত মেলালেন তিনি। মন অন্য দিকে। লবির ভিড়ের দিকে নজর।

'মারলিন ওরটেগার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল,' বললেন তিনি। 'একলা।'

'আজ রাতে আর কারও সঙ্গে তিনি কথা বলবেন বলে মনে হয় না,' হেসে বলল কিশোর।

'সে নিজেই আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে,' রহস্যময় হাসি ফুটল আংকেল ম্যাকের মুখে।

'ওই যে, এদিকেই আসছে,' বলে উঠল মুসা।

মুসার কথায় ঘুরে তাকাল চারজনেই। সামনের দরজার দিকে চলে যাচ্ছেন ওরটেগা। সঙ্গে তার দলবল। জনতাকে সরিয়ে পথ করে দিচ্ছে তাঁর দুই বডিগার্ড।

'এক্সকিউজ মী,' সোজা গিয়ে ওরটেগার পথরোধ করলেন আংকেল ম্যাক। 'মিস্টার ওরটেগা? আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?'

ফিরেও তাকালেন না ওরটেগা। এক তরুণ সহকারীর দিকে ফিরে ভারী গলায় বললেন, 'ব্রীফকেসটা রুমে ফেলে এসেছি। এনে দেবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দৌড় দিল লোকটা।

'চলো, আংকেল,' চাচার হাত খামচে ধরল রোজার। 'এখানে সময় নষ্ট না করে কোন রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খেয়ে আসি।'

কিন্তু জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন আংকেল ম্যাক। 'দাঁড়া, আগে মিস্টার ওরটেগার সঙ্গে কথাটা শেষ করে নিই। খুব জরুরী।'

আবার পরিচালকের দিকে এগোতে গেলেন তিনি, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়াল মারলা। বলল, 'মিস্টার ওরটেগা, ফিল্ম চুরির খবরটা আমি পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছি। এ রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, সত্যি আমি দুঃখিত।'

'আপনি দুঃখিত হওয়ায় কি আমার ফিল্মটা ফেরত চলে এল?' পাথরের মত কঠিন দৃষ্টি ওরটেগার চোখে। 'ওটা ফেরত চাই আমি। নইলে খুব তাড়াতাড়িই আপনি আর আপনাদের রকি বীচ ইন আমার উকিলের নোটিশ পাবেন।'

পরিচালকের কথায় আহত হলো মারলা।

'ফোটন খাওগে, বিদেশী কুত্তা!' আচমকা চিৎকার করে উঠল একটা

কণ্ঠ।

বরফের মত জমে গেলেন ওরটেগা। দরজার দিকে তাকালেন। চোখে অবিশ্বাস।

কিশোরও ফিরে তাকাল। দেখল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস ছবির হিরোর পোশাক পরা এক লোক। কালো বর্মে ঢাকা দেহ। মাথার হেলমেট মুখের কাছে মুখোশের মত নেমে এসেছে। গায়ের লম্বা আলখেল্লার ঝুল মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে।

অট্টহাসি হাসতে হাসতে হোলস্টার থেকে একটা জ্যাপ গান বের করে পরিচালকের দিকে নিশানা করল লোকটা।

টিপে দিল ট্রিগার।

গুলি ফোটার প্রচণ্ড শব্দ হলো। নল থেকে বেরিয়ে বুলেট ছুটে গেল বিস্মিত পরিচালকের দিকে।

তিন

শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে গেলেন ওরটেগা। প্রায় কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। পেছনের দেয়ালে একটা দুই ইঞ্চি গর্ত করে ফেলল। জনাকীর্ণ বদ্ধ লবিতে প্রতিধ্বনি তুলল কয়েক সেকেন্ড। সবগুলো চোখ ততক্ষণে ঘুরে গেছে কালো বর্ম পরা লোকটার দিকে।

ছুটে গেল কিশোর। লোকটার হাত থেকে টান দিয়ে কেড়ে নিল পিস্তলটা। অবাক হলো লোকটাকে বাধা দিতে না দেখে। হেলমেট সরিয়ে মুখ থেকে সরিয়ে দিল মুখোশটা। বয়েস একেবারে কম, চোদ্দর বেশি না।

ছুটে এসে ছেলেটার হাত চেপে ধরল ওরটেগার একজন বডিগার্ড। সরে দাঁড়াল কিশোর। পিস্তলটা তুলে দিল দ্বিতীয় গার্ডের হাতে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটাকে দেখছে কিশোর। বয়েসের তুলনায় লম্বা। সোনালি চুল হেলমেট খুলে নেয়াতে এলোমেলো হয়ে আছে। ফ্যাকাসে চামড়া। পিস্তলের গুলির শব্দ শুনে ছেলেটাও বোকা হয়ে গেছে যেন।

'আরেকটু হলেই তো দিয়েছিল শেষ করে,' কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। 'পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ভাল করেছ।'

'কিন্তু সামান্যতম বাধাও তো দিল না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এখানে।'

'বাধা আর দেবে কি,' মুসা বলল। 'গুলির শব্দে সে নিজেই তো ভড়কে গেছে।'

ছেলেটার কাছে এসে দাঁড়ালেন ওরটেগা। ছেলেটার দুই হাত পিঠের ওপর নিয়ে এসে শক্ত করে চেপে ধরেছে বডিগার্ড।

'তুমি কে? গুলি করলে কেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করলেন ওরটেগা। গলা

কাঁপছে তাঁর। রাগ তো আছেই, খানিকটা ঘাবড়েও গেছেন মনে হচ্ছে। 'তুমিই আমার ফিল্মটা চুরি করেছ নাকি?'

'আ-আ-আমার নাম জ-জনি,' তোতলাতে শুরু করল ছেলেটা। 'জনি জ্যাকার্থি। আপনাকে খুন করতে চাইনি। আমি জানতামই না ওটাতে গুলি ভরা আছে। আমার হাতে পিস্তলটা দিয়ে গুলি করতে বলে দিয়েছে আমাকে একজন, স্রেফ মজা করার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম এটা খেলনা পিস্তল।'

চাপ দিয়ে পিস্তলটার ম্যাগাজিন খুলে ফেলল দ্বিতীয় গার্ড। সত্যি খেলনা। অবাক হয়ে দেখল কিশোর জ্যাপ গানের খোলসের মধ্যে ছোট্ট একটা আসল পিস্তল ভরা। ট্রিগারের সঙ্গে জ্যাপ গানের ট্রিগারটা সুতো দিয়ে বাঁধা। সেজন্যেই জ্যাপ গানের ট্রিগার টিপতে আসল পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে গেছে।

'দেখুন কাণ্ড,' পিস্তলটা ওরটেগাকে দেখাল গার্ড, 'কি দিয়ে গুলি করতে চেয়েছিল আপনাকে। বহুত কষ্ট করেছে খুনী।'

পিস্তলটার দিকে এক নজর তাকিয়ে ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ছেলেটার দিকে তাকালেন আবার ওরটেগা। 'এটা কে দিয়েছে তোমাকে? এখনও এ ঘরে আছে নাকি সে?'

'এক সেকেন্ড আগেও ছিল,' লবিতে দ্রুত একপাক ঘুরে এল জনির চোখ। 'ওই ওখানটাতে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন তো আর দেখছি না।'

'দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

'না। কস্টিউম পরে ছিল,' জবাব দিল ছেলেটা। 'শজারুর মত এক ধরনের জীব আছে না আপনার ছবিতে, মিস্টার ওরটেগা, ওই রকম।'

'দারুণ,' না বলে থাকতে পারল না আর মুসা। 'শত শত লোক কস্টিউম পরে এসেছে এই সম্মেলনে। গত দশ মিনিটে পাঁচটা শজারু দেখেছি আমি। তারমধ্যে কোন লোকটা কে জানে!'

জনিকে ধরে রাখা গার্ডটার দিকে ঘুরলেন মিস্টার ওরটেগা। 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত ধরে রাখো। ওরা এসে যা করার করবে।'

'মিস্টার ওরটেগা, কি যে খারাপ লাগছে আমার বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে,' মারলা বলল। 'বুঝতেই পারছি না কি করে ঘটল এই ঘটনা। প্ল্যানিং কমিটি খেলনা পিস্তল নিয়ে ঢোকাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এখানে।'

জবাব দিলেন না ওরটেগা। আঙুলের ইশারায় সহকারীদের আসতে বলে দরজার দিকে রওনা দিলেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মারলা। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।

'আমার মনে হয়, ওই মহিলাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি আমরা,' কিশোর বলল। 'ফিল্মটা উদ্ধার করতে না পারলে মস্ত বিপদে পড়ে যাবে সে।'

'জনির হাতে পিস্তলটা কে দিয়েছে সেটা জানা দরকার না?' প্রশ্ন করল

রবিন। ‘ওকে কিন্তু মিথ্যেবাদী কিংবা ক্রিমিন্যাল মনে হচ্ছে না। আমার ধারণা ওরটেগাকে খুন করার জন্যে কেউ ওকে ব্যবহার করেছে।’

‘প্রথমে মহিলার সঙ্গে কথা বলা দরকার।’ মারলার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। ‘এক্সকিউজ মী, ম্যা'ম, একটা কথা বলি। মিস্টার ওরটেগার ফিল্মটা খুঁজে বের করার ব্যাপারে হয়তো আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব।’

‘কি বললে?’ হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মারলা। ‘কে তুমি?’

‘আমি কিশোর পাশা,’ পরিচয় দিল কিশোর। কাছে এসে দাঁড়ানো রবিনকে দেখাল, ‘ও আমার বন্ধু, রবিন মিলফোর্ড। শখের গোয়েন্দা।’ মুসা আর রোজার বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে। কাজেই ওদের পরিচয় আর দেয়া লাগল না।

‘ও, হ্যাঁ, নাম শুনেছি তোমাদের,’ এতক্ষণে বিস্ময়ের ভাবটা কাটল মারলার। ‘কিন্তু এ ব্যাপারে তোমরা কি করতে পারো? ফিল্মটা চুরি যাওয়ার জন্যেই আমাদের ছাড়তেন না মিস্টার ওরটেগা। তার ওপর এইমাত্র যা ঘটে গেল, তাতে কি যে করবেন তিনি কে জানে। শুধু ফিল্মটার দাম পরিশোধ করতে গেলেই বিস্‌ফসের কয়েক বছর লেগে যাবে। সদস্যরা কেউ ক্ষমা করবে না আমাকে।’

‘আমরা হয়তো সাহায্য করতে পারব আপনাকে,’ রবিন বলল। ‘যে লোকটা ফিল্ম চুরি করেছে, সে এখনও এ মোটেলে থেকে থাকলে খুঁজে বের করতে পারব আমরা। ফিল্ম ফেরত পেলে মিস্টার ওরটেগা নিশ্চয় আর আদালতে যাবেন না।’

আশার ক্ষীণ আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল মারলার চোখে। ‘তোমরা বলছ আশা আছে? কিন্তু ওই ছেলেটা, যে পিস্তল দিয়ে গুলি করল, তার কি হবে? চোরের সঙ্গে তার যোগসাজশ নেই তো?’

‘মনে হয় না,’ জবাব দিল কিশোর। ‘ও যা বলেছে, আমার বিশ্বাস, সত্যি কথাই বলেছে।’

‘হতে পারে,’ তার সঙ্গে সুর মেলাল রবিন, ‘যে লোক ফিল্মটা চুরি করেছে সে এখনও এ ঘরেই আছে, কিংবা খানিক আগেও ছিল। আর সেই লোকই পিস্তলটা ধরিয়ে দিয়েছে ছেলেটার হাতে। এ কারণেই ভাবছি, চেষ্টা করলে এখনও হয়তো ওকে ধরা যায়।’

‘চেষ্টা করতে দোষ নেই,’ মারলা বলল। ‘কমিটির সঙ্গে কথা বলব। পুলিশের সঙ্গেও কথা বলব। তবে সেই সঙ্গে ভিন্ন দিক থেকে সাহায্য পেলেও মন্দ হয় না। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।’

‘চোরটাকে ধরার পরই নাহয় ধন্যবাদটা দেবেন,’ হেসে বলল কিশোর। ‘এখন কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? এমন কারও কথা বলতে পারেন যে মিস্টার ওরটেগাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। যে খুন করতেও দ্বিধা করে না।’

শ্রাগ করল মারলা। 'ক্লাবের কেউ ব্যক্তিগত ভাবে তেমন চেনেই না ওরটেগাকে। তাঁর কোন শক্র থেকে থাকলে সেটা হলিউডে আছে, এখানে না।'

'কিন্তু এখানেও একজন অন্তত আছে, যে ফিল্মটা চুরি করেছে।'

'তোমাদের জানাতে পারলে খুশিই হতাম,' মলিন হাসি হেসে বলল মারলা। 'আচ্ছা, একটা কথা–শোর রেস্টুরেন্টে তাঁর স্পেশাল ইফেক্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে একটা মীটিং আছে মিস্টার ওরটেগার। রেস্টুরেন্টে ফোন করে তাঁকে বলতে পারি দু'জন দক্ষ গোয়েন্দাকে আমি নিয়োগ করেছি তদন্ত করার জন্যে। তাতে হয়তো তাঁর মেজাজ খানিকটা ঠাণ্ডা হবে।'

জবাবের অপেক্ষা না করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে হারিয়ে গেল মারলা। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

'ফিল্ম তো খুঁজে বের করে দেব বললাম,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন। 'কি ভাবে বের করব?'

'জনিকে জেরা করা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে,' জবাব দিল কিশোর।

'মন্দ হয় না,' রবিন বলল। 'চলো।'

এখনও একই ভাবে জনিকে ধরে রেখেছে ওরটেগার বডিগার্ডরা। আস্তে করে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে উৎসুক দর্শকদের সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। তার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে ছেলেটা ।

'এক্সকিউজ মী,' বডিগার্ডকে বলল কিশোর। 'একে যদি কয়েকটা প্রশ্ন করি আমরা, কিছু মনে করবেন?'

ষাঁড়ের মত কাঁধ আর গাছের গুঁড়ির মত মোটা ঘাড়ওয়ালা বডিগার্ড চোখ সরু করে তাকাল কিশোরের দিকে, 'তুমি তো পুলিশ নও।'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা সম্মেলনের লোক। এ ছেলেটার কাছ থেকে কিছু কথা আদায় করা প্রয়োজন আমাদের।'

'তাতে অবশ্য কোন ক্ষতির কারণ দেখছি না,' শ্রাগ করল লোকটা। 'তবে আমি সামনেই থাকব। ঠিক আছে?'

'থাকুন।' জনির দিকে ফিরল কিশোর। 'তোমার নাম তো জনি, তাই না? আমি কিশোর পাশা। তুমি বলেছ কয়েক মিনিট আগে একজন লোক তোমাকে পিস্তলটা দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ,' এখনও কাঁপছে ছেলেটা। 'সত্যি মিস্টার ওরটেগাকে গুলি করতে চাইনি আমি। কসম!'

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম'। যে লোকটা তোমাকে পিস্তল দিল, তার মধ্যে এমন কিছু কি লক্ষ করেছ, যেটা অস্বাভাবিক, কিংবা মনে রাখার মত? কিংবা এমন কিছু পরা ছিল, যেটা শজারু-কস্টিউমের সঙ্গে মেলে না?'

কয়েক সেকেন্ড ভাবল জনি। তারপর মাথা নাড়ল। 'উঁহু। শজারু-কস্টিউমটা বাদে···দাঁড়াও, দাঁড়াও! ছিল। গলায় একটা মেডালিয়ন।'

'মেডালিয়নটা দেখতে কেমন ছিল?'

'সবুজ রঙের,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জনি। 'পান্নাটান্না হবে। গোল। মাঝখানে আবার কিছু খোদাই করাও ছিল।'

'কি খোদাই করা ছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বাঁকা চাঁদ, তার মাঝখানে তারা।'

'যাক, একটা সূত্র অন্তত পাওয়া গেল,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি বলো?'

জবাব দেবার আগেই লবিতে দু'জন পুলিশকে ঢুকতে দেখল কিশোর। ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এল ওরা। গার্ড ওদের হাতে তুলে দিল জনিকে। কিশোরদেরকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তাকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ অফিসাররা।

মুসা বলল, 'আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার...'

'আমারও,' কিশোর বলল। 'চলো, বেরোই।'

কিন্তু দেয়ালে লাগানো একটা পোস্টার দেখাল রোজার। 'বাইরে যাওয়ার দরকার কি? এটা দেখো। তোমরা যখন ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছ, তখন লাগিয়ে দিয়ে গেছে একজন।'

পোস্টারের লেখাগুলো জোরে জোরে পড়ল কিশোর, 'অনিবার্য কারণ বশত ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস দেখানো সম্ভব হলো না; তবে আজ রাত নয়টায় কন পার্টির কোন নড়চড় হবে না। ঠিকমতই পার্টি হবে।'

'কন পার্টি?' বুঝতে পারল না মুসা।

বুঝিয়ে দিল রোজার। 'কনভেনশনের অফিশিয়াল পার্টি এটা। প্রচুর খাবার-দাবার, সোডা, সব বিনে পয়সায় খেতে দেবে।'

'বাহ্, দারুণ তো!' খুশি হয়ে উঠল মুসা। একেবারে আমার পছন্দের পার্টি। ভুল হয়ে গেছে। আরও অনেক বছর আগে থেকেই এখানে আসা উচিত ছিল।'

'মুসা একজন সিরিয়াস সাইন্স ফিকশন ফ্যান,' হেসে বলল কিশোর। 'কিন্তু রোজার, তোমার চাচাকে দেখছি না কেন?'

'মিস্টার ওরটেগার পেছন পেছন বেরিয়ে গেছে,' রোজার জানাল। 'বলতে বলতে গেছে, যে ভাবেই হোক, কথা বলতেই হবে তাঁর সঙ্গে।'

'কি এমন কথা, যেটা বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন তোমার চাচা, জানো কিছু?'

মাথা নাড়ল রোজার। 'আংকেল কথা খুব কম বলে। আজকে তো আরও চুপচাপ হয়ে গেছে।'

'চলো,' কিশোর বলল, 'পার্টিতে যাই। রোজার, পথ দেখাও। চেনো তো?'

'নিশ্চয়। এসো,' রোজার বলল। 'চারতলায়।'

লবির পেছনে মেইন এলিভেটরের কাছে ওদেরকে নিয়ে এল রোজার। এলিভেটরে চড়ে উঠে এল ওপরে। দরজা খুলতেই কানে এল দূরে পার্টির হই-

চইয়ের শব্দ। রোজারকে অনুসরণ করে বড় একটা স্যুইটে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

মূল ঘরটার সঙ্গে আরও অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর যুক্ত। প্রায় সব বয়েসের লোকজন আছে ওখানে। ছেলেমেয়ে থেকে বয়স্ক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আর খাচ্ছে। লম্বা লাল চুলওয়ালা যে লোকটাকে ওরটেগার সঙ্গে দেখেছিল তাকেও এখানে দেখল কিশোর। মসৃণ স্বরে কথা বলছে এক মহিলার সঙ্গে। ওদের কথা কানে এল কিশোরের। জানতে পারল, লোকটা সেদিন বিকেলেই রকি বীচে এসেছে এবং শহরটা তার খুব পছন্দ।

'কে লোকটা?' বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। 'আজকের আগেও তাকে দেখেছি মনে হচ্ছে।'

'আমি ওদিকে যাচ্ছি,' হাত তুলে স্যান্ডউইচ আর সোডায় ভর্তি লম্বা একটা টেবিল দেখাল মুসা। 'বিনে পয়সার খাবারেরা, একটু অপেক্ষা করো, আসছি আমি।'

'চলো, আমরাও কিছু তুলে নিই,' রবিন আর রোজারকে বলল কিশোর। 'খেতে খেতে দেখি জনি যে রকম সবুজ মেডালিয়নের কথা বলল, সে-রকম কেউ পরে আছে কিনা।'

'পরিচিত কিছু লোক দেখতে পাচ্ছি,' রোজার বলল। 'তোমরা তোমাদের কাজ করো, আমি বরং ওদের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

মুসার পেছন পেছন খাবার তুলতে গিয়ে ঘরের কোণে হাসাহাসির শব্দ শুনতে পেল কিশোর। সাইন্স ফিকশন লেখক ধূসর চুলো হিরাম কারলুকে দেখল, ভক্তরা ঘিরে রেখেছে।

টেবিল থেকে স্যান্ডউইচ আর সোডা তুলে নিয়ে সেদিকে এগোল তিন গোয়েন্দা, হিরাম কারলু কি বলে শোনার জন্যে। অল্প বয়েসে লেখক হিসেবে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, সে-সম্পর্কে সবে একটা মজার গল্প বলে শেষ করেছে কারলু। খুব হাসছে। উপভোগ করছে খুব। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন এ সময় মারলিন ওরটেগার কথা বলল।

'ওরটেগা?' খসখসে শোনাল কারলুর কণ্ঠ। 'ও তো একটা ভুয়া। জীবনে কখনও মৌলিক কোন চিন্তা তার মাথায় ঢোকেনি। জঘন্য সব ছবি বানায়। সাইন্স ফিকশন জগতের কলঙ্ক।'

ভুরু উঁচু করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, আবার ফিরল কারলুর দিকে। ওরটেগার ছবি চুরি করার জন্যে যথেষ্ট কোন কারণ কি আছে কারলুর?

'তবে যা-ই বলেন, মিস্টার কারলু,' রবিন বলল, 'ছবিটা চুরি হওয়াটা বড় দুঃখের ব্যাপার।'

'দুঃখের ব্যাপার?' রবিনের আপাদমস্তক ভালমত দেখল কারলু। 'আমি তো বলি এটাই সবচেয়ে ভাল কাজ হয়েছে। ওরকম কিছু ঘটাটাই তো ওর বেলায় স্বাভাবিক।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে লক্ষ করছে কিশোর। 'তার মানে? আপনার কথা

শুনে মনে হচ্ছে মারলিন ওরটেগাকে আপনি পছন্দ করেন না?'

জবাব দিতে গিয়েও কি ভেবে দিল না কারলু। 'থাক, ও সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই না। তবে ওর বিরুদ্ধে কথা বলে মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছি। যে কেউ এখন ভেবে বসতে পারে ওর ছবিটা আমিই চুরি করেছি।'

'সত্যি করেছেন?' বলে বসল মুসা। 'স্বীকার করছেন?'

'কি বললে?' শপাং করে উঠল কারলুর কণ্ঠ। 'এত বেয়াদব হয়ে গেছে আজকালকার ছেলেছোকরাগুলো! আদব-কায়দা কিচ্ছু নেই!'

ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার গল্প বলায় ফেরত গেল কারলু। কয়েক মিনিট শোনার পর সরে চলে এল তিন গোয়েন্দা। অন্য দিকে রওনা হলো।

'মনে হয় আমাদের প্রথম সন্দেহভাজন লোকটিকে পেয়ে গেছি, কি বলো?' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'ওরটেগাকে দেখতে পারে না কারলু, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু এতটাই কি দেখতে পারে না যে ফিল্ম চুরি করবে?'

'কিংবা খুন করতে চাইবে?' যোগ করল কিশোর। 'খোঁজ নিয়ে দেখা যাক, তার বিরুদ্ধে কি কি জানা যায়। চলো, ভাগাভাগি হয়ে খোঁজা শুরু করি আমরা। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে এক জায়গায় মিলিত হব আমরা।'

সরে এসে কয়েকজন সাইন্স ফিকশন ভক্তর সঙ্গে কথা বলল কিশোর। কিছুই জানতে পারল না। ফিল্ম চুরির ঘটনাটাই আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু কিশোর যা জানে, তার বেশি কেউ কিছু বলতে পারল না। সবুজ মেডালিয়ন পরা কারও কথাও জানা গেল না। ঘুরতে ঘুরতে রবিনের দেখা পেয়ে গেল আবার।

'আমিও কিছুই জানতে পারিনি,' রবিন জানাল। 'আজকের মত খোঁজাখুঁজি বাদ দেয়াই উচিত।'

মুসাকে দেখল ওরা একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে, ঠেলাগাড়িতে করে রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে আসছে মেয়েটা। রোজার কথা বলছে সম্মেলনে আসা কয়েকজন ভক্তর সঙ্গে।

তিন গোয়েন্দা নতুন কিছু জানতে পারেনি শুনে বলল, 'আমিও কিছু পারিনি। চলো, লবিতে। এখানে আর কিছু নেই।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ম্লান আলোয় আলোকিত হলওয়ে। শেষ মাথায় একজন ভক্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর। লম্বা লোকটার পরনে স্পেস সুটের মত পোশাক। পিঠে বাঁধা অক্সিজেন ট্যাংক। চেহারা দেখা যাচ্ছে না। ঢাকা পড়েছে ফেস মাস্কের তলায়।

'নিচে নামার এলিভেটর খুঁজছ?' মাস্কের নিচ থেকে ভোঁতা কণ্ঠ শোনা গেল লোকটার। 'এই যে, এদিকে।'

'আমি তো জানতাম,' জবাব দিল রবিন, 'এলিভেটর রয়েছে বিল্ডিঙের

মাঝামাঝি, লবিতে।'

'আমিও তো তা-ই জানতাম,' রোজার বলল। 'সেই যে প্রবাদ আছে–যতদিন বেঁচে থাকবে, প্রতিদিনই তুমি নতুন কিছু না কিছু শিখবে।'

লোকটার অন্যপাশে তাকাল রবিন। সত্যি একটা এলিভেটরের দরজা দেখা যাচ্ছে। দস্তানা পরা হাত বাড়িয়ে দেয়ালে বসানো বোতাম টিপে দিল লোকটা। দরজার ওপরের আলো মিটমিট শুরু করল।

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সম্মেলনে অনেকেই কস্টিউম পরে এসেছে। কিন্তু তার পরেও এই লোকটার মধ্যে কি যেন একটা গড়বড় রয়েছে। ধরা যাচ্ছে না ঠিক।

দরজা খুলে গেল এলিভেটরের। সামনে ঝুঁকল রবিন।

গড়বড়টা কি বের করে ফেলেছে কিশোর। সবুজ মেডালিয়ন পরে আছে লোকটা।

রবিনকে এলিভেটরে ঢুকতে বাধা দেয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। দরজা দিয়ে ভেতরে পা দিয়ে ফেলেছে রবিন। অস্ফুট একটা আতঙ্কিত শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। দরজার ওপাশে বাক্সটা নেই। পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরেছে তার। শূন্যে পড়েছে পা । মাটি রয়েছে চারতলা নিচে।

চার

মরিয়া হয়ে হাত ঘুরিয়ে নিজেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল রবিন। বাড়ানো পা'টা শক্ত কিছু ছুঁতে না পেরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

কি ঘটছে আঁচ করে ফেলেছে কিশোর। বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। লাফ দিয়ে গিয়ে রবিনের কোমর জড়িয়ে ধরল। টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে এল পেছনে পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়াল লোকটাকে ধরার জন্যে।

নেই লোকটা।

চলে গেছে।

'গেল কোনদিকে?' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'ওদিকেই তো গেল মনে হলো,' ডানে, হলের শেষ মাথার দিকে দেখাল রোজার। 'তাড়াহুড়ো করে ছুটে চলে গেল।'

'তা তো যাবেই,' বলে দৌড় দিল কিশোর।

শেষ মাথায় এসে দেখতে পেল দু'দিকেই সারি সারি দরজা রয়েছে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। যে কোনটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে লোকটা। কোনটা দিয়ে গেছে বোঝার কোন উপায় নেই।

হতাশ হয়ে বন্ধুদের কাছে ফিরে এল কিশোর।

'অবাক কাণ্ড,' এলিভেটরের দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে জানাল মুসা

'কারটা বোধহয় গ্রাউন্ড ফ্লোরেই রয়ে গেছে।'

'জীবনে যদি আর কোন দিন না দেখে লিফটে পা দিয়েছি তো!' বিড়বিড় করে বলল রবিন।

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। পকেট থেকে পেনলাইট বের করে এলিভেটরের শ্যাফটে আলো ফেলল। এলিভেটর বাটনের টারমিনালের সঙ্গে দুটো তার যুক্ত করে দেয়া হয়েছে, দেয়ালের উল্টো দিকে, শ্যাফটের দিকটায়। তার দুটো উঠে গেছে ওপরে, মোটরের দিকে, যেটা দরজার পাল্লা খোলা লাগানোর কাজ করে।

'এই দেখো,' কিশোর বলল, 'কারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাতে কারটা সিগন্যাল পাবে না, কিন্তু দরজা ঠিকই খুলবে বা বন্ধ হবে।'

গলা বাড়িয়ে শ্যাফটের ভেতরে দেখে রবিন বলল, 'হ্যাঁ। ওই স্পেস সুট পরা লোকটারই কাজ। গাধা বানিয়ে ছেড়েছে আমাদের।'

অন্ধকারে নিচের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে মুসা বলল, 'আরেকটু হলে লাশ বানিয়ে ছাড়ত।' ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে, 'কিন্তু আমাদের ওপর এই আক্রোশ কেন লোকটার?'

'আমরা যে ওরটেগার ফিল্মটা খুঁজে বের করার কাজে নেমেছি হয়তো জেনে ফেলেছে,' জবাবটা দিল রবিন। 'ভাবছি, এই লোকই ওরটেগাকে খুনের ষড়যন্ত্র করেনি তো?'

'ওর গলার দিকে তাকালেই জবাবটা পেয়ে যেতে,' কিশোর বলল।

'কি ছিল গলায়?' চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন। 'সবুজ মেডালিয়ন না তো?'

'হ্যাঁ। সবুজ মেডালিয়ন। চাঁদ-তারা খোদাই করা।'

'তারমানে এই লোকই জনিকে পিস্তলটা দিয়েছিল!'

'হ্যাঁ। জিনিসটা আরেকটু আগে লক্ষ করলেই ধরে ফেলতে পারতাম।'

'আরও সাবধান হওয়া উচিত তোমাদের,' রোজার বলল। 'শুধু ওরটেগা নয়, এখন তো দেখা যাচ্ছে তোমাদের জীবনের ওপরও হুমকি আসতে শুরু করেছে।'

'আমরা যে তদন্তে নেমে গেছি, জেনে গেছে মনে হয়,' কিশোর বলল। 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি জানল কি ভাবে!'

'ভয় নেই,' জবাব দিল মুসা, 'এরপর যদি ওরকম সবুজ মেডালিয়নওয়ালা কাউকে দেখি, আগে ঘাড় চেপে ধরব, কথা জিজ্ঞেস করব পরে।'

'পার্টিতে গিয়ে আরেকবার খোঁজ করা দরকার, স্পেস সুট পরা কাউকে কেউ দেখেছে কিনা,' কিশোর বলল। 'তবে সবার আগে মোটেল কর্তৃপক্ষকে ফোন করে জানিয়ে দেয়া দরকার এলিভেটরটার কথা, কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করে বসার আগেই।'

পার্টির স্যুইট থেকে লবিতে ফোন করল সে। দশ মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে

গেল মোটেলের দু'জন কর্মচারী। এলিভেটরের সামনে এসে গম্ভীর মুখে জানাল, সাবধান বাণী লিখে রাখা বোর্ডটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দরজার সামনে রাখা ছিল ওটা, এলিভেটরটা যে নষ্ট সাবধান করে দেয়ার জন্যে। তা ছাড়া ওটা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে তৈরিও হয়নি, মাল ওঠানো-নামানোর জন্যে ব্যবহার করে মোটেলের কর্মচারীরা।

পার্টিতে আরও আধঘণ্টা ব্যয় করল গোয়েন্দারা। কিন্তু স্পেস সুট পরা লোকটার খোঁজ কেউ দিতে পারল না। কেউ দেখেনি ওরকম কাউকে। অবশেষে রোজারকে নিয়ে লবিতে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। বাড়ি ফিরে যাবে। রোজার জানাল, সে আরও কিছুক্ষণ থাকবে। তাকে রেখেই হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'শূন্যে ভাসছে নাকি গাড়িটা?'

কন পার্টির পরের দিন সকাল বেলা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের পুরানো একটা ভ্যান গাড়িতে করে আবার মোটেলের সামনে এসে হাজির হয়েছে তিন গোয়েন্দা। ড্রাইভিং সীটে মুসা। পাশে কিশোর। মুসার ঠিক পেছনে বসে আছে রবিন। রকি বীচ ইনের পার্কিং লটে গাড়ি ঢুকিয়েছে মুসা। পঞ্চাশ ফুট দূরে, মোটেলের সদর দরজার কাছে যাওয়ার রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে যেখানে, ঠিক সেখানে এসে থেমেছে মসৃণ সাদা চকচকে একটা স্পোর্টস কনভার্টিবল কার। মনে হচ্ছে মাটি থেকে দুই ফুট ওপরে ভেসে রয়েছে। সামনের সীটে বসা লম্বা একজন হাসিখুশি চেহারার মানুষ। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। লাল গোঁফ। লাল কোঁকড়া চুল।

গাড়ির দিকে তেমন নজর নেই কিশোরের। নজর আরোহীর দিকে। 'কাল রাতে ওরটেগার সঙ্গে দেখেছি একে। আমি ভাবছি, এর আগে কোন্খানে দেখেছিলাম?'

গাড়ি থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। পার্কিং লটের মাঝখানে বড় একটা সবুজ তাঁবু টানানো রয়েছে। সেটার দিকে এক পলক তাকিয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে মোটেলের দিকে রওনা দিল সে। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল। আগের জায়গাতেই রয়েছে গাড়িটা। বেশ কিছু লোক জমে গেছে ওখানে, গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কানে এল, জোরাল হিসহিস শব্দ–যেন বিশাল বেলুন ফুটো হয়ে গিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে; গাড়িটা করছে এই শব্দ।

ভুরু কুঁচকে কিশোর বলল, 'ওরকম শব্দ আর কোথায় শুনেছি মনে করতে পারো? স্পেস হান্টার সিরিজের দুই নম্বর ছবিটার কথা মনে আছে? দা কসমিক মেইলস্ট্রম? ওটাতে খারাপ লোকেদের কাছে ছিল ওরকম গাড়ি।'

'ঠিক, ঠিক,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ। 'প্ল্যানেট অভ গ্লাস নামের গ্রহটাতে হিরোকে তাড়া করার সময় এ রকম গাড়ি ব্যবহার করেছিল ওরা। পাহাড়ের খাড়া ঢালের শেষ মাথায় গিয়ে শূন্যে ভেসে পড়েছিল দুটো গাড়ি।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' আচমকা প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন। 'কোথায় দেখেছি ওই লোকটাকে মনে পড়েছে। সাইন্স ম্যাগাজিনে মারলিন ওরটেগার ওপরে লেখা একটা প্রতিবেদনে এই লোকের ছবিও ছেপেছিল।'

'আরে, তাই তো!' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'এ জন্যেই তো চেনা চেনা লাগছিল আমার। প্রতিবেদনটা আমিও পড়েছি। ওর নাম হ্যারি প্যাটারসন। ওরটেগার ছবির স্পেশাল ইফেক্টের দায়িত্বে আছে ও।'

'ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে আমার,' রবিন বলল।

গাড়ির কাছে এসে দেখা গেল ভক্তদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে হ্যারি। বেশ মজা পাচ্ছে সে। গাড়িটার ছাত খোলা। ফলে ভালমত চোখে পড়ছে তাকে। ভক্তরা অনবরত প্রশ্ন করে চলেছে, জবাব পেতেও দেরি হচ্ছে না।

লম্বা কালো চুলওয়ালা একটা কিশোরী মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ গাড়িটাই গ্যালাকটিক সাগায় ব্যবহার করেছিলেন আপনি?'

'তা তো বটেই,' জবাব দিল হ্যারি। 'গত দুটো ছবিতেও ব্যবহার করেছি এটা। অনেক টাকা খরচ হয়েছে বানাতে, কাজেই পয়সা তো উসুল করতেই হবে।'

'আমি ভেবেছিলাম খেলনা গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল ছবিটাতে,' টাকমাথা একজন লোক বলল। 'এ রকম আসল গাড়ি দিয়ে শূটিং করা হয়েছে, কল্পনাও করিনি।'

'মডেল দিয়েও প্রচুর কাজ করতে হয় আমাদের,' হ্যারি জবাব দিল। 'অনেক ধরনের মডেল বানিয়েছি আমি, বিশেষ করে স্পেস শিপ। ওগুলোতে আরোহী দেখানো বড় কঠিন। কিন্তু আসল গাড়ি দিয়ে এ রকম হোভারকার বানালে তাতে আসল আরোহীও দেখানো যায়। পুতুল বানিয়ে মডেলের মধ্যে বসানোর দরকার পড়ে না। অনেক বাস্তব হয়ে যায় জিনিসটা।'

'কিন্তু ভাসিয়ে রাখছেন কি করে?' জানতে চাইল কিশোর। 'কোন ধরনের এয়ার জেট?'

'অনেকটা ওরকম জিনিসই,' হ্যারি বলল। 'ইঞ্জিনের সাহায্যে বেশ কয়েকটা শক্তিশালী ফ্যান ঘোরানোর ব্যবস্থা করেছি গাড়ির তলায়। বাতাসের চাপ গাড়িটাকে ভাসিয়ে রাখছে।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'গাড়ি জিনিসটা আমার খুবই পছন্দ। এ ধরনের হোভারকার কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে?'

হেসে উঠল হ্যারি। 'তা পাওয়া যাবে না। সারা দুনিয়ায় মাত্র কয়েকটাই আছে এ ধরনের গাড়ি। আমাদের কাছে। কিনে লাভ নেই। সাধারণ গাড়ির মত চালাতে পারবে না এগুলো। যতটা সম্ভব ভেতরের জিনিসপত্র কমিয়ে ওজনও কমাতে হয় ভাসিয়ে রাখার জন্যে। ভার বেশি হলে মাটিতে নেমে যেতে চায়। আর ফ্যানের যা বিকট শব্দ, পাগল হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'হলে হব,' গোঁয়ারের মত জবাব দিল মুসা। 'আপনি তো হচ্ছেন না। আমার

একটা দরকার। এ গাড়ি বাজারে ছাড়লে কোটিপতি হয়ে যাবেন অল্পদিনের মধ্যেই।'

'কোটিপতি আমরা হয়েই আছি,' হাসিমুখে জবাব দিল হ্যারি। 'অনেক কথা বললাম। এখন আমার যাওয়া দরকার। ওই তাঁবুর মধ্যে,' পার্কিং লটে খাটানো সবুজ তাঁবুটা দেখাল সে, 'একটা শো'র ব্যবস্থা করেছি আমরা. স্পেস হান্টার সিরিজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বিশেষ করে কস্টিউম দেখানো হবে ওখানে। বিকেল বেলা এলে আবার এ গাড়িটাতে আমার দেখা পাবে। আরও কিছু জানার থাকলে তখন জেনে নিতে পারবে।'

'আসব আমরা,' কিশোর বলল।

হোভারকার চালিয়ে চলে গেল হ্যারি।

'দারুণ দেখাল,' সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল রবিন। কিশোরের দিকে ফিরল। 'কাল রাতে ফিল্মটা মিস করেছি বটে, তবে দেখার আরও বহু কিছু আছে এখানে।'

'করারও আছে। যেমন, একটা চোরকে পাকড়াও করা,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, তা-ও আছে।'

মোটেলের সামনের কাঁচের দরজাটা খুলে ভেতরের লবিতে পা রাখল তিন গোয়েন্দা। সেখানে সাইন্স ফিকশন ভক্তদের ভিড়। আজ আরও অনেক বেশি লোকে কস্টিউম পরেছে। কিশোরের মনে পড়ল, বিকেলের দিকে কস্টিউম পার্টির শেডুল করা হয়েছে।

কিশোরের দিকে ফিরল রবিন। 'কি করব এখন?'

'আমাদের হাতে এখন একমাত্র সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিরাম কারলু,' কিশোর বলল। 'তার ব্যাপারে আরও খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করব।'

'সেই সঙ্গে ফিল্মটা কোথায় ভিডিওটেপ বানানোর জন্যে বিক্রি করে চোরটা,' মুসা বলল, 'সেটাও জানার চেষ্টা করব নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আচ্ছা, রোজার কোথায়?' চারপাশে তাকাতে লাগল সে। 'এ ব্যাপারে ও অনেকটাই সাহায্য করতে পারত।'

ঘরের কোণের দিকে আঙুল তুলল রবিন। 'ওই দেখো, ভিড়। আজ আবার কি হলো ওখানে?'

বকের মত গলা লম্বা করে দিয়ে তাকাল কিশোর। 'মনে হচ্ছে সেই তরুণ লেখক। কি যেন নাম বলেছিল রোজার? হ্যাঁ, উইলিয়াম আরডেন।'

'ও না হিরাম কারলুর বন্ধু?' রবিন বলল। 'এই লোক তথ্য দিতে পারবে আমাদের।'

'চলো গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।'

ভিড় ঠেলে আরডেনের কাছে চলে এল তিন জনে, যাতে প্রশ্ন করতে পারে।

সময় বেশ ভাল কাটছে মনে হচ্ছে লেখকের। বেশ গাট্টাগোট্টা গঠন। দামী সোয়েটার আর টাইট-ফিটিং প্যান্ট পরেছে। সুদর্শন চেহারা। সবুজ চোখে ধারাল দৃষ্টি। কোঁকড়া চুল। কথা বলতে পারে বেশ গুছিয়ে, শব্দ চয়ন করে অনেকটা

সিনেমার কমেডিয়ানের মত।

'স্পেস হান্টার মুভি?' এক ভক্তের প্রশ্নের জবাবে বলল আরডেন, 'ওসব ছাইপাঁশ ভাল লাগার কি কথা? আমার পড়শী যে সিনেমাই দেখে না, সে-ও এরচেয়ে ভাল ছবি বানাতে পারে।'

'কিন্তু, আরডেন,' আরেক ভক্ত বলল, 'ওরটেগার প্রথম ছবিটা অরবিট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। সাইন্স ফিকশন মুভির জন্যে বছরের সেরা পুরস্কার। আমার কাছে কিন্তু খুব ভাল লেগেছে ছবিটা।'

'তার পক্ষে বলার জন্যে কত টাকা ঘুষ দিয়েছে তোমাকে ওরটেগা?' ভুরু নাচিয়ে হাসল আরডেন, 'আর ছবির ব্যাপারে তোমার রুচি কি এতটাই খারাপ নাকি?'

'তারমানে ওরটেগার ছবি আপনার পছন্দ না মোটেও, তাই না?' আরেক ভক্ত জিজ্ঞেস করল।

'আমি কি সে-কথা বলেছি? ওরটেগার ফিল্ম আমার অপছন্দ নয়। তবে বড় বেশি সমালোচনার যোগ্য।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না,' ভক্ত বলল।

কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে রবিন বলল, 'মুখে যত যা-ই বলুক না কেন, এই লোকও কারলুর মত ওরটেগাকে দেখতে পারে না। হতে পারে, এই লোকই তাকে গুলি করাতে চেয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'তারমানে একেও সন্দেহভাজনের তালিকায় ফেলা যায়।'

'আরডেন,' হাসিমুখে ভক্তের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল সে, 'ওরটেগার ফিল্মটা কে চুরি করেছে আপনি জানেন?'

কিশোরের দিকে ফিরল আরডেন। 'ওরটেগার ফিল্ম কে চুরি করেছে জিজ্ঞেস করছ?' জবাবের অপেক্ষা না করে বলল, 'হ্যাঁ, আমি জানি।'

সামনে ঝুঁকল সে। যেন কি সাংঘাতিক এক গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে চাপা স্বরে বলল, 'কারলু। আমার পুরানো বন্ধু। হিরাম কারলুই চুরি করেছে মারলিন ওরটেগার ছবিটা।'

পাঁচ

ভিড় সরিয়ে আরডেনের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। সঙ্গে মুসা আর রবিন।

'আপনি বলতে চাইছেন, চুরিটা কে করেছে তাকে আপনি চেনেন?' লেখককে সরাসরি প্রশ্ন করল কিশোর। তার দিকে তাকিয়ে হেসে যখন মাথা ঝাঁকাল লেখক, কিশোর বলল, 'তাহলে পুলিশকে জানাচ্ছেন না কেন? মহাবিপদে পড়ে যাবেন কিন্তু শেষে।'

হাসিটা মুছল না আরডেনের। দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কে জানতে পারি কি? পুলিশের লোক? দেখো, আবার থানায় টেনে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে বোসো না।' চোখ বড় বড় করে ভয় পাওয়ার ভান করল সে। 'সত্যি বলছি, অফিসার, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। কালো অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল সব। জেগে উঠে দেখি আমার হাতে একটা পিস্তল। নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।'

হেসে উঠল শ্রোতারা। কিশোর হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, 'আমরা সিরিয়াস, মিস্টার আরডেন। এ কনভেনশনের উদ্যোক্তা যিনি, তিনি আমাদের বলেছেন চোরটাকে ধরে দিতে। আর প্রথম সূত্রটা পাওয়া গেল আপনার কাছ থেকে।'

চোখ উল্টে দিল আরডেন। 'তারমানে আমার কথা বিশ্বাস করে ফেলেছ তোমরা। আমি তো মজা করছিলাম। হিরাম কারলু ওরটেগার ফিল্ম চুরি করেনি। অন্তত আমার ধারণা, করেনি।'

'তাহলে তিনি করেছেন কেন বললেন তখন?'

'মজা করেছি। রসিকতা। ওর আর আমার মধ্যে সব সময়ই এ রকম রসিকতা চলতে থাকে,' আরডেন বলল। 'ওরটেগাকে দেখতে পারে না হিরাম। সব সময় সুযোগ পেলে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়। তাই ফিল্ম চুরির কথা শুনেই মনে হলো হিরামের কাজ না তো? তবে ও করেনি, এটাও ঠিক। হিরাম আর যাই হোক, ক্রিমিন্যাল নয়।'

'দেখে নেবে বলে কেন? শত্রুতাটা কিসের?'

'চৌর্যবৃত্তির কারণে,' শব্দটা কঠিন করেই বলল আরডেন। গুঞ্জন উঠল তাকে ঘিরে থাকা ভক্তদের মাঝে। 'আট বছর আগে স্পেস হান্টারের প্রথম ছবিটা মুক্তি পাওয়ার পর পরই হিরাম অভিযোগ করে, তার কাহিনী মেরে দিয়েছে ওরটেগা। এবং ভুল বলেনি সে। হিরামের লেখা ফেডারেশন অভ ওঅর্ল্ড সিরিজের কাহিনীগুলোর সঙ্গে মিলে যায় ওরটেগার স্পেস হান্টার সিরিজের কাহিনী, যেগুলো বহুকাল আগেই লিখে ছেপে প্রকাশ করেছিল হিরাম। ওরটেগার মুভির চেয়ে হিরামের উপন্যাসগুলো অনেক ভাল।'

'ওরটেগার বিরুদ্ধে তাহলে আদালতে নালিশ করল না কেন কারলু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'করেছে,' আরডেন জানাল। 'কিন্তু ওরটেগার মত টাকার জোর নেই হিরামের। ভাল উকিলকে অনেক টাকা দেয়া লাগে। আদালতে হিরামের অভিযোগকে তুলোধুনো করে ছেড়ে দিয়েছে ওরটেগার উকিল। কাহিনীর কিছু কিছু জায়গায় মিল আছে বটে, তবে সেটা কাকতালীয়।'

'তারমানে, এখন প্রতিশোধ নিতে চাইছে কারলু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। বুঝতে পারছে, সবগুলো চোখ এখন তার ওপর নিবদ্ধ।

'ইয়ে...' বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল আরডেন। চোখ সরু সরু করে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে। 'কে তোমরা বলো তো? একটু আগে বললে সম্মেলনের উদ্যোক্তা তোমাদের নিয়োগ করেছে ফিল্মটা খুঁজে বের করে দেয়ার

জন্যে।'

'হ্যাঁ। আমরা এই অপরাধের তদন্ত করছি,' জবাব দিল কিশোর। 'মাঝে মাঝে এ ধরনের কাজে পুলিশকেও সাহায্য করে থাকি আমরা। রকি বীচ থানায় খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন মিছে কথা বলছি না আমরা।'

'তারমানে গোয়েন্দা, হ্যাঁ?' মাথা ঝাঁকাল আরডেন। 'কিন্তু তোমাদের যা বয়েস, তাতে তো পুলিশ ফোর্সে যোগ দিতে দেবে না। যাকগে, হিরামের সম্পর্কে যা যা বললাম, সেটাকে সিরিয়াসলি নিয়ো না। প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে হয়তো তার আছে, কিন্তু সেজন্যে বেআইনী কিছু করার লোক নয় সে। বড়জোর কাউকে ভাড়া করে আনতে পারে ওরটেগার মুখে হালুয়া ছুঁড়ে মেরে তাকে বিব্রত করার জন্যে। তার বেশি কিছু করবে না। প্রথমে যা বলেছি তার সম্পর্কে, ভুলে যাও।'

'তা আপনার ব্যাপারটা কি, বলুন তো?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কিশোর। 'আপনি নিজেও তো ওরটেগার ফিল্ম সম্পর্কে যাচ্ছেতাই কথা বললেন। আপনি নিজেই তার গাড়ি থেকে ছবির রিলগুলো সরিয়ে ফেলেননি তো?'

'কারও কোন ছবির সমালোচনা করলেই চোর হতে হবে নাকি?' কিছুটা কড়া স্বরেই আরডেন বলল। 'এস এফ ম্যাগাজিনে বহু বছর ধরে ছবির সমালোচনা লিখে আসছি আমি। সিনেমা আমার ভাল লাগে। সেটা ভাল ছবি হলে। ওরটেগার পচা ছবিকে কে ভাল বলতে যাবে। ব্যক্তিগত ভাবে তার বিরুদ্ধে আমার কোন আক্রোশ নেই। তবে আমার বন্ধু হিরামের সঙ্গে সে যে আচরণ করেছে, তাতে তার ওপর রাগ হওয়াটা আমার স্বাভাবিক। রাগ না থাকলেও তার পচা ছবিকে পচাই বলতাম আমি।'

'বুঝলাম,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরডেনের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। মনে হলো, সত্যি কথাই বলছে লেখক। 'যাই হোক, এ চুরি সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য যদি কানে আসে আপনার, দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।'

'জানাব,' জবাব দিল আরডেন। দুই সহকারীকে নিয়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসার সময় কিশোর শুনতে পেল, আরডেন বলছে, 'অল্প বয়েসে কত ছেলের যে গোয়েন্দা হওয়ার শখ চাপে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। এ ধরনের মন্তব্য এই প্রথম নয়, বহুবার শুনেছে।

'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?' ভিড় থেকে সরে এসে কিশোরকে বলল রবিন। 'কাল রাতের স্পেস সুট পরা লোকটা ছিল লম্বা। কিন্তু কারলু আর আরডেন দু'জনেই মাঝারি উচ্চতার।'

'তাতে কি?' কিশোর বলল। 'ওই লোকটা তো ছিল কস্টিউমের আড়ালে। বুটের সোল উঁচু করে বানিয়ে ছদ্মবেশ নিলে নিজেকে লম্বা দেখানোটা কোন ব্যাপার নয়।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রবিন।

এ সময় রোজারকে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা।

'হাই,' দূর থেকেই হাসল রোজার। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর? খবর-টবর কি?'

'আরডেনের সঙ্গে কথা বলে এলাম এইমাত্র,' জবাব দিল রবিন। 'আস্ত একটা ভাঁড়।'

'ওটাই আরডেনের স্বভাব,' হেসে জবাব দিল রোজার।

'শোনো,' কিশোর বলল, 'আমি চুরির ব্যাপারটাকে বুটলেগ টেপের অ্যাঙ্গেল থেকে ভেবেছি। যদি কেউ ফিল্মটার বুটলেগ কপি বানিয়ে বিক্রি করে, কোথায় গিয়ে করবে সে? সাইন্স ফিকশন ছবির ভিডিও টেপ সাইন্স ফিকশন সম্মেলনে ভাল চলবে। কিন্তু চুরি যাওয়া একটা ছবির টেপ কি এখন এখানে বিক্রি করতে পারবে সে? বিশেষ করে যে ছবিটা এখান থেকেই চুরি গেছে?'

এক মুহূর্ত ভাবল রোজার। 'কি করবে কে জানে! ঝুঁকি নিয়ে বসতেও পারে, বিক্রি ভাল হবে জেনে। এ ধরনের বুটলেগ কপি আগের সম্মেলনে এখানে বিক্রি হতে দেখেছি আমি। হাতে বানানো লেবেল লাগানো থাকে ক্যাসেটের ওপর। দেখলেই চেনা যায়। ছবির মানও তেমন ভাল হয় না।'

'এখানে কোথায় ভিডিওটেপ বিক্রি হয় জানা আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে,' জবাব দিল রোজার। 'হাকস্টার রুমে।'

'কোথায়?' বুঝতে পারল না মুসা।

হেসে উঠল রোজার। 'হাকস্টার রুম। যে ঘরে দোকানিরা টেবিলের ওপর দোকান সাজিয়ে বসে। বই, ফিল্ম, পোস্টার—এ রকম আরও অনেক জিনিস পাওয়া যায়। সব সাইন্স ফিকশন কনভেনশনেই হাকস্টার রুম থাকে।'

'তাহলে তো গিয়ে দেখা দরকার,' কিশোর বলল। 'এখানে হাকস্টার রুমটা কোথায়?'

লবির শেষ মাথায় একটা দরজার কাছে ওদেরকে নিয়ে এল রোজার। ঠেলা দিয়ে খুলে অন্য পাশে নিয়ে এল তিন গোয়েন্দাকে। অনেক বড় একটা ঘর দেখা গেল। অসমাপ্ত ঘর। কাজ শেষ হয়নি এখনও। দেয়ালে প্লাস্টারের কাজ বাকি। সারি দিয়ে লম্বা লম্বা লোহার টেবিল পাতা। সারিগুলোর মাঝখানে জায়গা রাখা হয়েছে ক্রেতাদের ঘুরে ঘুরে দেখার সুবিধের জন্যে। প্রতিটি টেবিলের সামনে বসে আছে দোকানদার, পুরুষও আছে, মহিলাও আছে। টেবিলে স্তূপ করে রাখা নানা রকম জিনিসপত্র। ভক্তরা ঘুরে ঘুরে দেখছে। হাতে নিয়ে পছন্দ করছে। কিনছেও।

'ভাল তো,' রবিন বলল। 'মনে হচ্ছে আমিও কিছু কেনার মত জিনিস পেয়ে যাব।'

ভক্তদের ভিড়ে মিশে গেল তিন গোয়েন্দা। কিশোর লক্ষ করল, বুকে ছাপ দিয়ে 'আই উড র‍্যাদার বি টাইম ট্র্যাভেলিং' লেখা টি-শার্ট থেকে শুরু করে জনপ্রিয় পুরানো সাইন্স ফিকশন টিভি সিরিজে ব্যবহৃত কস্টিউম, সব আছে

এখানে। পুরানো পেপারব্যাক বইতে বোঝাই হয়ে আছে কোন কোন টেবিল।

'ভিডিওটেপ বিক্রেতারা কোথায়?' রোজারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরবার ডিক্সনের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো। ও-ই এ ব্যাপারে ভাল বলতে পারবে।' ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে লোকটাকে খুঁজতে লাগল রোজার। 'মনে হয় ওই ওদিকটাতে পাওয়া যাবে।'

রোজারের পেছন পেছন টেবিলের গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল চারজনে। অবশেষে একটা টেবিলের সামনে এসে পৌঁছল, যেখানে উজ্জ্বল রঙিন কাগজে মোড়া ভিডিওটেপ একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে উঁচু করে রাখা হয়েছে। টেপের পাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সিনেমার পোস্টার আর প্রচুর স্টিল ছবি। ভিনগ্রহবাসী সব দৈত্য-দানব আর স্পেস শিপের ছবিই বেশি। টেবিলের অন্যপাশে বসা পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়েসের একজন মানুষ। চোখে সার্বক্ষণিক ভাবে লেগে থাকা সন্দেহের ছাপ।

টেবিলের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকল কিশোর। উজ্জ্বল একটা হাসি দিয়ে বলল, 'এই যে, আমরা সাইন্স ফিকশন ভিডিওটেপের খোঁজে আছি। আপনার কাছে আছে?'

হাসির জবাবে হাসল না লোকটা। বরং কুঁচকে গেল ভুরু। আঙুল তুলে নীরবে টেবিলে রাখা ভিডিওটেপগুলো দেখিয়ে দিল। ঘাঁটতে শুরু করল কিশোর। দেখাদেখি রবিন আর রোজারও একই কাজ করতে লাগল। তবে মুসা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে গেল না।

খানিকক্ষণ ঘেঁটেঘুটে হতাশ ভঙ্গিতে মুখ তুলে আরবার ডিক্সনের দিকে তাকাল কিশোর। 'উঁহু, চলবে না এগুলোতে।' তারপর টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এমন কিছু আছে, যা বাইরের স্টোরগুলোতে পৌঁছায়নি এখনও?'

একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবল ডিক্সন। আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে হাত ঢোকাল টেবিলের নিচে। একটা ভিডিও ক্যাসেট বের করে তুলে দিল তার হাতে।

'এটা একেবারেই নতুন,' নিচু গলায় বলল ডিক্সন। 'আর কোনখানে পাবে না। সংগ্রহে রাখার মত।'

ক্যাসেটটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। সাদা কাগজে হাতে লেখা ছবির নাম দা ন্যানোটেক প্রজেক্ট। নামটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল সে। তাকাল আবার ডিক্সনের দিকে।

'কি রকম নতুন এটা?' জিজ্ঞেস করল। 'আমি জানতে চাইছি, এটা কি ইদানীংকার?'

'থিয়েটারেই যায়নি এখনও,' ডিক্সন বলল। 'এরচেয়ে নতুন আর কিছু পাবে না।'

'তাই নাকি?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'এ ধরনের নতুন ছবি আরও আছে নাকি আপনার কাছে?'

রবিনের দিকে তাকাল ডিক্সন। 'মানে?'

'না,' নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দিল রবিন, 'আমার সংগ্রহে সবচেয়ে নতুন জিনিস রাখতে চাইছি...'

'বেআইনী জিনিসের খোঁজ করছ নাকি?' ধারাল হয়ে উঠল ডিক্সনের কণ্ঠ। দ্রুত দৃষ্টি ঘুরে এল সারা ঘরে। কেউ নজর রাখছে কিনা দেখল যেন।

কিশোরের হাতের টেপটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'কেন, এটা কি বেআইনী?'

রাগ দেখা গেল ডিক্সনের চেহারায়। আচমকা হাত বাড়িয়ে একটানে ক্যাসেটটা কেড়ে নিল কিশোরের হাত থেকে। 'কিসের খোঁজ করছ তোমরা, বুঝতে পারছি না, খোকা,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে, 'কিন্তু আমি বেআইনী জিনিসের ব্যবসা করি না। তোমাদের কথাবার্তার ধরনও আমার ভাল লাগছে না। ক্যাসেট আমি বেচব না তোমাদের কাছে।'

'কিছু মনে করবেন না,' কিশোর বলতে গেল, 'আমার বন্ধু...'

'আমি বেচব না, ব্যস,' টেবিলের নিচে আগের জায়গায় আবার ক্যাসেটটা রেখে দিল ডিক্সন। 'যাও এখন। আমার টেবিলের সামনে থেকে সরো।'

করুণ দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

তার হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'চলো। এখানে আর কিছু করার নেই।'

টেবিলের কাছ থেকে সরে এল ওরা। সঙ্গে চলল রোজার।

'বেশি কথা বলতে গিয়ে সর্বনাশ করলাম,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল রবিন। 'এ ভাবে কেড়ে নেবে কল্পনাই করিনি। কিন্তু ভয় পেল কেন?'

'ভয়ের কোন কারণ নিশ্চয় আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর।

'শিওর পাইরেটেড জিনিস,' মুসা বলল।

'তাই হবে,' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল রবিন। 'রাগিয়ে দেয়ার মত তেমন কিছু তো আমি বলিনি...'

'বাদ দাও। আরি, মিস্টার কারলু না?'

কিশোরের নির্দেশিত দিকে তাকাল রবিন। বেরোনোর দরজার দিকে হেঁটে যাচ্ছে হিরাম কারলু। হাতে একগাদা বই, হাকস্টার রুম থেকে কিনেছে।

'যাব নাকি?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'পিছু নেব? দেখব কোনখানে যায়?'

'ঠিক এ কথাটাই ভাবছি আমিও,' জবাব দিল কিশোর।

'আমি আসব?' রোজার জিজ্ঞেস করল। 'তোমাদের কাজ-কারবারে বেশ মজাই তো পাচ্ছি আমি।'

'এসো,' কিশোর বলল। 'কোন বাধা নেই। তবে সাবধান থাকবে, যাতে বুঝে না ফেলে আমরা তার পিছু নিয়েছি।'

দরজা খুলল কারলু। বেরিয়ে গেল অন্য পাশে। দরজাটা লাগিয়ে না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর দরজা খুলে সে-ও অন্যপাশে চলে এল। ওপরতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দেখল কারলুকে।

কিন্তু ওপরে উঠে আর তাকে দেখতে পেল না।

'গেল কোথায়?' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'কোন দরজা খুলতেও তো শুনলাম না।'

'বুঝতে পারছি না,' গাল চুলকাল কিশোর। 'চলো দেখি, পরের তলায় উঠে যাই।'

তিনতলায় উঠেও কারলুকে দেখতে পেল না ওরা।

চারতলায় উঠল এরপর।

এখানেও দেখা গেল না কারলুকে।

'বাহ্, গোয়েন্দা না ছাই আমরা,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'চার-চারজন লোক; একটা লোকের পিছু নিয়ে হারিয়ে ফেললাম ওকে।'

হঠাৎ ওপর থেকে শব্দ হলো।

মুখ তুলল কিশোর।

ছায়াঢাকা ল্যান্ডিঙে অস্পষ্ট দেখা গেল কারলুকে।

'কে তোমরা?' ধমকে উঠল কারলু। 'আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

কারডিগান সোয়েটারের বুকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। বের করে আনল একটা পিস্তল। তাক করে ধরল গোয়েন্দাদের দিকে। ধমক দিয়ে বলল, 'যা জিজ্ঞেস করব, ঠিক ঠিক জবাব দেবে। নইলে বুঝতেই পারছ!'

ছয়

ঢোক গিলল কিশোর। এ রকম একজন বুড়ো মানুষের তুলনায় বড় বেশি স্থির কারলুর পিস্তল ধরা হাতটা। ভাবভঙ্গিতে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই।

'ইয়ে···হালো, মিস্টার কারলু,' কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে। 'কাল রাতে পার্টিটা কেমন লাগল?'

আলোয় এসে দাঁড়াল কারলু। ভ্রূকুটি করল। 'হ্যাঁ, চিনেছি তোমাকে। কাল রাতে জানার চেষ্টা করেছিলে, ফিল্ম চুরিতে আমার কোন হাত আছে কিনা।'

'সরি, স্যার,' আড়চোখে পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'একটু বেশি কথাই বলে ফেলেছি। দয়া করে খারাপ ভাবে নেবেন না।'

'না নিয়ে তো পারছি না,' কর্কশ কণ্ঠে কারলু বলল। 'কে তোমরা? ওরটেগার চুরি যাওয়া ফিল্ম নিয়ে তোমাদের এত আগ্রহ কেন?'

বড় করে দম নিল কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা, মিস্টার কারলু। ফিল্মটা খুঁজে

বের করতে আমাদের নিয়োগ করা হয়েছে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে।'

'তোমাদের কি ধারণা ফিল্মটা আমি চুরি করেছি?'

'আপনাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে,' অস্বীকার করল না কিশোর।

'কারণটা কি?'

'আপনার সঙ্গে ওরটেগার শত্রুতা। আপনি বলছেন আপনার কাহিনী মেরে দিয়েছে তার ছবিতে।'

চোখ উল্টে সিলিঙের দিকে তুলে ফেলল কারলু। 'তারমানে উইলি বলেছে এ সব তোমাদের। ওটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সে-জন্যেই তোমরা আমার পিছে লেগেছ ফিল্মটা কার কাছে নিয়ে গিয়ে আমি বেচে দিই দেখার জন্যে, তাই না?'

'ঠিকই ধরেছেন, স্যার।'

'ভুল করেছ। আমি যাচ্ছি আমার ঘরে, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। বিকেল আর সন্ধ্যায় দু'দুটো প্যানেলে শেডুল আছে আমার। বয়েস হয়েছে, বিশ্রাম না নিলে যোগ দিতে পারব না। আমার ঘুমানোর ব্যাপারে কোন আপত্তি আছে তোমাদের?'

'না, স্যার,' জবাব দিল রবিন।

'পিস্তলটা নামানোর ব্যাপারেও নিশ্চয় কোন আপত্তি নেই আপনার?' রসিকতা করে হাসার চেষ্টা করল কিশোর। 'আগ্নেয়াস্ত্র দেখলে ভীষণ ভয় লাগে আমার।'

'ও, এটা,' পিস্তলটার দিকে তাকাল কারলু। 'ভয় পেয়েছ, না?'

কিশোরের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল সে। চিৎকার দিয়ে সরে গেল কিশোর। কিন্তু গুলি বেরোল না। পিস্তলের নল থেকে বেরোল শুধু একটা কমলা নিশান, তাতে লেখা: জ্যাপ! ইউ আর স্টার ডাস্ট!

'আমার নাতির জন্যে কিনলাম,' হেসে বলল কারলু। 'ভাল, তাই না?'

দম আটকে ফেলেছিল মুসা। আস্তে করে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আরেকটা জ্যাপ গান। কনে দেখা যাচ্ছে ছড়াছড়ি এগুলোর চেনাই যাচ্ছিল না। একেবারে আসলের মত।'

'ভাগ্যিস,' কিশোর বলল, 'এটার মধ্যে আসল পিস্তল লুকানো নেই।'

'যাই হোক, আমাকে এখন মাপ করতে হবে,' কারলু বলল। 'আমি আমার রূমে যাচ্ছি। বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে তারপর দেখা করব উইলির সঙ্গে। ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেই ছাড়ব আজ।'

একটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল কারলু। তাকিয়ে রইল সেদিকে কিশোর।

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন 'কারলুর আচরণ দেখে মনে হয় ওরটেগার ফিল্ম চুরি করেছে?'

'কি করে বলি?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'ধরা পড়ার আগে বেশির ভাগ অপরাধীকেই দেখে মনে হয় না সে অপরাধী

'তা বটে। তা ছাড়া কারলু একবারও বলেনি যে সে ফিল্মটা চুরি করেনি। চুরি করার পক্ষে সবচেয়ে বড় মোটিভ তারই রয়েছে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কথা হলো, আর কাকে কাকে সন্দেহ করা যায়? ভিডিওটেপওলা ডিক্সনও এতে জড়িত নেই তো? ফিল্মটা কারলু চুরি করে নিয়ে গেছে, বুটলেগ কপি করতে তাকে সাহায্য করছে ডিক্সন, হতে পারে না এ রকম?'

'তা তো পারেই,' রবিন বলল। 'রোজার, তোমার কি মনে হয়, ডিক্সনের ব্যাপারে?'

এতক্ষণ ওর দিকে তাকায়নি কেউ, এখন তাকিয়ে দেখল মোমের মত হয়ে গেছে রোজারের মুখ। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দাদের দিকে।

'রোজ রোজ এই কাণ্ডই করো নাকি তোমরা?' কিশোররা তাকাতেই জিজ্ঞেস করল সে। 'এ ভাবে পিস্তলধারী ক্রিমিন্যালদের মুখোমুখি হও? ওটা সত্যিকারের পিস্তল হলে এতক্ষণে মেঝেতে পড়ে থাকতে রক্তাক্ত দেহে।'

'না,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর, 'রোজ রোজ কি আর পিস্তলধারীদের সামনে পড়ি নাকি। তবে পড়ি মাঝেমধ্যে। সেগুলোর বেশির ভাগই আসল।'

'দারুণ! দারুণ!' কপালের ঘাম মুছল রোজার। 'তোমাদের সঙ্গে থাকাটা তো এখন রীতিমত বিপজ্জনক দেখতে পাচ্ছি।'

'তাহলে কি ভয় পেয়ে সরে যাবে?' হাসল কিশোর। 'সম্মেলনটা আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখালে খুশি হতাম।'

ঘড়ি দেখল রোজার। 'দশ মিনিটের মধ্যে আমার চাচার একটা অনুষ্ঠান আছে। যাবে দেখতে?'

'কি অনুষ্ঠান?' জানতে চাইল রবিন।

'কম্পিউটার সাইন্স। যাবে?'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'আমি ভাবছিলাম, কারলুর ঘরে ঢুকব। চোরাই ফিল্মের রিলগুলো আছে কিনা দেখতে।'

'কিন্তু সে তো এখন ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'তারচেয়ে চলো রোজারের চাচার অনুষ্ঠানটাই দেখে আসি। ভাল লেগেও যেতে পারে।'

কম্পিউটারের ওপর যে কোন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে আপত্তি নেই কিশোরের। মুসারও না। সুতরাং নিচতলার একটা কনফারেন্স রূমে এসে ঢুকল ওরা।

নিরাশ হতে হলো না ওদের। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের ওপর নিজের আবিষ্কৃত এমন চমৎকার সব জিনিস দেখিয়ে দিলেন মিস্টার অরওয়েল, মুগ্ধ না হয়ে পারল না তিন গোয়েন্দা।

'কম্পিউটার আর ইলেকট্রনিক্সের জাদুকর তিনি,' মন্তব্য করল মুসা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'আসলেই তাই,' রোজার বলল। 'ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি চাচাকে, সর্বক্ষণ কিছু না কিছু বানানো নিয়ে মেতে থেকেছে। একটা রোবট বানিয়েছে, যেটা বাড়িতে তার চাকরের কাজ করে। খবরের কাগজ পর্যন্ত এনে দিতে পারে।'

অনুষ্ঠান শেষে কনভেনশন রূম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হলওয়েতে তখন বিকেলেব ভিড়। ক্রমেই বাড়ছে। ভক্তরা এসে হাজির হচ্ছে নানা রকম বিচিত্র কস্টিউম পরে।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'দুপুর তো শেষ। লাঞ্চ করব কখন?'

'এখনই করা যেতে পারে। মোটেলের কফি শপটা ওদিকে,' রোজার বলল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

বেশ বড় কফি শপ। দুই তৃতীয়াংশ ভরে আছে। বার্গার আর কোকের অর্ডার দিল কিশোর।

খাওয়া শেষ করে আবার লবিতে ফিরে চলল ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে রোজার জিজ্ঞেস করল, 'এখন কোথায় যেতে চাও?'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'ডিক্সনের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া যেতে পারে। সে এখন সন্দেহভাজনদের তালিকায়। ডিক্সন ঘরে না থাকলে, ঘরে ঢুকে দেখতে পারি চোরাই ফিল্মটা আছে কিনা।'

'বাপরে! না বাবা,' দু'হাত নেড়ে বলল রোজার, 'চুরি করে অন্যের ঘরে ঢোকার মধ্যে আমি নেই। ওসব কাজ করিনি কখনও। তারচেয়ে বরং হ্যারি প্যাটারসনের শো দেখে আসি চলো। এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়।'

'আমার আপত্তি নেই,' জবাব দিল কিশোর।

পার্কিং লটে বেরিয়ে সবুজ তাঁবুটার দিকে এগোল ওরা।

জমিয়ে ফেলেছে প্যাটারসন। নানা রকম স্টান্টবাজির খেলা দেখাচ্ছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো হোভারকারের খেলা। সত্যিই মুগ্ধ করার মত।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল মুসা। খাতির করে ফেলল প্যাটারসনের সঙ্গে। এতটাই খাতির, তাকে হোভারকারে বসতে পর্যন্ত দিল প্যাটারসন। চালাতে দিল।

হাসিতে একগাল দাঁত বের করে ফিরে এল মুসা। জানাল তার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা।

শো শেষ হলো। কমে যেতে লাগল ভিড়। বহুক্ষণ শো করে ক্লান্ত প্যাটারসন ধীরপায়ে ফিরে চলল মোটেলে।

গোয়েন্দারাও আবার মোটেলেই ঢুকবে, তাই ওরাও সেদিকে এগোল।

হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসতে থমকে দাঁড়াল মুসা। ফিরে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে দেখল, খানিক আগে যে হোভারকারটাতে চড়েছিল সে, সেটা স্টার্ট নিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে এমন কাণ্ড করছে, যেন ওটার মগজ আছে। বাতাসে একটা দুলুনি দিয়ে আচমকা ছুটে আসতে শুরু করল।

ইঞ্জিনের শব্দ অনেক পরে প্যাটারসনের কানে গেছে। ঘুরে দাঁড়াল। নিজের

চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।
মুসাও পারছে না। অবাক হয়ে গেছে রোজার আর রবিন। কুঁচকে গেছে কিশোরের ভুরু।
তীব্র গতিতে হোভারকারটা ছুটে যাচ্ছে প্যাটারসনকে লক্ষ্য করে।

সাত

'মিস্টার প্যাটারসন!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'সরুন! সরে যান!'
সরল না প্যাটারসন। বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে হোভারকারটার দিকে। যেন মগজ কাজ করছে না ওর।
আর দেরি করলে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে যাবে। দৌড়ে গিয়ে ডাইভ দিল মুসা। প্যাটারসনকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল হোভারকারটা। ধাক্কা খেল গিয়ে মোটেলের দেয়ালে। সামনের রবারের বাম্পারটা খুলে গিয়ে খসে মাটিতে পড়ল। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে ওটার পর পরই পড়ল গাড়িটা।
উঠে বসল মুসা।
মৃগী রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল প্যাটারসনও। 'কি হয়েছিল?' যেন মনে করতে পারছে না। কিংবা মাটিতে পড়ে মাথায় বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে।
'গেছিলেন আরেকটু হলেই,' কিশোর বলল।
প্যাটারসনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওরা।
মাটিতে পড়ে থাকা হোভারকারটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল প্যাটারসন, 'ওহ্, নো!'
দৌড়ে গেল সে। নিচু হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। গোয়েন্দারা পাশে এসে দাঁড়ালে বিড়বিড় করে বলল, 'নষ্ট হয়নি। কিন্তু চালু হলো কি করে এ ভাবে?'
'সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন,' মুসা বলল। 'চালু হওয়ার সময় আশেপাশে কেউ ছিল না। চালু হয়েই সোজা ছুটে এল আপনার দিকে।'
'রিমোট কন্ট্রোলে চালানো যায় নাকি?' জানতে চাইল কিশোর। 'তাহলে দূর থেকে কেউ চালু করে আপনার দিকে চালিয়ে দিয়েছে।'
'না,' হোভারকারের সামনের দিকের একটা খুপরির ঢাকনা খুলল প্যাটারসন। ভেতরে ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে। সেটা পরীক্ষা করতে করতে বলল সে, 'একমাত্র ভেতরে বসে ভেতর থেকেই চালানো যায়। যন্ত্রপাতির মধ্যে কিছু একটা কারসাজি করে রাখা হয়েছিল হয়তো।'
ভালমত দেখেদেখে বলল আবার, 'কই, অস্বাভাবিক কিছু তো দেখছি না।' ঢাকনাটা লাগিয়ে দিল আবার। 'থাক এখন, পরে আরও খুঁটিয়ে দেখব। এখন

আর পারছি না। ভীষণ কাহিল লাগছে।'

সীটে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে আগের জায়গায় রেখে এল আবার গাড়িটা। গোয়েন্দাদের কাছে ফিরে এসে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, আমাকে বাঁচানোর জন্যে। ক্লান্তিতে আর খিদেয় হাত-পা কাঁপছে আমার। পরে কথা বলব। চলি?'

ঘাড় কাত করল কিশোর। 'মিস্টার প্যাটারসন, মনে হচ্ছে মিস্টার ওরটেগার মত আপনাকেও কেউ খুন করতে চেয়েছিল।'

'কি জানি!' প্রায় টলতে টলতে মোটেলে গিয়ে ঢুকল প্যাটারসন।

প্যাটারসন অদৃশ্য হয়ে যেতেই বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর, 'শুধু চোর নয়, সাংঘাতিক এক খুনীও ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের আশেপাশে। কাল রাতে ওরটেগাকে খুন করতে চাইল, এলিভেটরের দরজা দিয়ে ফেলে তোমাকে খুন করতে চাইল,' রবিনকে বলল সে, 'তারপর এখন প্যাটারসনকে।'

'কিন্তু কাজটা কার?' মুসার প্রশ্ন। 'কাকে সন্দেহ করব আমরা?'

'এমন কেউ, ওরটেগার পুরো দলটার ওপরই যার আক্রোশ আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'ওরটেগাকে মারতে চেয়েছে, তারপর তার স্পেশাল ইফেক্ট ডিরেক্টর প্যাটারসনকে।' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'এরপর কার ওপর হামলা চালাবে? অভিনেতাদের ওপর?'

'রবিনকে মারতে চাইল কেন? সে তো আর ওরটেগার দলের লোক নয়।'

'শুধু রবিনকে না, তোমাকে কিংবা আমাকেও ছাড়বে না সুযোগ পেলে। আমাদের ওপর রাগ, আমরা তদন্ত করছি বলে।'

'আর আমি যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে থাকব,' রোজার বলল, 'আমার ওপরও রাগ থাকবে।'

'তা তো থাকবেই,' কিশোর বলল। 'ইচ্ছে করলে তুমি সরে যেতে পারো আমাদের কাছ থেকে।'

মুখে যতই বলুক, সরার কোন লক্ষণ দেখা গেল না রোজারের মাঝে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'এখন ভেবে দেখা যাক, সন্দেহভাজন ক'জন আছে আমাদের তালিকায়। কার কার মোটিভ আছে?'

'আমার তো এখন সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হচ্ছে আরবার ডিক্সনকে,' রবিন বলল। 'সাইন্স ফিকশন ছবির চোরাই ভিডিওটেপ বিক্রি করে। ওরটেগার ছবিটার বুটলেগ কপি তৈরি করতে পারলে হুড়মুড় করে বিক্রি হবে, কারণ ছবিটা এখনও মুক্তি পায়নি।'

'ফিল্ম চুরির কারণটা নাহয় এ যুক্তি দিয়ে বোঝানো গেল,' কিশোর বলল, 'কিন্তু খুন করতে চাইবে কেন?'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল রবিন।

'হিরাম কারলুর মোটিভ বেশি,' মুসা বলল। 'তার কাহিনী চুরি করে তাকে ঠকিয়েছে বলে ওরটেগার ওপর আক্রোশ রয়েছে তার।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'ওরটেগা তাকে ঠকিয়েছে, কিন্তু প্যাটারসন তো আর কিছু করেনি। তাকে খুন করতে চায় কেন?'

'চায়, তার কারণ প্যাটারসনও একজন পরিচালক,' জবাব দিল রবিন। 'হোক না শুধু স্পেশাল ইফেক্টের। তার অবদানও কম নয়। তাকে বাদ দিয়ে ছবি বানাতে পারবে না ওরটেগা।'

'হুঁম্, তা ঠিক,' মাথা দোলাল কিশোর। 'তারমানে সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে এখনই বাদ দেয়া যাচ্ছে না কারলুকে।'

মোটেলের দরজার দিকে এগোল ওরা। বড় একটা বাক্স হাতে ডিক্সনকে বেরিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল। ভিডিওক্যাসেটের বাক্স, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সে।

'এক্সকিউজ মী, মিস্টার ডিক্সন,' অনুরোধের সুরে বলল সে, 'আপনার সঙ্গে একটা মিনিট কথা বলা যাবে?'

'না,' রুক্ষস্বরে মানা করে দিল ডিক্সন। 'তোমাদের সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।'

'অকারণে আমাদের ওপর রাগ করছেন, মিস্টার ডিক্সন। সত্যি কথাটা শুনলে হয়তো রাগ পড়বে আপনার। আমরা গোয়েন্দা। মিস্টার ওরটেগার চুরি যাওয়া ফিল্মটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

'সে-জন্যেই আমার কাছে গিয়েছিলে, তাই না?' আরও রেগে গেল ডিক্সন। 'চুরি করে আমি ওটার বুটলেগ কপি বানিয়ে বিক্রি করছি কিনা দেখতে গেছ। ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না! ভাগো এখন...তোমাদের সঙ্গে কোন কথা নেই আমার!'

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁটতে লাগল ডিক্সন। একটা ভ্যানের দরজা খুলে বাক্সটা ফেলল ভেতরে। একটিবারের জন্যেও গোয়েন্দাদের দিকে না তাকিয়ে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল পার্কিং লট থেকে।

'ওর ওপর নজর রাখা দরকার আমাদের,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ফিল্মটা ও চুরি করে থাকলে কাছাকাছিই কোথাও রেখেছে।'

'এখনই বাক্সটাতে ভরে নিয়ে যায়নি তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এ ভাবে দিনের আলোয় সরানোর ঝুঁকি নেবে না। পুলিশের চরের চোখ রাখার ভয়ে।'

'তাহলে ওর ঘরে তল্লাশি চালানোর এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ,' মুসা বলল। 'ও নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে বলেও মনে হয় না। ততক্ষণে সহজেই কাজটা সেরে ফেলতে পারব আমরা।'

থাকব না থাকব না করলেও কোনমতেই গোয়েন্দাগিরির কৌতূহল দমন করতে পারল না রোজার। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে সঙ্গেই রইল সে। ডিক্সন কোন্ ঘরটাতে উঠেছে, মোটেলের ডেস্ক ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলে সেটাও জেনে নিল।

ছুরির সাহায্যে তালা খুলে ডিক্সনের ঘরে ঢুকল ওরা। প্রচুর ভিডিওটেপের

ক্যাসেট দেখল ঘরে। ওরটেগার নতুন ছবির বুটলেগ কপি নয় কোনটাই।
সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা।
পাওয়া গেল না ফিল্মটা।
'শজারুর কস্টিউমটা নেই,' মুসা বলল। 'স্পেস সুটটাও নেই। কিংবা সবুজ মেডালিয়ন।'
'হ্যাঁ, এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের,' কিশোর বলল। 'চলো, বেরিয়ে যাই।'

আট

হলওয়েতে দেখা হয়ে গেল মারলা ওয়েইনের সঙ্গে। দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছিল মারলা, ওদের দেখে থেমে গেল। কাছে এগিয়ে এল। উত্তেজিত মনে হচ্ছে। 'খবর শুনেছ?'
'কি খবর?' জানতে চাইল কিশোর।
'হলিউড থেকে এইমাত্র খবর এল,' মারলা বলল, 'ট্র্যাভেল ইনটু দা স্পেস ছবিটার মাস্টার নেগেটিভটাও চুরি হয়ে গেছে।'
পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। রোজারও হতবাক।
'সব আশা যখন ছেড়ে দিয়েছিলাম, ওরটেগা আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে মহা ঝামেলায় ফেলে দেবে ভাবছিলাম, ঠিক তখনই আমাদের অবাক করে দিয়ে মিস্টার ওরটেগা জানালেন, আজ রাতে প্যানেলে যোগ দেবেন তিনি। লেখকদের সম্মেলনে বক্তৃতা দেবেন।' গুঙিয়ে উঠল মারলা, 'কিন্তু আবার ঘটে গেল অঘটন। কুফা লেগেছে এবার আমাদের সম্মেলনে। এ খবর শুনলে কি যে করবেন তিনি খোদাই জানে!'
'ও, তিনি এখনও জানেন না?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।
'না,' নাকের ওপর চশমা ঠেলে দিল মারলা। 'কোন ফোন কলই এখন ধরবেন না, জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের। কাজেই স্টুডিও খবরটা কনভেনশন কমিটিকে জানিয়ে অনুরোধ করেছে তাঁকে জানিয়ে দেয়ার জন্যে। ফোনটা আমিই ধরেছিলাম। এখন তাঁকে জানাতে যাচ্ছি।'
হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। 'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না! তাঁকে আমি এখন জানাব না খবরটা।'
'জানাবেন না মানে?' বুঝতে পারল না কিশোর।
'না, জানাব না,' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মারলার চেহারা। 'খবরটা আগামী কাল পর্যন্ত চেপে রাখব। তাতে ভালয় ভালয় আজকের রাতের অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে যাবে।'
'কিন্তু কাল শুনলে তো আরও বেশি রেগে যাবেন তিনি,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'দ্বিগুণ খেপে যাবেন আপনার ওপর।'

'না, খেপবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মারলা। 'কারণ, ততক্ষণে তোমরা ধরে ফেলবে চোরটাকে।'

অবাক হয়ে মারলার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'বলেন কি? কি করে ধরব?'

'সেটা তোমরা জানো। আমি বলতে চাইছি, কালকের মধ্যে চোরটাকে ধরতে হবে তোমাদের। সকালের মধ্যে যদি পারো, তাহলে আরও ভাল।'

'বড় বেশি নির্ভর করে ফেলছেন। যদি না পারি?'

'পারবে,' হাসিমুখে বলল মারলা। 'তোমাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছি আমি। বহু চোর-ডাকাতকে পাকড়াও করেছ তোমরা, যাদের টিকির নাগালও করতে পারেনি পুলিশ। সুতরাং, কালকের মধ্যে চোরটাকে ধরে ফেলছ তোমরা, ঠিক আছে?'

'দেখি,' আনমনা হয়ে বলল কিশোর, 'আমাদের যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করব।'

রাতে অনুষ্ঠান হলো ঠিকই, কিন্তু অঘটন এড়ানো গেল না। ওরটেগা বক্তৃতা দিতে ওঠার শুরু থেকেই খোঁচা মারা কথা বলতে থাকল কারলু। শেষমেষ এতটাই রেগে গেলেন ওরটেগা, গলা টিপে ধরতে গেলেন কারলুর। বেধে গেল হাতাহাতি। বহু কষ্টে ছোটানো হলো ওদের।

ওরটেগাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়া হলো চেয়ারে।

ফুঁসছেন তিনি, আর নেকড়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন কারলুর দিকে, এই সময় ঘটল দ্বিতীয় অঘটন।

আচমকা বজ্রপাতের শব্দের মত শব্দে ভরে গেল ঘর। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। তার মনে হলো ছাতে লাগানো লাউডস্পীকার থেকে এসেছে শব্দটা। বজ্রপাতের শব্দ মিলাতে না মিলাতেই ভেসে এল ভারী কণ্ঠের ঘোষণা: ওরটেগা, তোমার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করো! শেষ দিন এসে গেছে তোমার!

কড়াৎ করে বাজ পড়ল আবার। ছাতের কাছ থেকে বর্শার মত ছুটে এল একটা তীব্র বিদ্যুতের শিখা।

বিদ্যুতের মতই তীব্র গতিতে ঝাঁপ দিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে মুসা। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল চেয়ার সহ ওরটেগাকে। শিখাটা অল্পের জন্যে ভালমত লাগল না তার শরীরে। শার্টের একটা হাতা ছুঁয়ে চলে গেল কেবল। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল কাপড়ে। ওরটেগার গায়ে লাগলে কি পরিণতি ঘটত, বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।

লাফ দিয়ে উঠে এল কিশোর আর রবিন। থাবা দিয়ে দিয়ে নিভিয়ে ফেলল মুসার শার্টের আগুন। সামান্য ছ্যাঁকা লাগা ছাড়া জখম গুরুতর হলো না মুসার।

হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। ছাতের দিকে তাকিয়ে যন্ত্রটা দেখতে

পেল কিশোর। কালো একটা বাক্স ঝুলে রয়েছে। সরু সরু তার বেরিয়ে চলে গেছে ওটা থেকে, ঢুকেছে গিয়ে ঝাড়বাতির মধ্যে। তারমানে বৈদ্যুতিক সংযোগটা দেয়া হয়েছে ঝাড়বাতির লাইনের সঙ্গেই।

'কি ওটা?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'কোনও ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র,' নিচু স্বরে জবাব দিল কিশোর। প্রায় একই ধরনের আরেকটা যন্ত্র আবিষ্কার করল সে ওরটেগার চেয়ারের তলায়। ততক্ষণে ওরটেগাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে তার বডিগার্ডেরা। লেখকরাও সবাই বেরিয়ে গেছে। ঘরে যারা আছে, তাদের বেশির ভাগই ভক্ত শ্রোতা। তবে তাদের সংখ্যাও কম। দুর্ঘটনার ভয়ে কেউ থাকতে চাইছে না। দরজার কাছে হুড়োহুড়ি করছে সবাই।

'বলতে ইচ্ছে করছে না, তবু...' বলতে বলতে থেমে গেল রবিন।

রবিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে রোজারের চাচা ম্যাক্স অরওয়েলের দিকে তাকাল কিশোর। তিনিও যোগ দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে। বেরোননি এখনও। 'তুমি বলতে চাইছ তাঁর কাজ? কিন্তু ওরটেগাকে খুন করতে চাইবেন কেন তিনি? কিংবা হ্যারি প্যাটারসনকে? তা ছাড়া, ফিল্মটাই বা চুরি করবেন কেন?'

'ভদ্রলোককে শুরু থেকেই রহস্যময় মনে হয়েছে আমার কাছে,' রবিন বলল। 'আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের, তিনি ইলেকট্রনিক্সের জাদুকর। চাকরের কাজ করানোর জন্যে রোবট বানিয়েছেন। এ ধরনের যন্ত্র বানানোর দক্ষতা তাঁর আছে। কিংবা হোভারকারের ইঞ্জিনে টাইমার লাগিয়ে কারসাজি করে রাখার।'

চট করে রোজারের দিকে তাকাল কিশোর। ওরা যে কথা বলছে, শুনতে পাচ্ছে না রোজার। খানিক দূরে মুসার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর লোক চলে এসেছে। আরও দুর্ঘটনার ভয়ে ঘরের সবাইকে বের করে দিতে লাগল ওরা।

দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে কিশোরের কানে কানে বলল রবিন, 'মিস্টার অরওয়েলের ওপর নজর রাখতে হবে।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'কিন্তু নজর রাখার জন্যে মোটেলে রাতে থাকা দরকার। থাকব কোথায়?'

'মারলাকে বললে সে ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।'

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না মারলাকে। জানা গেল, জরুরী মীটিঙে বসেছে সদস্যদের সঙ্গে। এখন কথা বলা সম্ভব না।

তবে সমস্যার সমাধান করে দিল রোজার।

'শোনো,' সে বলল, 'উইকএন্ডের জন্যে মোটেলে একটা রুম বুক করেছি আমি, যাতে কনভেনশনটা ভালমত উপভোগ করতে পারি আমি। মেঝেতে থাকতে রাজি হও যদি, রাত কাটানোর কোন অসুবিধে হবে না। কি, রাজি?'

মেঝেতে থাকতে কষ্ট হবে। কিন্তু জায়গাই পাচ্ছিল না, তবু তো একটা

উপায় হলো। রাজি হয়ে গেল কিশোর।

বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিল তিন গোয়েন্দা, রাতে বাড়ি ফিরছে না।

বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। কস্টিউম শো-তে চলল ওরা। সি সি সি। যেটাকে উপলক্ষ করে মুসার এখানে আসা। এবং জটিল এক রহস্যের ফাঁদে পা দেয়া। আর সেই রহস্যকে উপলক্ষ করে ক্রমাগত জীবন-সংশয় ঘটতে থাকা।

দুই ঘণ্টা পর ফেরার পথে হেসে মুসাকে বলল রবিন, 'তোমার জন্যে দুঃখই হচ্ছে আমার। কস্‌মিক কস্টিউম কনটেস্টে জিততে পারলে না।'

মুখ গোমড়া করে রইল মুসা।

কিশোর বলল, 'জিতেই গেছিল, ওই ফ্লাইং সসারের ক্যাপ্টেন সাজা লোকটার সঙ্গে ধাক্কাটা না লাগলেই হত।'

'দোষটা আমার ছিল না,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'ওই ব্যাটাই জিততে পারবে না বুঝে ফাউল করে দিল। আর বিচারকটাও কানা। সে দেখল না যে দোষটা আমার ছিল না?'

রোজারের ঘরে পৌঁছে দেখা গেল, আগেই সেখানে ঢুকে বসে আছেন আংকেল অরওয়েল। ছোট ডেস্কটাতে বসে মনোযোগ দিয়ে কিছু কাগজপত্র আর বই ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। ছেলেদের ঢোকার শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

তিনি এখানেই ঘুমান, আগেই জানিয়েছে রোজার। হুট করে চলে এসেছেন, রুম বুক করা হয়নি, ঘর না পেয়ে এখন ভাতিজার বিছানার অর্ধেকটা দখল করেছেন।

'এক্সকিউজ মী, প্রফেসর অরওয়েল,' তাঁকে এখানে দেখে খুশিই হলো কিশোর, 'আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'আমি জরুরী কাজ করছি,' অরওয়েল বললেন। 'অন্য কোন সময়...'

'মিনিটখানেকের বেশি লাগবে না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। কনফারেন্স রুমের কালো বাক্সটার কথা বলে জিজ্ঞেস করল, 'ওই বিদ্যুৎ-শিখা কি ভাবে তৈরি করা হলো, আপনি আমাদের বলতে পারবেন?'

আগ্রহ ঝিলিক দিয়ে উঠল প্রফেসর অরওয়েলের চোখে। 'ভেতরে কি কি দিয়েছে দেখিনি, তবে আন্দাজ করতে পারছি।' বিদ্যুতের ওপর রীতিমত একটা লেকচার দিতে শুরু করলেন তিনি।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল কিশোর। প্রফেসরের লেকচার শেষ হলে জিজ্ঞেস করল, 'ওরকম একটা যন্ত্র কি বানাতে পারবেন আপনি?'

'না পারার কিছু নেই,' প্রফেসর বললেন। 'ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রাংশগুলো সবই পাওয়া যাবে। কেন?'

'এমনি। কৌতূহল,' জবাব দিল কিশোর। 'ভাবলাম যে যন্ত্রটা তাঁকে আরেকটু হলেই খুন করে ফেলছিল, সেটা সম্পর্কে জানার আগ্রহ হবে মারলিন ওরটেগার।'

'তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছ নাকি?'

'না, এখনও পাইনি। তবে চেষ্টা করব। আপনি পেয়েছেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'পেয়ে যেতাম, অঘটনগুলো ঘটতে না থাকলে। তবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবেই। সে-সময় অবশ্যই আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হবেন মিস্টার ওরটেগা।'

প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করেই ফেলল কিশোর, 'আসলে কি ব্যাপারে কথা বলতে চান তাঁর সঙ্গে?'

'সেটা বলা যাবে না। ব্যক্তিগত।'

নিজের কাজে মন দিলেন আবার প্রফেসর।

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। নীরবে মাথা ঝাঁকাল একবার। গভীর ভাবনা চলেছে তার মগজে, বুঝতে পারল রবিন আর মুসা। তবে ভাবনাটা কি, সামান্যতমও আঁচ করতে পারল না দু'জনের কেউ।

নয়

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে গুঙিয়ে উঠল রবিন। রোজারের টুইন বেডের পায়ের কাছে চাদর বিছিয়ে শুয়েছিল সে। বিছানা আর দেঁয়ালের মাঝের সামান্য চিলতে জায়গাটুকুতে শুয়েছে কিশোর। খাট আর দরজার মাঝে খালি মেঝেতে মুসা। রোজার ওদেরকে ওপরে থাকতে বলেছিল, কিন্তু আংকেল অরওয়েলের সঙ্গে বিছানা ভাগাভাগি করতে কেউ রাজি হয়নি। চাচার সঙ্গে ভাতিজাকে দিয়ে বরং স্বস্তি পেয়েছে ওরা।

উঠে বসতেই রোজারের সঙ্গে চোখাচোখি হলো রবিনের। 'সাইন্স ফিকশন ফ্যানেরা কনভেনশনে এলে এই কাণ্ডই করে নাকি?'

আস্তে করে উঠে বসল রোজার। হাই তুলতে তুলতে বলল, 'তা ছাড়া আর উপায় কি? একনাগাড়ে বাহাত্তর ঘণ্টা তো আর কেউ না ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। যে হারে ভিড় জমায়, মেঝেতে ছাড়া জায়গা পাবে কোথায়?'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। হাত টানটান করে আড়মোড়া ভাঙতে লাগল।

'তোমার কি খবর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'অর্ধেক রাত ছাতের দিকে তাকিয়ে থেকেছি, বাকি অর্ধেক ঘড়ির দিকে। সকালের অপেক্ষায়।'

তবে মুসা ভালই ঘুমিয়েছে। উঠে বসে হাই তুলতে তুলতে প্রথম কথাটাই বলল, 'নাস্তা খেয়ে নিইগে চলো আগে। দেরি করলে শেষে সব খেয়ে ফতুর করে দিয়ে যাবে কন ভক্তরা।'

ঘরের কোনখানে প্রফেসর অরওয়েলকে দেখা গেল না। বাথরুমের দরজাও খোলা। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'রোজার, তোমার চাচা গেলেন কোথায়?'

'ভোরে উঠেই বেরিয়ে গেছে। কেন, দেখনি?'

'আশ্চর্য! তারমানে সত্যি আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

ঘণ্টাখানেক পর। শাওয়ার আর নাস্তা সেরে রোজার চলে গেল একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তিন গোয়েন্দা চলল চোরের খোঁজে। মারলা বলেছে, সকালের মধ্যে চোরটাকে ধরে দিতে। রাতটা তো কিছুই করতে পারল না, মেঝেতে কাটানোই সার হলো। এখন যদি কিছু করা যায়।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে চোরের খোঁজ?

প্রথমেই হাকস্টার রুমে ঢুকল ওরা। এক জায়গায় খেলনা পিস্তল বিক্রি হতে দেখল, যে ধরনের জিনিসের মধ্যে আসল পিস্তল ভরে গুলি করা হয়েছিল মারলিন ওরটেগাকে। বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলল কিশোর। কি ভাবে খেলনার মধ্যে পিস্তল ভরে দেয়া হয়েছে, কিছুই বলতে পারল না লোকটা।

ঘুরে ঘুরে নানা জায়গায় খোঁজ নিতে নিতে হতাশ হয়ে পড়ল ওরা। নতুন কোন সূত্র কিংবা তথ্য, কিছুই জানতে পারল না।

ছোট একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দরজার ছোট্ট জানালা দিয়ে ভেতরে আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল রবিনের। রহস্যময় মনে হলো তার কাছে। কৌতূহলী হয়ে দরজাটার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল।

অবাক হয়ে গেল। ফিরে এসে ফিসফিস করে জানাল, 'ভেতরে বসে আছেন প্রফেসর ম্যাক্স অরওয়েল। ওরটেগার সঙ্গে।'

'খাইছে! তাই নাকি?' মুসা বলল।

'কথা তাহলে শেষ পর্যন্ত বলেই ছাড়ল ওরটেগার সঙ্গে।' জানালাটার কাছে এসে উঁকি দিল কিশোর।

'দু'জনকে একসঙ্গে থাকতে দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?' মুসার প্রশ্ন। 'প্রফেসর অরওয়েল খুনী হয়ে থাকলে আবার হামলা চালাতে পারেন ওরটেগার ওপর।'

'না, তা পারবেন না,' ভেতরে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর। 'ওরটেগার বডিগার্ডেরা রয়েছে। অন্ধকারে বসে আছে।'

'প্রফেসর অরওয়েল কোনও ধরনের মুভি দেখাচ্ছেন ওরটেগাকে,' রবিন বলল। 'কি ছবি, বুঝতে পারছ?'

'আমি আর তুমি তো এক জায়গায়ই আছি। তোমার চেয়ে ভাল দেখতে পাচ্ছি না,' কিশোর বলল। 'তবে মনে হচ্ছে গতকাল অডিটরিয়ামে যে সব জিনিস দেখিয়েছেন প্রফেসর, সেগুলোই দেখাচ্ছেন। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সাহায্যে তৈরি।'

'হুঁ, এ জন্যেই ওরটেগার পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন প্রফেসর,' মাথা দোলাল রবিন। 'ওরটেগা আসবেন শুনে ম্যাসাচুসেটসে যাওয়া বাদ দিয়ে চলে এসেছেন কনভেনশনে। ছবিগুলো দেখানোর জন্যে। কিন্তু কেন?'

'হয়তো স্পেশাল-ইফেক্টস ডিরেক্টরের কাজটা পাওয়ার জন্যে,' মুসা বলল।

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো কিশোর। 'এটাই একমাত্র কারণ।'

'তাহলে তো আর সন্দেহভাজনের তালিকায় রাখা যাচ্ছে না প্রফেসরকে,'

রবিন বলল। 'যার আন্ডারে চাকরি করার ইচ্ছে, তাকে খুন করতে চাইবেন কেন? তা ছাড়া প্রফেসরকে ঠিক খুনী বলে মনেও হয় না।'

'তবু,' কিশোর বলল, 'নজর রাখতে হবে তাঁর ওপর। বডিগার্ডরা যতক্ষণ আছে, চিন্তা নেই। কিন্তু ছবি দেখানোর ছুতোয় কাছাকাছি গিয়ে খুন করার ফন্দি এঁটে থাকতে পারেন প্রফেসর।'

'এদিকটা অবশ্য ভেবে দেখিনি...' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন। 'দেখো, কে ঢুকছে।'

'কিন্তু অমন চোরা চোরা ভঙ্গি করছে কেন?' ব্যাপারটা মুসাও লক্ষ করল।

এলিভেটর থেকে হলওয়েতে বেরিয়ে এসেছে আরবার ডিক্সন। এদিক ওদিক তাকাল একবার। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে চলল লবি ধরে।

'ভঙ্গিটা কিন্তু সত্যি সন্দেহজনক,' রবিন বলল। 'ওর পিছু নিয়ে গিয়ে দেখে আসি, কি করে। যাব, কিশোর?'

'যাও,' কিশোর বলল। 'আমরা আছি এখানে। প্রফেসর আর ওরটেগার ওপর নজর রাখছি।'

ডিক্সনের পিছু নিয়ে লবি থেকে বেরিয়ে এল রবিন।

বাইরে এসে বাড়িটার পাশ ঘুরে এগিয়ে চলল ডিক্সন। পিছে লেগে থাকল রবিন। চলে এল পার্কিং লটের পেছন দিকে। কালো চামড়ার জ্যাকেট পরা আরেকজন লোককে ডিক্সনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে চট করে একটা গাড়ির পেছনে লুকিয়ে পড়ল রবিন।

মিনিটখানেক কথা বলল দু'জনে। তারপর মোটেলের পেছনের আরেকটা ছোট, জানালাবিহীন ইঁটের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। বাড়ির কাছে গিয়ে দরজা খুলে ওরা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রবিন।

যে দরজাটা দিয়ে লোকগুলো ঢুকেছে, তাতে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা রয়েছে। বাড়িটাকে কোন ধরনের স্টোর রুম বলে মনে হচ্ছে। দরজার পাশে কয়েকটা ঘন ঝোপঝাড় দেখে একটাতে ঢুকে পড়ল রবিন। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে চোখ রাখল দরজার ওপর। লোকগুলো না বেরোনো পর্যন্ত নড়বে না।

আরাম করে বসার পর হঠাৎ করেই টের পেল সে কি পরিমাণ ক্লান্ত হয়ে আছে। রাতে ঘুম হয়নি, সে-কারণেই এমন লাগছে। আপনাআপনি বুজে এল তার চোখ। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল বলতেও পারবে না।

দশ

আচমকা ঝাঁকি দিয়ে তন্দ্রা টুটে গেল তার। দরজার দিকে তাকাল। মাথা সোজা করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল পাল্লা, এখন পুরো লাগানো। তবে কি ঘুমের মধ্যে তাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে ডিক্সনরা?

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পরও যখন বেরোল না ওরা, কিংবা ওদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না, ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নিজেকে গালাগাল করতে করতে উঠে দাঁড়াল রবিন। ঝোপ থেকে বেরিয়ে সাবধানে এগোল দরজাটার দিকে।

কাছে এসে কান পাতল দরজায়। কোন সাড়াশব্দ পেল না। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে আরও খানিকটা ফাঁক করে উঁকি দিল ভেতরে। মালীর ঘর এটা বেলচা, খুন্তি আর বাগান করার অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখে বোঝা গেল। ডিক্সন বা অন্য লোকটার ছায়াও নেই। তারমানে সত্যি সত্যি বেরিয়ে চলে গেছে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে হতাশ ভঙ্গিতে পা টানতে টানতে মোটেলে ফিরে চলল সে।

কিশোর আর মুসা তখনও একই ভাবে ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে। পাশে এসে দাঁড়াল রবিন।

'ডিক্সন আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে,' মুখ কালো করে জানাল রবিন। 'এখানে কি অবস্থা?'

'বললে বিশ্বাস করবে না,' কিশোর বলল। 'তৃতীয়বারের মত ছবিটা ওরটেগাকে দেখাচ্ছেন প্রফেসর। তারমানে জিনিসটা পছন্দ হয়েছে ওরটেগার।'

আচমকা বার কয়েক মিটমিট করে আলো জ্বলে উঠল ঘরের ভেতর।

'শো শেষ,' মুসা বলল। 'উঠে দাঁড়াচ্ছে দু'জনে। চলো, কেটে পড়ি।'

তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে সরে গেল তিন গোয়েন্দা। দরজা থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ওরটেগাকে। সঙ্গে দুই বডিগার্ড। তারপর বেরোলেন প্রফেসর। হাসিমুখে তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন ওরটেগা। তারপর লবি ধরে এগিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রফেসরও চলে গেলেন একই দিকে।

'দারুণ খাতির হয়ে গেছে তো,' মুসা বলল।

'তারমানে প্রফেসরের ব্যাপারে ভুল করেছি আমরা,' রবিন বলল। 'তিনি খুনী নন। ওরটেগার ওপর তাঁর কোন আক্রোশ নেই।'

'তবে কেউ একজন যে ফিল্মটা চুরি করে নিয়ে গেছে এবং খুন করতে

চেয়েছে ওরটেগা আর প্যাটারসনকে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই,' আনমনা ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'প্রফেসর না হলে ডিক্সন কিংবা কারলু। ডিক্সনকে কি করতে দেখলে?'

'মোটেলের পেছনে একটা লোকের সঙ্গে দেখা করল,' লবি ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর আর মুসাকে জানাল রবিন। 'একটা বাড়িতে ঢুকল। তারপর কি করল আর বলতে পারব না।'

'কেন? ওদের বেরোনোর অপেক্ষা করলেই পারতে।'

'করেছিলাম, কিন্তু দেখতে পাইনি। ঝোপের ভেতর বসে আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে! চোখে ঘুম নিয়ে গোয়েন্দাগিরি,' হা-হা করে হেসে উঠল মুসা। 'রাতের ঘুমটা পুষিয়ে নিলে বুঝি?'

'ইচ্ছে করে ঘুমোইনি,' নিজের ওপর খেদটা এখনও যায়নি রবিনের। 'কখন যে চোখ বুজে এল বলতেও পারব না।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'কিছুই তো করতে পারলাম না আমরা। এদিকে সময়ও শেষ হয়ে যাচ্ছে। মারলাকে কি জবাব দেব?'

তার কথা শেষ হতে না হতেই দেখা হয়ে গেল মারলার সঙ্গে। লবিতে এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের দেখেই ঘুরে দাঁড়াল।

'তারপর, কি খবর?' অস্থির ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল মারলা। 'আর তো না জানিয়ে পারব না ওরটেগাকে। যতই দেরি করব, রাগ বেড়ে যাবে তাঁর।'

'অস্থির হবেন না,' কিশোর বলল। 'অনেকটাই এগিয়েছি আমরা। সূত্র বোধহয় পেয়েও গেছি। দেখি, কি করা যায়।'

'প্লীজ,' এক হাত দিয়ে অন্য হাতের কব্জি মোচড়াল মারলা, 'তাড়াতাড়ি করো। যে করেই হোক, চোরটাকে খুঁজে বের করো। নইলে মান-ইজ্জত এবার সব যাবে আমার। জেলও খাটতে হতে পারে। ওরটেগা যা বদমেজাজী, কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে।'

'অত চিন্তা করবেন না। যাচ্ছি আমরা।'

মারলা এলিভেটরে ঢুকে গেলে দুই সহকারীর দিকে ঘুরল কিশোর। রবিনকে বলল, 'চলো তো, ঘরটা দেখে আসি। যেটাতে ডিক্সনকে ঢুকতে দেখেছ। কোন সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

লবির জানালা দিয়ে পার্কিং লটে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'খাইছে!'

কি দেখে এমন চমকে গেল সে, দেখার জন্যে চোখ ফেরাল কিশোর আর পার্কিং লটে কয়েকজন তরুণের সঙ্গে দেখা গেল ডিক্সনকে। সবার পরনেই চামড়ার জ্যাকেট। তাদের একজনের জ্যাকেটের রঙ কালো। ভারী একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বহন করছে দু'জন লোক।

'লোকগুলো কে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'কালো জ্যাকেটওয়ালা লোকটাকেই ডিক্সনের সঙ্গে দেখেছিলাম,' রবিন

বলল। 'বুটলেগ ভিডিওটেপের ডিলার হলেও অবাক হব না।'

'কিন্তু আমার কাছে তো লাগছে মোটরসাইকেল গ্যাঙের মত,' মুসা বলল।

ডিক্সন আর তার সঙ্গীরা হেঁটে চলে গেল পার্কিং লটের উল্টো দিকে। বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'পিছু নেব নাকি?'

'তা আর বলতে। চলো চলো।'

মোটেল থেকে বেরিয়ে বনের দিকে ছুটল তিন গোয়েন্দা, যেদিকে ঢুকতে দেখা গেছে ডিক্সন আর তার দলবলকে। বনের ওখানটায় এসে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া সরু একটা পায়েচলা পথ দেখতে পেল।

সেটা ধরে বনে ঢুকে পড়ল ওরা। পড়ে থাকা শুকনো পাতা এড়িয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে চলল রাস্তা ধরে।

বনের মধ্যে এক টুকরো খোলা জায়গায় জড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দলটাকে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে রাখা হয়েছে। ঝুঁকে সেটা থেকে যে জিনিসটা বের করল ডিক্সন, দূর থেকে ভিডিওটেপের মত মনে হলো কিশোরের কাছে। উল্টেপাল্টে দেখে আবার বাক্সে ফেলে দিল ডিক্সন। পকেট থেকে টাকা বের করে দিল সামনে দাঁড়ানো একজনের হাতে।

'কি করছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর। 'ভিডিওটেপ কিনছে হয়তো। তবে যা-ই করছে, বৈধ কাজ করছে না।'

পেছনে পাতার মচমচ শোনা গেল। ঝট করে ঘুরে তাকাল কিশোর। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। দু'জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। চামড়ার জ্যাকেট পরা। দু'জনের হাতেই পিস্তল।

'এখানে কি করছ, তাড়াতাড়ি বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প তৈরি করে ফেলো, খোকারা,' বলল দু'জনের একজন। লম্বা এলোমেলো কালো চুল তার। কয়েক দিনের শেভ না করা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 'বিশ্বাস করাতে না পারলে মনে রেখো আজই তোমাদের জীবনের শেষ দিন।'

এগারো

ডিক্সনের কাছে ধরে নিয়ে আসা হলো ওদের।

দেখেই চোখ কপালে তুলল ডিক্সন, 'তোমরা?'

'চেনো নাকি?' জিজ্ঞেস করল দাড়িওলা।

মাথা ঝাঁকাল ডিক্সন, 'চিনি। পুরো উইকএন্ড ধরেই কনভেনশনে ঘুরে

বেড়াচ্ছে একটা রহস্যের কিনারা করার জন্যে। ওরা ভাবছে, ওই বেআইনী কাজটার সঙ্গে আমিও জড়িত।'

খিকখিক করে হেসে উঠল কালো জ্যাকেট পরা লোকটা, 'বেআইনী কাজে জড়িত কি নও তুমি, ডিকি-বয়?'

'থামো!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল ডিক্সন। 'আমরা যা করছি, তার সঙ্গে ওদের কেসটার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তা তো বুঝলাম,' বলল দাড়িওলা। 'ওদের এখন কি করব?'

'ছেড়ে দাও।'

'বলো কি! মাথা খারাপ নাকি তোমার? ছেড়ে দেব!'

'হ্যাঁ, ছেড়ে দাও। ওরা আমাদের পেছনে লাগেনি। লেগেছে একটা চোরের পেছনে। মারলিন ওরটেগার ফিল্মটা চুরি হয়ে গেছে, সেই চোরটাকে খুঁজছে ওরা। অকারণে আটকে রেখে ঝামেলা বাড়ানোর কোন দরকার আছে?'

'বেশ, তুমি যখন বলছ...' পিস্তল নামাল দাড়িওলা।

ডিক্সনের দিকে তাকাল কিশোর। 'একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন, মিস্টার ডিক্সন? আপনারা কি করছেন এখানে?'

'খবরদার!' লাফ দিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল দাড়িওলার পিস্তল ধরা হাতটা। 'নাক গলানোর চেষ্টা করবে না!'

হাত তুলে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করল ডিক্সন। 'সত্যি কথাটা ওদের জানানো দরকার। নইলে ঝামেলা বাধাবে।' কিশোরের দিকে ফিরল সে। 'আমি ব্ল্যাঙ্ক ভিডিওটেপ কিনছি। আমি এগুলোতে মুভি প্রিন্ট করি যা এখনও বাইরের দোকানগুলোতে যায়নি।'

'বুটলেগ টেপ?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল ডিক্সন। 'পুরোপুরি বৈধ জিনিস। স্বল্প ব্যয়ে বানানো ছবি নির্মাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার, যারা তাদের জিনিস ভিডিওতে সরবরাহ করতে চায়। বিক্রি হওয়া প্রতিটি কপির ওপর রয়্যালিটি দিই আমি তাদের। এর মধ্যে বহু ছবি আছে যেগুলো কোনদিনই সিনেমা হলের মুখ দেখে না। ভিডিওতে যা আয় হয়, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এ সব নির্মাতারা।'

'বুঝলাম, বৈধ কাজ করেন,' অবিশ্বাসীর সুরে বলল মুসা, 'তাহলে বনের মধ্যে চুরি করে ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেট কিনতে এসেছেন কেন?'

'কারণ আমিও স্বল্প আয়ের মানুষ,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল ডিক্সন। 'বাইরের দোকান থেকে ক্যাসেট কিনতে গেলে লাভ তো দূরের কথা, গচ্চা দিয়ে মরব। তাই এই ভদ্রলোকদের ওপর নির্ভর করতে হয়,' লোকগুলোকে দেখাল সে। 'এরা যা জোগাড় করে দেয়, সেটাই কিনে নিই আমি, কম দামে।'

'তারমানে চুরি করে আনে। নইলে কমে দেয় কি করে?'

'খবরদার, বেশি কথা বলবে না!' ধমকে উঠল দাড়িওলা।

'তুমি চুপ করো, ড্যারবি,' বিরক্ত হয়ে বলল ডিক্সন। 'যা বলার আমিই তো বলছি।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চুরি করে আনে না কি ভাবে আনে, সেটা ওদের ব্যাপার। আমার দেখতে যাওয়ার দরকার নেই।'

'মোটেলের পেছনের মালীর ঘরটায় কি করছিলেন?' জানতে চাইল রবিন, 'একটু আগে?'

'অ, তারমানে আমার ওপর গুপ্তচরগিরি করছিলে,' ডিক্সন বলল। 'আর আমি ভাবলাম, জায়গা না পেয়ে ঝোপের ছায়ায় বসেই ঘুমিয়ে নিচ্ছ বুঝি,' হেসে ফেলল সে। 'রাতে ঘুমাওনি বুঝি?'

গাল লাল হয়ে গেল রবিনের। নীরবে মাথা নাড়ল।

'যাকগে, তোমার প্রশ্নের জবাব হলো—ওই ঘরে বসে ক্যাসেটগুলোর দাম নিয়ে দরাদরি করছিলাম আমরা। এখন নিশ্চয় সন্দেহটা গেছে আমার ওপর থেকে?'

'ফিল্মটা কে চুরি করেছে, কোন ধারণা আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

শ্রাগ করল ডিক্সন। 'না। তবে বুটলেগ হয়নি এখনও, এটা বলতে পারি। তাহলে খবরটা আমার কানে আসতই।'

'কানে এলে কি জানাবেন আমাদের?' অনুরোধ করল কিশোর।

'জানাব,' ডিক্সন বলল। 'তোমাদের প্রশ্নের জবাব তো পেলে। দয়া করে যাও এখন। এদের সঙ্গে ব্যবসাটা এখনও শেষ হয়নি আমার।'

ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা।

বন থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটের ওপর দিয়ে মোটেলের দিকে এগোল।

'ডিক্সনের কথা বিশ্বাস করেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'করেছি,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল কিশোর। 'ব্যবসার খাতিরে কিছুটা এদিক ওদিক করে বটে সে, কিন্তু ওরটেগার ফিল্ম চুরিতে জড়িত নয়, এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। টেবিলের নিচ থেকে যেটা বের করে দিয়েছিল, সেটা এই স্বল্প ব্যয়ের ছবি। পর্নো বা নোংরা ছবিও হতে পারে ওগুলো। সে যা-ই হোক, ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই আমাদের।'

'তাহলে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়ল আরেকজন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

মোটেলে ফিরে লবিতে দেখা হয়ে গেল রোজারের সঙ্গে। এলিভেটর থেকে বেরিয়েছে।

'অ্যাই যে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কি খবর তোমাদের? কেসের কোন উন্নতি হলো?'

সংক্ষেপে সব জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'আমি এখন ভাবছি, যে কোন ভাবেই হোক, ওরটেগার সঙ্গে কথা বলা দরকার। নইলে আসল সূত্র পাব না। কোথায় আছেন তিনি এখন, বলতে পারবে?'

'একটু আগে দেখে এলাম কফি শপে বসে আছেন,' রোজার বলল। 'তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো পেয়ে যাবে এখনও।'

চলে গেল রোজার। আরেকটা অনুষ্ঠানে যাবে।

দেরি করল না কিশোর। দুই সহকারীকে নিয়ে এসে ঢুকল কফি শপে। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। রেস্টুরেন্টটা প্রায় ভর্তি। জানালার কাছে একটা বড় টেবিলে বসে আছেন ওরটেগা। দুই বডিগার্ডও রয়েছে সঙ্গে।

টেবিলের দিকে এগোল কিশোর। পেছনে গায়ে গায়ে লেগে থেকে এগোল মুসা, আর রবিন।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল একজন বডিগার্ড। এগোতে বাধা দিল।

'মিস্টার ওরটেগার সঙ্গে জরুরী কথা আছে,' কিশোর বলল।

'অনেকেরই থাকে,' নীরস স্বরে জবাব দিল গার্ড। 'কিন্তু তিনি এখন কথা বলতে পারবেন না। বিদেয় হও।'

দমল না কিশোর। 'কথাটা তাঁর চোরাই ফিল্মের ব্যাপারে। আমরা গোয়েন্দা। ফিল্মটা খুঁজে বের করে দিতে আমাদের নিয়োগ করেছেন মারলা ওয়েইন।'

'পুলিশের সঙ্গে যা বলার বলে ফেলেছেন তিনি,' রূঢ় স্বরে জবাব দিল গার্ড। 'তোমাদের মত কয়েকটা পুঁচকে ছোঁড়ার সঙ্গে কথা বলার কোন ইচ্ছে তাঁর হবে না। কাজেই, বিদেয় হও।'

জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর। কিন্তু ওরটেগাকে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করতে দেখে থেমে গেল। হঠাৎ গুঙিয়ে উঠে দুই হাতে গলা চেপে ধরলেন তিনি। বসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারলেন না। টলে পড়ে গেলেন সামনের দিকে। কপালটা পড়ল সালাদের প্লেটের মধ্যে।

'কি হলো?' চিৎকার করে উঠল রবিন।

বিদ্যুৎ খেলে গেল পাশে বসা গার্ডের শরীরে। ওরটেগার মাথাটা উঁচু করে ধরল সে। নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে ঝুলে রয়েছে মাথাটা।

'মরে গেলেন নাকি!' চিৎকার করে উঠল সে।

বারো

'মারা গেছে!' দ্রুত এগিয়ে গেল মুসা।

ঘরের একধার থেকে চিৎকার শোনা গেল এ সময়, 'আমি ডাক্তার!' ঢোলা জগিং সুট পরা এক ভদ্রলোক ছুটে এলেন পরিচালকের টেবিলের সামনে। হাত তুলে নাড়ি দেখলেন।

'না, বেঁচেই আছেন,' জানালেন তিনি। 'তবে নাড়ি খুব দুর্বল। অ্যামবুলেন্স দরকার। জলদি!'

ওরটেগার খাবারের প্লেটটা তুলে নিলেন ডাক্তার। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলেন।

'গন্ধে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না,' বললেন তিনি। 'তবে বিষ মেশানো

থাকতে পারে। সাবধান, কেউ আর কিছু খাবেন না এখানে, খাবার পরীক্ষা না করা পর্যন্ত।'

চামচের ঠুং-ঠাং শব্দ শুরু হলো। সবাই হাতের চামচ ফেলে দিচ্ছে প্লেট কিংবা টেবিলের ওপর।

'খাইছে!' বলে উঠল আতঙ্কিত মুসা। 'মহামারী না লেগে যায়!'

'ভয়ানক ব্যাপার,' রোজার বলল। 'সাংঘাতিক বদনাম হয়ে যাবে এরপর থেকে রকি বীচ কনের। কেউ আর আসতে চাইবে না।'

'কন নয়, ওরটেগার পেছনে লেগেছে কেউ,' কিশোর বলল। 'এবং অবশেষে সফল হতে চলেছে সে, সময়মত যদি অ্যাম্বুলেন্স এসে না পৌঁছায়।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইমার্জেন্সী ক্রুরা পৌঁছে গেল। প্যারামেডিকরা ঘিরে দাঁড়াল ওরটেগাকে। একজন একটা ইনজেকশন দিল। তারপর স্ট্রেচারে তোলা হলো তাঁকে। বয়ে নিয়ে গেল ক্যাফেটেরিয়ার বাইরে। পলকের জন্যে মুখটা দেখতে পেল কিশোর। মোমের মত সাদা হয়ে গেছে।

'অতি জঘন্য একটা উইকএন্ড,' তিক্তকণ্ঠে মন্তব্য করল রবিন।

'এবং যেটার জন্যে জঘন্য, সেই কেসটার কিনারা করতে পারিনি আমরা এখনও,' কিশোর বলল। খানিক দূরে আরেকটা টেবিলে হ্যারি প্যাটারসনকে বসে থাকতে দেখল। কাঁটা চামচ উঁচু করে ধরে আতঙ্কিত চোখে নিজের সালাদের প্লেটটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে সে।

দ্রুতপায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'এক্সকিউজ মী, মিস্টার প্যাটারসন। মিস্টার ওরটেগার যা ঘটে গেল, তার জন্যে সত্যি আমরা দুঃখিত।'

'হুম্!' চোখ তুলে তাকাল প্যাটারসন। কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি। প্রথমে চিনতে পারল বলে মনে হলো না। তারপর বলল, 'ও, তোমরা। তোমরা তিনজনেই না চুরির তদন্ত করছ? তোমরা তো হয়েছ দুঃখিত, আর আমার উঠে গেছে কাঁপুনি। আমারটাতেও বিষ মেশানো নেই তো?'

'মনে হয় না, তাহলে এতক্ষণ বসে থাকতে পারতেন না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে আপনিও সাবধান, মিস্টার প্যাটারসন। আপনার ওপরও হামলা হয়েছিল, মনে নেই? হোভারকারের ইঞ্জিন...'

'মনে আছে,' আবার প্লেটের দিকে তাকাল প্যাটারসন। ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল প্লেটটা। ঠং করে চামচটা রেখে দিল প্লেটে। 'নাহ্, আর খাব না। কি দিয়ে রেখেছে কে জানে!'

'না খাওয়াই ভাল এখানে,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'যে ক'দিন থাকবেন, টিনের খাবার খান।'

'হ্যাঁ, তা-ই করব,' শুকনো স্বরে বলল প্যাটারসন। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোঁটলা-পোটলি গুছিয়ে কেটে পড়ব এখান থেকে, হলিউডে চলে যাব। এখানে থাকাটা আর নিরাপদ না। যাই, তাঁবুতে গিয়ে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে ফেলি...'

আচমকা উঠে দাঁড়াল প্যাটারসন। রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

টেবিলে রাখা কালো একটা জিনিসের দিকে চোখ পড়ল রবিনের। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। 'প্যাটারসন নিশ্চয় ভুলে গেছে।'

তাকে ডাকার জন্যে ঘুরল সে। কিন্তু বেরিয়ে গেছে প্যাটারসন।

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র,' হাতে নিয়ে দেখতে লাগল রবিন। 'আমাদের ভিসিআরটার রিমোটের মত।'

'দেখি তো,' হাত বাড়াল কিশোর।

কালো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি খোলসটা। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া দুই ইঞ্চি। অনেকগুলো বোতাম। একের পর এক দ্রুত বোতামগুলো টিপতে লাগল কিশোর।

'খবরদার,' রসিকতা করল মুসা, 'কোথাও গুপ্ত বোমা রাখা আছে হয়তো, ফাটিয়ে দিয়ো না আবার।'

'চলো, এটা যার জিনিস তাকে দিয়ে আসি,' কিশোরের কাছ থেকে যন্ত্রটা নিতে নিতে বলল রবিন।

কিশোর বলল, 'চলো। কিন্তু আমাদের কেসটার কি হবে? সন্দেহভাজনদের তালিকায় আর যারা আছে তাদের ব্যাপারে শিওর হওয়া দরকার। চলো, কারলু আর আরডেনের সঙ্গে কথা বলব।'

'চলো।'

কফি শপের বাইরে এসে কয়েকজন লোককে গম্ভীর হয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখল ওরা।

'ওরটেগার খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে গেছে,' রবিন বলল। 'কনভেনশনের বারোটা বাজল এবার।'

হলওয়েতে ঢুকতেই উচ্ছ্বসিত হাসি কানে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখল ওরা, চওড়া হাসি মুখে নিয়ে একে অন্যের পিঠ চাপড়ে আনন্দ করছে দু'জন লোক।

'কাণ্ড দেখেছ?' অবাক হয়ে বলল কিশোর। 'এত আনন্দ কিসের কারলু আর আরডেনের?'

এগিয়ে গেল গোয়েন্দারা।

ওদের দেখে কারলু বলল, 'হাল্লো, কেমন আছ তোমরা? খবর শুনেছ?'

'মিস্টার ওরটেগার কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' কারলুর হয়ে মাথা ঝাঁকাল আরডেন।

'আপনারা হাসছেন?' না বলে পারল না মুসা। 'একজন লোককে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে, আর আপনারা হাসছেন?'

'অনেক দিন ধরে যেটা ঘটার কথা ছিল, তা-ই তো ঘটেছে ওরটেগার, এতে অবাক হওয়ার কি আছে?' জবাব দিল কারলু। 'ওর মত একটা ঠগবাজের উচিত শাস্তি হয়েছে। দশ বছর ধরে আমার প্রাপ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করছে

শয়তানটা। ওর জন্যে সহানুভূতি দেখাব নাকি?'

তবে মুসার কথার পর হাসি মুছে গেল আরডেনের। বলল, 'ছেলেটা ঠিকই বলেছে, উইলি। ওরটেগা যত খারাপই হোক, এখন সে মৃত্যুশয্যায়। এ ভাবে বিষ দিয়ে মারাটা সত্যি দুঃখজনক।'

'মিস্টার কারলু নিশ্চয় একমত হবেন না আপনার সঙ্গে,' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। 'কি বলেন, মিস্টার কারলু?'

ধীরে ধীরে হাসি উধাও হয়ে গেল কারলুর মুখ থেকে। 'তোমরা এখনও ভাবছ ওরটেগাকে আমি খুন করতে চাইছি? সত্যি বলছি, ওর ক্ষতি দেখে আমি আনন্দিত হলেও খুন করার মত জঘন্য অপরাধ করতে যাব না। যতই আমাকে ঠকাক না কেন সে। আমার স্বভাব ওটা নয়।'

'আপনার স্বভাবটা তাহলে কি, মিস্টার কারলু?' ফোড়ন কাটল মুসা, 'ফিল্ম চুরি করা?'

রাগত দৃষ্টিতে আরডেনের দিকে তাকাল কারলু। 'যত নষ্টের মূল তুমি। ওরটেগার সঙ্গে কি নিয়ে আমার শত্রুতা, এ কথাটা কি দরকার ছিল ওদের বলার? আসল চোরটাকে না ধরা পর্যন্ত এখন আমার ওপর থেকে সন্দেহ যাবে না ওদের।'

'মিস্টার ওরটেগা বিষ খাওয়ার সময় আপনি কি করছিলেন, মিস্টার কারলু, জানতে পারি কি?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'কোন অ্যালিবাই আছে আপনার?'

'আছে,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কারলু, 'শক্ত অ্যালিবাই আছে। গত দু'ঘণ্টা ধরে কনফারেন্স রুমে ছিলাম আমি, অসংখ্য শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিয়েছি। তাদের সংখ্যা একশো জনের কম হবে না। বক্তৃতা দিয়ে সবে বেরোলাম।'

'এরচেয়ে ভাল অ্যালিবাই আর হতে পারে না,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল আরডেন। 'কি বলো? নিশ্চয় এখন আমার অ্যালিবাইও চাইবে। আমাকে যে সন্দেহ করো তোমরা, সেটাও জানি। আমার অ্যালিবাই হলো, সারাক্ষণ আমিও ছিলাম হিরামের সঙ্গে। মঞ্চে, তার পাশে। কাজেই আমিও যে বিষ মেশাইনি ওরটেগার খাবারে, সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

সামান্য মাথা নুইয়ে রসিকতার ভঙ্গিতে তিন গোয়েন্দাকে বাউ করল আরডেন। তারপর কারলুর সঙ্গে চলে গেল।

'ভাল একখান বাঁশ দিয়ে গেল আমাদের,' মুখ কালো করে কিশোর বলল।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'কিন্তু কারলু যদি না করে থাকে, তাহলে কে করল কাজটা?'

'ডিক্সনকে পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত করা যাচ্ছে না,' মুসা বলল। 'কারণ বেআইনী একটা কাজ করতে ওকে নিজের চোখে দেখে এলাম। প্রফেসর অরওয়েলকেও নির্দোষ ভাবা যাচ্ছে না।'

'তা যাচ্ছে না,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কিন্তু একটা ব্যাপার শুরু থেকেই খচ্

খচ্ করছে আমার মনে। অত সহজে যাদের ওপর সন্দেহ হয়, তাদের সন্দেহ করতে ইচ্ছে করেনি আমার। মনটাকে অন্য কোনদিকে সরানো দরকার। তাতে জটমুক্ত হবে। নতুন করে ভাবতে পারব।'

'প্রোগ্রামে দেখলাম, একটা ঘরে ছবি দেখানো হবে,' রবিন বলল। 'ভাল পুরানো ছবি। আমার মনে হয়, আধঘণ্টা ওখানে গিয়ে বসে থাকলে, মাথাটা পরিষ্কার হবে আমাদের। তখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা যাবে।'

'ঠিক বলেছ,' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আসলেই অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করা দরকার।'

দেয়ালে টানানো একটা পোস্টারের দিকে আঙুল তুলল মুসা। 'ওই যে, ওই ছবিটা দেখানো হবে।'

যে ঘরে ছবি দেখানো হবে তার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজাতেও একই পোস্টার টানানো হয়েছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে।

ছবি শুরু হয়ে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার লাগল প্রথমে। ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এলে সীট নজরে পড়ল। তিনজনে গিয়ে তিনটা চেয়ারে বসে পড়ল।

অতি সাধারণ ছবি। আধুনিক ছবির তুলনায় স্পেশাল-ইফেক্টের দৃশ্যগুলো বড়ই হাস্যকর। তবে গল্প আছে ছবিটার। গরিলাদের মাঝে টারজানের মত জঙ্গলে বড় হওয়া একটা ছেলের লড়াই বেধেছে মঙ্গল থেকে আসা বামন মানুষদের সঙ্গে। উত্তেজনা তো আছেই, হাসির খোরাকও আছে প্রচুর।

'আমার কিন্তু দারুণ লাগছে,' মিনিট পনেরো দেখার পর মুসা বলল।

'ছবি দেখার জন্যে ঢুকিনি আমরা,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'মাথাটা পরিষ্কার করতে এসেছি। আশা করি সেটা হয়েছে। এবার কেসের কিনারা করতে বেরোনো যায়।'

'চলো,' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

পর্দায় তখন একজন জংলী লোক বর্শা তুলেছে মঙ্গলগ্রহবাসীদের সই করে ছোঁড়ার জন্যে। হাতটা বাঁকা করে নিয়ে গিয়ে সামনে ছুঁড়ে দিল বর্শাটা।

ঠিক ওই মুহূর্তে কাপড় ছেঁড়ার শব্দ হলো পর্দায়। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। অস্পষ্ট ভাবে দেখল, একটা আসল বর্শা যেন পর্দা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে সোজা ছুটে আসতে শুরু করল তার দিকে।

তেরো

সময়মত লাফ দিয়ে সরে গেল কিশোর। ঘ্যাঁচ করে এসে চেয়ারে বিঁধল বর্শাটা, মুহূর্ত আগে যেটাতে বসে ছিল সে।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন।

মুসা বলল, 'যা দেখছি সত্যি দেখছি?'

'হ্যাঁ,' শুকনো স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'একটা বর্শা। সিনেমার জঙ্গল থেকে সোজা উড়ে এসেছে আমাকে লক্ষ্য করে।'

'অ্যাই সরো, সরো!' চিৎকার করে উঠল কিশোরের পেছনে বসা একটা ছেলে। 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'কি করে দেখবে?' জবাব দিল অন্য আরেকটা কণ্ঠ। 'পর্দা দেখছ না ছেঁড়া?'

এক সেকেন্ড পরই আলো জ্বলে উঠল ঘরের। অপারেটর–হালকা পাতলা একজন মানুষ, বন্ধ করে দিল প্রোজেক্টর। পর্দা থেকে মুছে গেল ছবি।

'এটা কি! চিৎকার করে উঠল পেছনের সারির আরেকটা ছেলে। কিশোরের চেয়ারে গেঁথে থাকা বর্শাটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'এ তো একেবারে থ্রী-ডি মুভি!'

'মুভির চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক,' রবিন বলল।

'এ রকম একটা ভয়ানক পাগলামি কে করল?' চেয়ারে গাঁথা বর্শাটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

পর্দা-ছেঁড়া ছিদ্রটার দিকে তাকাল রবিন। 'পেছনে কেউ নিশ্চয় আছে!' বলে সেদিকে দৌড় দিল সে।

পর্দার কাছে এসে পেছনে উঁকি দিল। কাউকে দেখতে পেল না।

'এতক্ষণ কি আর তোমার জন্যে বসে আছে নাকি,' কিশোর বলল। প্রোজেকশনিস্টের দিকে তাকাল সে। 'বর্শাটা ছোঁড়ার পর কাউকে পালাতে দেখেছেন এখান থেকে?'

'দেখেছি,' প্রোজেকশনিস্ট জবাব দিল। 'একটা লোক দৌড়ে চলে গেল দরজার দিকে।'

'দেখতে কেমন ছিল?'

'তা তো দেখিনি। আলো জ্বলেনি তখনও। একটা ছায়ামূর্তির মত ছুটে চলে গেল।'

'এসো,' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল। 'দৌড়ে গেলে হয়তো ধরা যাবে এখনও।'

ছুটে হলওয়েতে বেরিয়ে এল ওরা। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। আবার ফিরে এল ঘরের দরজার কাছে। পেছনে তাকাতে চোখে পড়ল একটা ডিসপ্লে বক্স। তাতে ছুরি-তরোয়াল-বর্শা সহ বেশ কিছু অস্ত্র সাজানো রয়েছে ডিসপ্লেতে।

'বর্শাটা কোত্থেকে এল সেটা তো বোঝা গেছে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু লোকটা কে?'

'প্রফেসর অরওয়েল,' জবাব দিল রবিন।

'ইলেকট্রনিক্সের জাদুকর তিনি, সন্দেহ নেই। কাল রাতে যে যন্ত্রটা দিয়ে বজ্রপাত ঘটানো হয়েছে, সেটা বানাতে পারবেন। কিন্তু রেস্টুরেন্টে বিষ দেয়ার ব্যাপারটা? ওটা তো কোন ইলেকট্রনিক কারসাজি নয়। তাকে আমরা দেখিওনি

ওখানে।'

'উহ্, মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার!' মুসা বলল। 'সবাইকেই সন্দেহ হচ্ছে। আবার এর বিপক্ষেও যুক্তি দেয়া যাচ্ছে। কাকে ধরব তাহলে?'

'বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল।

প্যান্টের পকেটে দুই হাত রেখে দাঁড়াতে গিয়ে রিমোটের ` ত যন্ত্রটা হাতে ঠেকল রবিনের। বলল, 'এহ্হে, প্যাটারসনের জিনিসটা দেয়া হ.লা না এখনও। বলল, হলিউড চলে যাবে। চলো, গিয়ে দিয়ে আসি।'

'চলো,' কিশোর বলল।

প্যাটারসন বলেছে, জিনিসপত্র গোছানোর জন্যে তাঁবুতে যাবে। সুতরাং সেদিকেই রওনা হলো ওরা।

মোটেল থেকে বেরিয়ে এল পার্কিং লটে। সবুজ তাঁবুটা জায়গামতই আছে। কিন্তু কানাগুলো সব নামানো। ভেতরেও কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। টোকা দেয়ার জায়গা নেই। তাই নাম ধরে ডাক দিল, 'মিস্টার প্যাটারসন? ভেতরে আছেন? আপনার একটা জিনিস ফেলে এসেছিলেন রেস্টুরেন্টে, সেটা দিতে এসেছি।'

জবাব এল না।

আবার ডাকল তাকে রবিন।

কিন্তু কেউ বেরোল না দরজায়।

'নেই নাকি?' কি যেন ভাবছে কিশোর। 'চলো, ঢুকে পড়া যাক।'

'না বলে অন্যের তাঁবুতে ঢুকব?'

রবিনের কথার জবাব দিল না কিশোর। ক্যানভাসের দরজাটা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। আগের দিন শো দেখানোর সময় যে ভাবে সাজানো হয়েছিল, তেমনি ভাবে সাজানো রয়েছে সব কিছু। তারমানে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোনোর পর এখনও এখানে ঢোকেনি প্যাটারসন। ওদের কাছ থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে বসে রয়েছে হোভারকার দুটো।

'আসেনি মনে হচ্ছে,' মুসা বলল।

'বসে থাকি,' কিশোর বলল। 'অনেকক্ষণ তো হলো। চলে আসবে যে কোন সময়।'

ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। পেছনে ঢুকল তার দুই সহকারী।

তাঁবুর মাঝখানে কালো রঙের একটা ট্রাংক দেখা গেল। মুসা বলল, 'এটা এল কোত্থেকে? কাল তো এখানে ছিল না।'

'ভেতরে নিশ্চয় সিনেমা বানানোর জিনিসপত্র আছে,' রবিন বলল।

'দেখি তো কি আছে,' কৌতূহল দমাতে পারল না কিশোর। ট্রাংকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হুড়কো খুলল। তারপর ডালা।

ধড়াস করে এক লাফ মারল বুকের মধ্যে। ভেতরের কস্টিউমগুলো অতি পরিচিত। মহাকাশচারীর স্পেস সুট, শজারুর মত প্রাণীর কস্টিউম। ওগুলোর ওপরে রাখা একটা সবুজ মেডালিয়ন, চাঁদ-তারা খচিত।

'অবিশ্বাস্য!' ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'এ সব জিনিস এখানে যে রেখে গেছে সে-ই খুন করার চেষ্টা করেছে ওরটেগাকে।'

'সেই লোকটা কে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আর লোকটা প্যাটারসনকে ফাঁসানোর জন্যে তার তাঁবুতে এনে রেখে যায়নি তো?' বলল মুসা।

'প্যাটারসনের সঙ্গে কথা বলা দরকার,' কিশোর বলল। 'নইলে পরিষ্কার হবে না সব কিছু।' কি যেন ভাবল সে। 'রবিন, প্যাটারসনের সেই যন্ত্রটা বের করো তো দেখি, রেস্টুরেন্টে যেটা ফেলে এসেছিল।'

'কি করবে?'

'করো না বের।'

বের করল রবিন।

'হোভারকারগুলোর দিকে তাক করে বোতাম টিপতে থাকো,' কিশোর বলল।

কথামত কাজ করল রবিন।

আচমকা প্রাণ পেয়ে যেন নড়ে উঠল একটা হোভারকার। ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। ঘুরতে শুরু করেছে ফ্যানগুলো। মাটি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল।

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'এ কি কাণ্ড!'

বোবা হয়ে গেছে যেন রবিন। যন্ত্রটা হোভারকারের দিকে তাক করে টিপে দিল আরেকটা বোতাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতে শুরু করল কারটা। গতি বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত।

রবিনের দিকে ছুটে আসছে ওটা।

চোদ্দ

'সরো! সরে যাও!' চিৎকার দিয়ে দরজার দিকে ছুটল কিশোর।

চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' কালো যন্ত্রটা সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। সরে যেতে প্রস্তুত। আরেকটা বোতাম টিপে দিল। মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেল হোভারকারটা, তার দুই ফুট দূরে।

অন্য আরেক দিকে ডাইভ দিয়ে পড়েছিল মুসা। আস্তে করে উঠে বসল।

দরজার কাছ থেকে পায়ে পায়ে ফিরে এল কিশোর।

মুসা এসে দাঁড়াল তার পাশে। বলল, 'সাংঘাতিক রিস্ক নিয়ে ফেলেছিলে রবিন। এটা সাইন্স ফিকশন নয়। বাস্তব।'

'যা করেছি বুঝেই করেছি,' জবাব দিল রবিন। 'যখনই বুঝতে পারলাম এটা রিমোট কন্ট্রোল, বুঝে গেলাম চালু করার উপায় যখন আছে, থামানোর ব্যবস্থাও আছে। তুমি তো দেখার জন্যেই গাড়িটার দিকে তাক করে টিপতে বলেছিলে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম, সত্যি রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস কিনা। হোভারকারগুলোকে অপারেট করে কিনা।'

'কিন্তু যদ্দূর মনে পড়ে, প্যাটারসন বলেছিল রিমোট কন্ট্রোল নেই এগুলোর,' মুসা বলল। 'সে বলেছে, ভেতরে বসে চালাতে হয়।'

'মিথ্যে বলেছে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'সে আমাদের সত্যি কথাটা জানতে দিতে চায়নি।'

'তারমানে,' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন, 'গতকাল হোভারকারটাকে নিজেই নিজের দিকে চালু করে দিয়েছিল!'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'তার জীবনের ওপরও হুমকি আসছে দেখিয়ে আমাদের বিপথে চালিত করেছিল।' মুসার দিকে তাকাল সে, 'তুমি মনে করেছিলে তুমি তার জীবন রক্ষা করেছ। আসলে মোটেও তা নয়। তুমি না বাঁচালে সে নিজেই নিজেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করত, রিমোট কন্ট্রোলের স্টপ বাটন টিপে দিয়ে। জিনিসটা তার পকেটেই ছিল। আরেকটা কথা, মস্ত বড় অভিনেতা সে।'

'রিমোটে চলে না—মিথ্যে বলে বোঝাতে চেয়েছে ইঞ্জিনের মধ্যে কারসাজি করে রেখে গেছে কেউ,' রবিন বলল। 'খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে এখন!'

'কিন্তু এখনও জানি না আমরা,' কিশোর বলল, 'ফিল্মটা কেন চুরি করল সে? কেন খুন করতে চাইল ওরটেগাকে?'

'ওকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করলেই হয়,' রেগে গেছে মুসা। রাগটা লাগছে গতকালকের কথা ভেবে। প্যাটারসনকে বাঁচানোর জন্যে লাফ দিয়ে পড়েছিল সে। ওদিকে মনে মনে হেসেছে প্যাটারসন। নিশ্চয় গাধা ভেবেছে তাকে।

'হ্যাঁ, তা-ই করতে হবে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ফিল্মটা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগেই ধরতে হবে।'

তাঁবুর দরজার দিকে পা বাড়াল রবিন। ক্যানভাসের দরজা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিয়েই পিছিয়ে এল আবার, 'কাছাকাছিই আছে!'

ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। পার্কিং লটে প্যাটারসনকে দেখতে পেল কিশোর। বাদামী রঙের কয়েকটা মুদীর ব্যাগ ভরছে গাড়ির ট্রাংকে।

'ওই ব্যাগের মধ্যেই আছে ফিল্মটা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'মাস্টার নেগেটিভটাও নিশ্চয়।'

'চলো না গিয়ে জিজ্ঞেস করি!' অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। গাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে, এ সময় মুখ তুলে ওদের দেখতে পেল প্যাটারসন। তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিল ট্রাংকের ডালা।

'গুড আফটারনূন, মিস্টার প্যাটারসন,' কিশোর বলল। 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হলো।'

'তোমাদের দেখলে সব সময়ই ভাল লাগে আমার,' প্যাটারসন বলল। 'কিন্তু

এখন তাড়াহুড়ার মধ্যে আছি। পরে কথা বললে হয় না?'

'যদি কিছু মনে না করেন, এখনই বলতে চাই। বেশি সময় নেব না। মাত্র দুটো প্রশ্ন।'

'করে ফেলো।'

'প্রথম প্রশ্ন, গাড়ির ট্রাংকে কি ভরলেন?'

'মানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল প্যাটারসনের কণ্ঠ। 'আমার মালপত্র, আবার কি? ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এয়ারপোর্ট রওনা হব।'

'কিন্তু মালপত্রর মত তো লাগল না। মনে হলো, বাদামী রঙের মুদীর ব্যাগ।'

'ওরকম ব্যাগে করেই মালপত্র বহন করতে পছন্দ করি আমি, বিশেষ করে এ ধরনের কনভেনশনে,' জবাব দিল প্যাটারসন। 'ভক্তদের দেখানোর জন্যে কিছু স্পেশাল জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ফিল্ম চুরি গিয়ে ভজকট হয়ে যাওয়াতে আর দেখানো হলো না।'

'আমরা যদি দেখতে চাই এখন, দেখতে দেবেন?' ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফেটে গেলেও কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল কিশোর।

'না, দেব না,' রুক্ষ হয়ে উঠল প্যাটারসনের কণ্ঠ। 'এখন এখান থেকে চলে গিয়ে আমাকে আমার কাজ করতে দিলে খুশি হব।'

'রিমোট কন্ট্রোলের ব্যাপারে কেন মিথ্যে বলেছিলেন আমাদেরকে, মিস্টার প্যাটারসন?' রবিনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'দেখি, দাও তো ওটা।' বের করে কিশোরের হাতে দিল রবিন। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এটা দিয়ে দূর থেকেই হোভারকার চালানো যায়, তাই না?'

'কোথায় পেলে এটা?' বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল প্যাটারসনের চোখ। 'কাউকে ওটা ছুঁতে দিই না আমি!' কোটের পকেট চাপড়ে দেখতে লাগল ওর যন্ত্রটা আছে কিনা। যখন দেখল নেই, শিওর হয়ে গেল, কিশোরের হাতের জিনিসটা ওরটাই।

'কফি শপে ভুল করে ফেলে রেখে এসেছিলেন,' কিশোর বলল। 'আপনাকে ফিরিয়ে দিতেই এসেছিলাম। হঠাৎ করেই জেনে গেলাম জিনিসটা কি।'

লাল টকটকে হয়ে গেল প্যাটারসনের মুখ। 'দাও ওটা!' চিৎকার করে হাত বাড়াল কেড়ে নেয়ার জন্যে। 'মারাত্মক জিনিস। ওটা দিয়ে মেলা ঝামেলা পাকাতে পারবে।'

দ্রুত রিমোটটা হাত বদল করে ফেলল কিশোর। দিয়ে দিল আবার রবিনের হাতে। বলল, 'কালকে নিজের জীবনের ওপর হুমকি আসার নাটকটা ভালই করেছিলেন। পকেটে ছিল রিমোট। বোতাম টিপে হোভারকারটাকে ছুটিয়ে এনেছিলেন নিজের দিকে। আমাদের বোকা বানানোর জন্যে।'

'সেটা তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না!' যন্ত্রটা আবার কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে হাতের চাবির রিঙটা মাটিতে পড়ে গেল প্যাটারসনের। ছোঁ মেরে

সেটা মাটি থেকে তুলে নিল কিশোর।

'দাও ওটা! দাও বলছি!' চিৎকার করে উঠে রবিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল প্যাটারসন।

আটকে ফেলল তাকে মুসা।

গাড়ির ট্রাংকের তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় মারল কিশোর। লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেল ডালা। চোখের পলকে বাদামী একটা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ফিল্মের রিল রাখার গোল একটা টিনের বাক্স বের করে আনল সে।

'অ্যাই যে, চোরাই ফিল্মের রিল,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চোখ।

'আমার জিনিস ঘাঁটছ কোন সাহসে?' চিৎকার করে উঠল প্যাটারসন।

'এগুলো আপনার জিনিস নয়, মিস্টার প্যাটারসন,' কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'চোরাই মাল।'

'কে বলল চোরাই! ওগুলো আমার জিনিস। আমার বানানো ফিল্ম। আমার সৃষ্টি।'

'মিস্টার ওরটেগার সামনে বলতে পারবেন সে-কথা?'

'না পারার কি আছে? চোর যদি কাউকে বলতে হয়, ওরটেগাকে বলা উচিত। আমাকে না।'

'বুঝলাম না আপনার কথা,' একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের।

'ওরটেগা আমার স্পেস হান্টার সিরিজ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে,' রাগে গোঁ-গোঁ করে উঠল প্যাটারসন। 'বহু বছর আগে। ছবির সমস্ত আইডিয়া আমার মাথা থেকে বেরিয়েছিল, ওর নয়।'

'দারুণ তো!' রবিন বলল। 'মিস্টার কারলু বলছে তার জিনিস চুরি করেছে, আপনি বলছেন আপনার জিনিস।'

'কারলু?' খেঁকিয়ে উঠল প্যাটারসন। 'ওই বুড়ো গাধাটা? ওর বইগুলো ছুঁয়েও দেখিনি আমি জীবনে। ওরটেগাও পড়েনি কখনও। কাহিনীর সঙ্গে যে সব মিল পাওয়া যায়, সেটা কাকতালীয়, আদালত তো রায় দিয়েই দিয়েছে। পুরো আইডিয়াটা নিজের মাথায় সাজিয়ে নিয়ে ওরটেগার কাছে গিয়েছিলাম। আমার আইডিয়া বাস্তবে রূপ দিয়েছে সে। আমি ভেবেছিলাম, কৃতিত্বটা দু'জনে ভাগাভাগি করে নেব। কিন্তু ও আমাকে ঠকিয়ে সমস্ত প্রশংসা, সব কৃতিত্ব একাই মেরে দিল।'

'সাইন্স ফিকশন জগতে আপনিও একটা পরিচিত নাম,' কিশোর বলল। 'অনেকেই নাম শুনেছে আপনার।'

'আমার পাওনার তুলনায় সেটুকু কিছুই না,' রেগে উঠল প্যাটারসন। 'সমস্ত হলিউডে ওরটেগাকে এখন যে সম্মানের চোখে দেখা হয়, সেটা পাওয়ার কথা ছিল আমার। আমার চেয়ে দশ গুণ বেশি আয় করে সে, দশ গুণ বেশি বিখ্যাত। আগে যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতাম, ও এতবড় শয়তান, অন্য পরিচালকের কাছে যেতাম আমি। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে সে আরও কি করেছে জানো? স্পেস হান্টার সিরিজটা বন্ধ করে দিয়ে নতুন একটা সিরিজ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমাকে এবং আমার স্পেশাল ইফেক্ট বাদ দিয়ে।'

'আপনার ইফেক্ট বাদে?' রবিন বলল, 'তা কি করে করবে? ওগুলো বাদ দিলে কি থাকবে ছবির?'

'কিছুই থাকবে না,' প্যাটারসন বলল। 'কিন্তু নতুন একজন স্পেশাল ইফেক্ট ডিরেক্টর ভাড়া করবে ঠিক করেছে সে। সব কিছুই যে কম্পিউটারে সেরে দেবে। সেই লোকটার সঙ্গে এই কনভেনশনে কথা বলবে ঠিক করেছিল। তার সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেলে খুব কম খরচে আর কম ঝামেলায় স্পেশাল ইফেক্টের কাজ সেরে ফেলতে পারবে। স্কেল মডেল আর ক্যামেরার কারসাজির কোন প্রয়োজনই পড়বে না। কম্পিউটারই যথেষ্ট।'

'প্রফেসর অরওয়েল!' প্রায় চিৎকার করে উঠল রবিন। 'রোজারের চাচা!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল প্যাটারসন। 'তাকে কাজে নিলে আরও অনেক সুবিধে ওরটেগার। অরওয়েল কৃতিত্বের দাবিদার হওয়ার জন্যে চাপাচাপি করবে না। সারাক্ষণ তাতে মানসিক অস্বস্তিতে ভুগতে হবে না ওরটেগাকে। পয়সাও বাঁচবে। অনেক সস্তায় কাজ পাবে। ওরটেগা অবশ্য এ সব কথা এখনও বলেনি আমাকে। আগে চুক্তি করবে অরওয়েলের সঙ্গে। আমি জানি, তারপর স্রেফ কান ধরে বের করে দেবে আমাকে।'

'তাই প্রতিশোধ নিতে তাঁকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু ফিল্মটা চুরি করলেন কেন?'

'কারণ, ছবির সমস্ত কপি হারিয়ে গেলে নতুন করে আবার শূটিং করতে হবে ওরটেগাকে,' প্যাটারসন বলল। 'তাই হলিউড থেকে প্রথমেই ছবির নেগেটিভটা সরিয়ে ফেলেছিলাম আমি, এখানে আসার আগেই। ওটা যে নেই, জানতে ওদের অনেক সময় লেগে গেছে। কপিটাও সরিয়েছি। ছবিটা আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে স্টুডিওকে। পরিচালনার জন্যে লোক দরকার হবে। আমি তখন আবেদন করব। আর আমি জানি, দায়িত্বটা আমাকেই দেয়া হবে। কারণ স্পেস হান্টারগুলো মূলত আমিই পরিচালনা করেছি, নামকাওয়াস্তে সঙ্গে সঙ্গে ছিল ওরটেগা। এবার ছবিটা আমি একা বানাব। ডিরেক্টর হিসেবে নাম যাবে একা আমার। সব সুনামের ভাগীদার হব আমি।'

দম নিল প্যাটারসন। তারপর বলল, 'নিখুঁত ভাবেই কাজটা সেরে ফেলেছিলাম, কিন্তু বাগড়া দিতে এলে তোমরা। তোমাদেরকে ভাড়া করল মারলা মেয়েমানুষটা। বুঝলাম, ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি। কন পার্টিতে তোমাদের খোঁজ-খবর করতে দেখে বুঝে গেলাম, তোমরাই মারলার টিকটিকি। পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি খুঁতখুঁতে তোমরা, এমন সব অ্যাঙ্গেল থেকে তদন্ত শুরু করে দিলে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে গেলাম। সে-জন্যেই একআধটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন, 'নষ্ট এলিভেটরের দরজায় কারসাজি করে রাখার বুদ্ধিটা ভালই করেছিলেন।'

'বর্শাটা ছুঁড়লেন কি করে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হাত দিয়ে, আর কি করে?' হাসল প্যাটারসন। 'যে ছবিটা দেখানো হচ্ছিল, ছোটবেলায় খুব প্রিয় ছবি ছিল ওটা আমার। দেখতে দেখতে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। তোমাদেরকে ঢুকতে দেখে চুপি চুপি ঢুকে পড়লাম আমিও। ডিসপ্লে বক্স থেকে একটা বর্শা বের করে নিয়ে রেডি হয়ে রইলাম। আমি জানি জংলীটা কখন বর্শা ছুঁড়বে। সে বর্শা তুলতেই আমি ছুঁড়ে মারলাম। মনে হলো পর্দা থেকে ছুটে গেল বর্শাটা। স্পেশাল ইফেক্ট। আরও আগেই ছুঁড়তে পারতাম, কিন্তু নাটকীয়তা আমার পছন্দ, আর সে-জন্যেই পেশায় এতটা উন্নতি আমি করতে পেরেছি।'

'যে রকম নিখুঁত নিশানা,' মুসা বলল, 'অলিম্পিক গেমসেও উন্নতি করতে পারতেন।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল, 'ওই সবুজ মেডালিয়নটা পরে থাকতেন কেন আপনি? জানতেন না ওটা একটা বড় সূত্র হতে পারে, ধরিয়ে দিতে পারে আপনাকে?'

'জানতাম,' হাসিমুখে বলল প্যাটারসন, 'আর জানতাম বলেই কস্টিউমের সঙ্গে পরেছি। পরে খুলে রেখেছি। আমি চেয়েছি তোমরা ভুল পথে পরিচালিত হও। সবুজ মেডালিয়ন পরা লোকের খোঁজ করতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে থাকো। ততক্ষণে ওরটেগার ব্যবস্থা করার সুযোগ পেয়ে যাব আমি।'

'আরেকটু হলে আমার আর রবিনের ব্যবস্থাও প্রায় করে ফেলেছিলেন,' কিশোর বলল।

'কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারেননি,' যোগ করল মুসা। 'তারমানে আপনার স্পেশাল ইফেক্ট ততটা স্পেশাল নয়, খুঁত আছে।' রবিন আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। ওরাও হাসতে লাগল।

আড়চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে প্যাটারসন, হাসাহাসির জন্যে লক্ষ করল না ওরা। কিন্তু এ রকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল লোকটা। আচমকা সামনে ঝুঁকে গেল সে। একটানে ট্রাংকের গভীর থেকে বের করে আনল একটা বড় জিনিস।

ভয়ঙ্কর দেখতে একটা বন্দুকের মত জিনিস কিশোরের দিকে তাক করে টিপে দিল ট্রিগার। নলের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরোল দলা দলা কমলা রঙ। কিশোরের চোখে-মুখে লেগে ছড়িয়ে গেল।

রবিন কিছু বোঝার আগেই তার মুখেও এসে লাগল ওই রঙ। মুসা সরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু প্যাটারসন অনেক বেশি ক্ষিপ্র। মুসার মুখেও রঙ ছড়িয়ে দিল সে।

পাগলের মত থাবা দিয়ে রঙ সরানোর চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না! অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে!'

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের ওপর ডলতে শুরু করল সে। চোখ পরিষ্কার করে আবার যখন দেখার উপযুক্ত করল, প্যাটারসনকে দেখতে পেল না আশেপাশে। হোভারকারের ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ কানে এল এ সময়। তাঁবুর

দরজার ক্যানভাস ফাঁক করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হোভারকার। ড্রাইভিং সীটে প্যাটারসন।

'ওই যে, আসছে সে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। মুখ থেকে রঙ মুছছে এখনও।

'আমাদের দিকেই আসছে!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। মাথার ওপর দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল হোভারকার, কারও কোন ক্ষতি করতে পারল না। চলে গেল পার্কিং লট থেকে বেরোনোর গেটের দিকে।

'চলে যাচ্ছে তো!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'রবিন, জলদি রিমোট টেপো!'

হোভারকারটার দিকে রিমোট তুলে ক্রমাগত বোতাম টিপতে লাগল রবিন। কোন কাজ হলো না। 'হচ্ছে না তো! প্যাটারসন নিশ্চয় কন্ট্রোল প্যানেলে এমন কিছু করে দিয়েছে এখন, যাতে রিমোট কাজ না করে।'

'তাহলে গাড়িতে করেই পিছু নিতে হবে ওর,' কিশোর বলল। 'কিন্তু আমাদেরটা তো বহু দূরে।'

তাঁবু থেকে আবার ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল ওরা, দরজার ক্যানভাস ফাঁক করে দ্বিতীয় হোভারকারটাও বেরিয়ে আসছে।

হেসে ফেলল রবিন। 'বুঝে গেছি,' মাথা কাত করল সে। হোভারকারের দিকে রিমোট তুলে বোতাম টিপল। 'প্যাটারসন যেটাতে করে গেছে সেটা ধরতে না পারলেও, রিমোটের সিগন্যাল ঠিকই পেয়ে গেছে এই দ্বিতীয়টা।'

'মুসা! জলদি!' হোভারকারটা কাছে এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে ওটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'উঠে পড়ো। চালাও এটা।'

লাফ দিয়ে ড্রাইভীং সীটে উঠে বসল মুসা। পাশের প্যাসেঞ্জার সীটে ঠাসাঠাসি করে বসল রবিন আর কিশোর।

'ভাগ্যিস প্যাটারসন আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল কি করে চালাতে হয়,' জয়স্টিক চেপে ধরেছে মুসা। 'হোভারকার চালানোর বিদ্যেটা যে এত তাড়াতাড়ি এমন কাজে লেগে যাবে কল্পনাই করিনি।'

জয়স্টিক সামনে ঠেলে দিল সে। ছুটতে শুরু করল হোভারকার। দুই ফুট ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে তীব্র গতিতে ছুটে চলল বেরোনোর গেটের দিকে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে সামনে শ'খানেক ফুট দূরে দেখতে পেল প্যাটারসনের কারটা। মোটেলের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা ক্রস করে এল মুসা। আরেকটা রাস্তার ওপর দিয়ে এগোতে গিয়ে বুঝতে পারল, চাকার গাড়ির সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না হোভারকার, ওগুলো অনেক বেশি দ্রুত।

'একটা সাধারণ গাড়ি পেলে অনেক সহজে তাড়া করতে পারতাম প্যাটারসনকে,' আফসোস করে বলল সে।

‘লেগে থাকো পিছে,’ কিশোর বলল। ‘থামতে বাধ্য হবে সে খুব সহসাই।’

‘বেশি গাড়িঘোড়ার মধ্যে চলে গেলে বিপদে পড়ে যাব,’ মুসা বলল। ‘সরু ফাঁক-ফোকর দিয়ে এটা নিয়ে কেটে বেরোনোর সাধ্য আমার হবে না।’

যেন তার কথা শুনতে পেয়েই সরু রাস্তা থেকে নাক ঘুরিয়ে একটা ফোর-লেন হাইওয়ের দিকে ছুটল প্যাটারসন। রাস্তায় ওঠার মুখেই ধাক্কা প্রায় লাগিয়ে দিয়েছিল একটা ভ্যানের সঙ্গে। ব্রেক কষে থেমে গেল ড্রাইভার। জোরে জোরে হর্ন টিপতে লাগল।

‘আরে এ তো মহা ঝামেলায় ফেলে দিল!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

‘যা-ই করুক, চালিয়ে যাও। থেমো না,’ কিশোর বলল।

পারব না বললেও ঠিকই প্যাটারসনকে অনুসরণ করে হাইওয়ে ধরে ছুটতে থাকল মুসা। চতুর্দিক থেকে গাড়ির হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা হচ্ছে। দুটো উড়ুক্কু গাড়ি একটা আরেকটাকে তাড়া করছে, এ রকম দৃশ্য কেবল সিনেমাতেই দেখেছে ওরা, বাস্তবে দেখেনি।

কিন্তু প্যাটারসন চলেছে কোথায়? লেনের পর লেন বদল করছে প্যাটারসন। ট্র্যাফিক জ্যাম থেকে বাঁচার জন্যে।

‘কোথায় যাচ্ছে?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘সেটাই তো ভাবছি,’ মুসা বলল।

‘আমার ধারণা সে নিজেও জানে না,’ কিশোর বলল। ‘রকি বীচে সে নতুন। পথঘাট চেনার কথা নয়। আমাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে ছুটছে। শীঘ্রি তার এ ছোটার অবসান হবে।’

‘একটা পুলিশের গাড়ির সামনে পড়ে যেত যদি এখন ভাল হতো,’ রবিন বলল। ‘টিকেট ধরিয়ে দেয়ার জন্যে থামাত। ধরে ফেলার সুযোগ পেতাম।’

‘কিন্তু হোভারকারের টিকেট কি দেয়?’ মুসা বলল, ‘এ তো শূন্য দিয়ে চলে, মাটি দিয়ে চাকার ওপর গড়িয়ে চলে না।’

‘বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে দিয়েও দিতে পারে,’ আশা করল কিশোর।

হঠাৎ হাইওয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে শহরের বাইরে বেরোনোর একটা রাস্তায় সরে এল প্যাটারসন।

‘আরে সাগরমুখো ছুটেছে তো,’ বলে উঠল রবিন।

‘টের পাবে সাগরপাড়ের পাহাড়চূড়াটায় ধাক্কা খেলে,’ মুসা বলল।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই মুহূর্তে যেন লাফ দিয়ে দৃষ্টি-সীমায় চলে এল রাস্তার পাশ ঘেঁষে যাওয়া একসারি সাদা পাহাড়ের টিলা। তার ওপারে প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলরাশি। হোভারকারের মুখ ঘুরিয়ে সোজা সাগরের দিকে ছুটল প্যাটারসন।

‘কি করছে ও?’ চিৎকার করে উঠল রবিন। ‘পাগল হয়ে গেছে নাকি!’

‘কি জানি!’ ঠোঁট কামড়াল কিশোর। ‘তবে পিছু নেয়া বন্ধ কোরো না। ও যেদিকে যায়, যেতেই হবে আমাদের।’

সোজা টিলাগুলোর দিকে ছুটে গেল প্যাটারসন। তিন গোয়েন্দাকে তাজ্জব করে দিয়ে চলে গেল টিলার অন্যপাশে। ভারী পাথরের মত নিচে পড়তে শুরু করল। একশো ফুট নিচে।

'না না, আর এগিয়ো না!' মুসাকে বাধা দিল কিশোর। 'ওকে আর অনুসরণ করার দরকার নেই। মারা পড়ব!'

আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল মুসা, 'ও আমাকে চালানো শিখিয়েছে, কিন্তু থামানো শেখায়নি!' সঠিক বোতামটার জন্যে পাগলের মত ড্যাশবোর্ড হাতড়াতে শুরু করল ওর আঙুলগুলো। 'ব্রেকটা কোথায়, তা-ও জানি না!'

'রিমোট! রিমোট ব্যবহার করো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তার আঙুল রিমোটটা চেপে ধরার আগেই টিলা পার হয়ে এল হোভারকার। নিচে মাটি নেই। ফ্যান থেকে তৈরি হওয়া বাতাস চাপ দিয়ে কারটাকে ভাসিয়ে রাখার মত শক্ত কিছু নাগালে পেল না।

নিচে পড়তে শুরু করল হোভারকার।

পনেরো

পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল রবিনের। খামচি দিয়ে ধরার মত অনুভূতি। তীব্র গতিতে সাগরের পানির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হোভারকার।

তারছেঁড়া এলিভেটরের মত নিচে পড়ছে কারটা। তফাৎ শুধু, এলিভেটর পড়ার সময় আশেপাশে ওটার দেয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না, কিন্তু এখানে চারপাশটা খোলা।

পেছনে ভয়ঙ্কর গতিতে উঠে যাচ্ছে মনে হচ্ছে খাড়া পাহাড়ের দেয়াল। কিন্তু পাহাড় তো আর ওঠে না, তারমানে ওই গতিতে নেমে চলেছে কারটা। পাশ দিয়ে বকের মত গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল মুসা। আফসোস হলো। নীল পানির উঠে আসার গতিটা দেখা ভুল হয়ে গেছে।

'মাটি পাচ্ছে না,' শান্ত থাকার চেষ্টা করতে করতে বলল কিশোর। 'শুধু বাতাসে কামড় বসাতে পারবে না ফ্যানগুলো।'

'পানিতে কাজ করবে?' মুসা বলল। 'নাকি ইতিহাস হতে যাচ্ছি আমরা?'

ইতিহাস আপাতত হওয়া লাগল না ওদের। পানি ছোঁয়ার আগ মুহূর্তে স্প্রিঙের মত ধাক্কা দিয়ে হোভারকারটাকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে তুলে দিল ফ্যানের বাতাস। শূন্যে থাকতেই ঝাঁকি দিয়ে প্যারাশূট খুলে গেল যেন শেষ মুহূর্তে। পানিতে পড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি খাওয়ার অপেক্ষায় ছিল তিনজনেই। খেল না। পাশ দিয়ে আবার গলা বাড়িয়ে দেখল মুসা। বাতাসের ঝাপটায় পানিতে গোল গোল গামলার মত তৈরি হয়েছে।

'আহ্, বাঁচলাম!' হাসি ফুটল এতক্ষণে মুসার মুখে। মুখ থেকে পানির ছিটে মুছল।

'ওই যে, যাচ্ছে ও,' হাত তুলল কিশোর। ওদের সামনে দেখা যাচ্ছে প্যাটারসনের হোভারকারটা।

জয়স্টিক ঠেলে দিল আবার মুসা। পলায়মান স্পেশাল-ইফেক্ট ডিরেক্টরের পিছু ধাওয়া করল আবার তারই তৈরি করা হোভারকার।

'দারুণ! দারুণ!' খুব মজা পাচ্ছে এখন মুসা। 'এ রকম দুর্লভ স্পীডবোট রেসিঙের জন্যে কপালটাকে ধন্যবাদ না দিয়ে আর পারছি না।'

বাঁ দিক থেকে একটা বোটের ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে। ফিরে তাকিয়ে দেখল পানি কেটে ছুটে আসছে একটা মোটরবোট। গলুইয়ের কাছের কাটা পানি সাদা ফেনা তুলে দুটো লম্বা মোটা রেখা তৈরি করে বহুদূর ছড়িয়ে যাচ্ছে পেছনে। মুসাদের হোভারকারটাকে তাজ্জব হয়ে দেখছে ড্রাইভার। এদিকে তাকিয়ে থাকায়ই বোধহয় প্যাটারসনের গাড়িটা তার চোখে পড়েনি। ক্রমেই সরে যাচ্ছে সেদিকে।

স্পীডবোটের ড্রাইভার প্যাটারসনকে দেখতে না পেলেও সে ঠিকই দেখেছে বোটটাকে। মরিয়া হয়ে জয়স্টিক টানাটানি শুরু করল রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু পারল না।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তিন গোয়েন্দা, স্পীডবোটের গলুইটা গিয়ে ধাক্কা মারল হোভারকারের পেটে। নিখুঁত ভাবে চিরে দিল মাঝখানটা। বাতাসে ডিগবাজি খেতে লাগল স্পেশাল-ইফেক্ট ডিরেক্টর। তার ভাঙা হোভারকারটা পড়ল পানির একখানে, সে আরেকখানে।

মোটরবোটের হতবাক ড্রাইভার সময়মত গলুইটা ঘুরিয়ে দিতে পারায় প্যাটারসনের গায়ে আর গুঁতোটা লাগল না। গতি কমিয়ে দিয়ে তাকে ঘিরে পাক খেতে শুরু করল সে। মাথা নাড়ছে এমন ভঙ্গিতে যেন ভয়ানক এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে।

'মরে গেল নাকি প্যাটারসন?' চিন্তিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এ ঘটনাটা ডাঙায় ঘটালে শিওর মরে যেত,' জবাব দিল কিশোর। 'পানিতে পড়েছে তো, আশা আছে।'

'ওই যে সে,' হাত তুলল মুসা। বোটের প্রপেলারের আঘাতে মাতাল হয়ে ওঠা ঢেউয়ের মাঝে প্যাটারসনের মাথাটা ভাসতে দেখা গেল। বড়শির ফাৎনার মত ডুবছে আর ভাসছে। হাত তুলে শূন্যে ঝাঁকাতে শুরু করেছে পরিচালক।

'তোলো আমাকে!' কিশোররা কাছাকাছি হতে চিৎকার করে উঠল প্যাটারসন।

'তা তো তুলবই,' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। 'রকি বীচ পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে হবে যে আপনাকে। এখন বলুন তো, হোভারকার কি করে থামাতে হয়?'

এগিয়ে আসছে মোটরবোট। পাইলটের দিকে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকতে

লাগল কিশোর, 'এই যে ভাই, কাছে আসুন! সাহায্য করুন আমাদের!'

*

কয়েক ঘণ্টা পর।

রকি বীচ ইনের লবিতে চামড়ায় মোড়া কাউচে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। প্যাটারসনকে থানায় রেখে এসেছে।

'কি করে বুঝলে, প্যাটারসনই সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী?' জানতে চাইল রোজার। 'ওকে তো ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারতাম না আমি।'

'এটাকেই তো বলে গোয়েন্দাগিরি,' ভারিক্কি চালে কথাটা বলে হাতের পপকর্নের প্যাকেট থেকে এক মুঠো কর্ন গালে পুরে দিল মুসা।

এই সময় ছুটতে ছুটতে এল মারলা। গোয়েন্দাদের দেখে এগিয়ে এল। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওদের প্রশংসা করতে লাগল। বলল, 'উহ্, বাঁচালে আমাকে তোমরা! কেসটার কিনারা করতে না পারলে আমি তো যেতামই, সারা জীবনের জন্যে কানা হয়ে যেত রকি বীচ কন। কেউ আর এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসতে চাইত না।'

'ভাল কথা,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার ওরটেগা কেমন আছেন?'

'ভাল,' জবাব দিল মারলা। 'খুব বেশি বিষ পেটে যায়নি তাঁর। আশা করছি শীঘ্রি সেরে উঠে কন-এ যোগ দিতে পারবেন। ছবিটাও দেখানো যাবে, তাঁর বক্তৃতাও শোনা যাবে। তোমাদের দাওয়াত রইল।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'সরি, আমরা থাকতে পারব না। আমাদের মাপ করবেন।'

'কেন?' মারলা অবাক।

'ও রকম একটা ঠগবাজের সামনে যাওয়ার আর রুচি হচ্ছে না আমাদের।'

সব কথা জানে না মারলা। তাকে সব খুলে বলল তিন গোয়েন্দা।

শুনে গম্ভীর হয়ে গেল মারলা। 'তাই তো! এ রকম একটা লোককে তো আর সম্মান দেয়া যায় না। নাহ্, তার ছবি দেখানো বন্ধ। যদি দেখাতেই হয়, প্যাটারসনের নামটাকে বড় করে তুলতে হবে। অপরাধ যা করেছে, তার শাস্তি সে পাবে। কিন্তু যে কাজটার জন্যে তার প্রশংসা প্রাপ্য, সেটা অন্যে চুরি করে নেবে, তা তো হতে দেয়া যায় না। ওরটেগার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার, তাকে শাস্তি দেয়ার এটাই সুযোগ। এই রকি বীচ কনেই ভক্তদের সামনে তার সমস্ত জারিজুরি, তার সমস্ত শয়তানি ফাঁস করে দিতে হবে...'

'যদি সত্যিই শয়তানিটা করে থাকেন তিনি,' রোজার বলল।

'করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্যাটারসন যে সত্যি বলেছে, তার বড় প্রমাণ তোমার চাচার সঙ্গে খাতির করা। কম্পিউটারের সাহায্যে স্পেশাল ইফেক্ট তৈরির ব্যবস্থা করা। প্রফেসর অরওয়েলকে দিয়ে কাজ করাতে হলে প্যাটারসনকে বাদ দিতে হবে ওরটেগার। এতকাল একসঙ্গে কাজ করার পর এটাও তো একটা বিরাট অন্যায়।'

'ঠিক, বিরাট অন্যায়!' হাত মুঠো করে ঝাঁকাল মারলা। 'অনেকই তো করলে, আরেকটা কাজ করে দেয়ার অনুরোধ করব তোমাদের। ওরটেগার বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে সাহায্য করবে আমাকে। ওরকম একটা পাজী লোককে এস এফ-এর জগতে থাকতে দেয়া যায় না।'

'না, যায় না!' মারলার সঙ্গে সুর মেলাল রোজার।

'কি, সাহায্য করবে তো আমাদের?' তিন গোয়েন্দার মত জানতে চাইল আবার মারলা।

'করব,' কিশোর বলল।

রবিন বলল, 'আমিও করব।'

মুসা বলল, 'ওরা দু'জন যখন রাজি হয়েছে, আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু এ ধরনের উত্তেজনার কাজ করতে গেলে ঘন ঘন খিদে পায় আমার। খাবারটা সরবরাহ করবে কে?'

'অবশ্যই আমরা,' হাসিমুখে জবাব দিল মারলা। 'রকি বীচ কন। যতদিন সম্মেলন চলবে, মোটেলের কফি শপটা তোমার জন্যে…তোমাদের চারজনের জন্যে ফ্রী।'

***
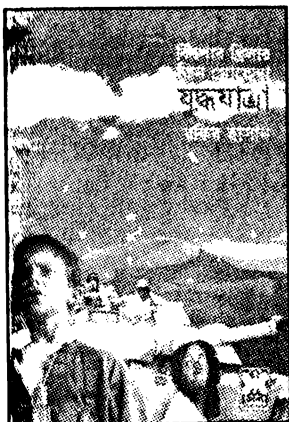
যুদ্ধযাত্রা

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

ভাল ঘুম হয়নি রাতে। প্লেনের সীটে বসেই আড়ষ্ট হাত-পা টানটান করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল কিশোর। জানালা দিয়ে তাকাতে দূরে চোখে পড়ল তুষারে-ঢাকা মাউন্ট কিলিমানজারোর চূড়া। ঘাসে ঢাকা সীমাহীন সমভূমিতে দাঁড়িয়ে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে বিশাল পর্বতমালা।

'এই ওঠো ওঠো,' দুই কনুই দিয়ে আলতো গুঁতো লাগাল দু'পাশে বসা মুসা আর রবিনের গায়ে। 'এসে গেছি।'

গুঙিয়ে উঠল দুই সহকারী। আস্তে আস্তে চোখ মেলল। মারিসা জেগে গেছে কিশোরেরও আগে। ধরতে গেলে ঘুমায়ইনি সে। চোখ লাল। বিশাল পর্বতমালাটার দিকে তাকিয়ে আছে আবেগে ভরা দৃষ্টিতে।

'ইচ্ছে করলে এখনও ফিরে যেতে পারি আমরা,' মোলায়েম কণ্ঠে বলল কিশোর।

'তা পারো,' হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল মারিসার ঠোঁটে, 'তবে তোমরা। কিন্তু আমি পারি না।'

কেনিয়ায় নেমে একটা এক ইঞ্জিনের পুরানো প্লেন ভাড়া করে দিল রাবাটু। জরুরী কাজ থাকাতে কেনিয়ায় রয়ে গেল সে।

মরুভূমির মাঝখানের ছোট্ট এক শহরে গোয়েন্দাদের উড়িয়ে নিয়ে এল প্লেনটা। এখানে একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ ল্যান্ডরোভার জীপ ভাড়া করে সোজা রওনা হলো দক্ষিণে।

'রাবাটুর নির্দেশ মত এ রাস্তা ধরে সোজা দুশো মাইল চলে যেতে হবে আমাদের,' তীব্র গতিতে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল মুসা। 'তারপর পাহাড়ের কোলে ছোট একটা শহরে পৌঁছাব। সেখানে দেখা হবে জোহ্যান্স নামে এক লোকের সঙ্গে। এই তো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

রাস্তা বলতে মরুভূমির বুক চিরে চলে যাওয়া দুটো চাকার খাঁজ, আর কিছু না। পেছনে ধুলোর ঝড় রেখে আসছে ল্যান্ডরোভার।

মারিসা জানাল এখন খরা চলছে। কয়েক বছর ধরেই চলছে এই অবস্থা। এ অঞ্চলের উপজাতীয়রা ফসল ফলাতে পারছে না। অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছে।

'এত খারাপ অবস্থা জিবুয়ার!' মুসা বলল।

'অন্তত অর্ধেকটার তো বটেই,' জবাব দিল মারিসা। 'দেশের মাঝখান দিয়ে

চলে গেছে একটা পর্বতমালা। একপাশে জঙ্গল; আরেক পাশে এখানকার মত মরুভূমি।'

চোখ কুঁচকে দিগন্তের দিকে তাকাল মুসা। বহুদূরে অস্পষ্ট ভাবে পর্বত চোখে পড়ল। কাঁচা সড়কটার দু'ধারে কদাচিৎ যে সব ঝোপঝাড় বা গাছপালা চোখে পড়ছে, সবই অতিরিক্ত রুক্ষ, বাদামী রঙের। দুপুরের রোদ ভয়াবহ গরম। তাপমাত্রা উঠে গেছে ১০২ ডিগ্রিতে। সঙ্গে করে ওরা প্রচুর পানি এনেছে বলে রক্ষা। বার বার ক্যান্টিন খুলে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। ধুয়ে নামিয়ে দিচ্ছে গলায় ঢোকা গরম, খসখসে বালু।

'ওই দেখো,' চিৎকার করে উঠল রবিন, 'উপজাতীয়দের গ্রাম। আমার ক্যামেরাটা কোথায়?'

পাতায় ছাওয়া কাদার দেয়াল তোলা একসারি ঝুপড়ির মত কুঁড়ে ঘর দেখা গেল। ক্যামেরা তুলে রেডি হয়ে রইল রবিন। আশা করেছিল সিনেমায় দেখা মানুষের মত ঝলমলে রঙিন পোশাক পরা মানুষেরা পিলপিল করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু গাঁয়ে ঢুকে মুখ শুকিয়ে গেল তার। যেন হরর ছবির দৃশ্য!

অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। কোলের ওপর খসে পড়ে গেল ক্যামেরাটা।

রাস্তায় বেরিয়ে এল একদল ছেলেমেয়ে, ছোট আকারের এক ঝাঁক কঙ্কাল বললে ভুল হবে না। পাটকাঠির মত সরু সরু হাত। পেটে-পিঠে লেগে গেছে। মারাত্মক অনাহারের শিকার। ক্ষুধায় এতটাই কাহিল, হাত তুলে ভিক্ষে চাওয়ারও শক্তি নেই। শূন্য চোখ মেলে ল্যান্ডরোভারটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে আছে।

'থামো! থামো!' চিৎকার করে উঠল মারিসা।

রাস্তার পাশে গাড়ি রাখল মুসা। দুই হাতে দুটো পানির কনটেইনার নিয়ে নেমে গেল মারিসা। লাঞ্চের জন্যে নিয়ে আসা স্যান্ডউইচের ব্যাগটা নিয়ে তাকে অনুসরণ করল রবিন। কিশোরও নামল।

কাছে আসারও সাহস নেই বাচ্চাগুলোর। কিন্তু খাবার আর পানি দেখে কাদার কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ওদের বাবা-মায়েরা। কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে গ্রহণ করল জিনিসগুলো।

'ইস্, বেশি করে নিয়ে আসা উচিত ছিল!' গাড়িতে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মারিসা। 'মাত্র দুই বছরে যে অবস্থা এত খারাপ হয়ে যাবে কল্পনাই করিনি।'

কেউ কিছু বলল না। গম্ভীর হয়ে আছে মুসা। মানুষগুলোর দুর্দশা দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে তারও। আফ্রিকা! তার পূর্বপুরুষের জন্মভূমি। ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলোকে দেখে সাংঘাতিক বিব্রত সে। খাবার নিয়ে ওদের কাড়াকাড়ির দৃশ্যটা সহ্য করতে পারবে না বলেই নামেনি।

পথে আরও কয়েকটা গ্রাম পেরোল ওরা। সবগুলোর অবস্থা প্রথমটার মত। গাড়িতে যা ছিল দিয়ে দিয়ে শেষ করে ফেলল মারিসা। খুব শীঘ্রিই দেয়ার মত আর কিছুই রইল না, কাজেই নামাও বন্ধ করে দিল। যতই এগোচ্ছে, দেশবাসীকে সাহায্য করার ইচ্ছেটা প্রবলতর হতে থাকল। বিপদের মুখোমুখি হবার প্রেরণা পেল এ থেকে।

'মরুভূমির সব গাঁয়েরই দশা মনে হচ্ছে একই রকম করুণ,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল সে। 'ওদের পাশে দাঁড়াতেই হবে আমাকে। তাতে যদি মরিও, মরব। জনগণ না খেয়ে মরলে আমার বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মুসার। মারিসার সঙ্গে সে-ও একমত।

দুই

ভাবছে কিশোর।

ঘটনার সূত্রপাত চার দিন আগে।

বিকেল বেলা স্যালভিজ ইয়ার্ডে কিশোরদের বাড়ির রান্নাঘরে বসে কথা বলছে কিশোর আর মুসা।

টেবিলে রাখা ছবিটা মুসার দিকে ঠেলে দিল কিশোর। পুরানো, দুমড়ে যাওয়া কাগজ। বহু বছর ধরে কারও পকেট-ব্যাগে থেকে পকেটে পকেটে ঘুরে বেড়ানোর ফল। খুব সুন্দরী এক আফ্রিকান কিশোরীর ছবি।

ছবিটা ভালমত দেখে কিশোরের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুসা। 'সমস্যাটা কি? বাড়ি থেকে পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। ওর বাবা ছিলেন জিবুয়ার প্রেসিডেন্ট।'

'খাইছে! একেবারে তো রাজকুমারী!'

'একটু আগে রাবাটু নামে একটা লোক দেখা করে গেছে আমার সাথে,' কিশোর বলল। 'ও চাইছে, মেয়েটাকে আমরা খুঁজে বের করে দিই। তার ধারণা, লস অ্যাঞ্জেলেসের কোথাও রয়েছে সে।'

'কোথায়?'

'সেটাই জানতে হবে আমাদের। মেয়েটার নাম মারিসা ওমাঙ্গা। এই ছবিটা তোলা হয়েছে চার বছর আগে। এতদিনে তার বয়েস আঠারো পেরিয়ে গেছে।'

'তারমানে চার বছর আগে জুনিয়র স্কুলে পড়ত। এই রাবাটু লোকটা কে?'

'জিবুয়া থেকে এসেছে,' জানাল কিশোর। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে ওমর ভাইকে ফোন করেছিলাম। বলেছি, পারলে খানিকটা খোঁজ-খবর করে দিতে। জিবুয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য। ছ'টা নাগাদ ফোন করার কথা।'

শেষ পর্যন্ত আমেরিকান পুলিশে এয়ার ডিটেকটিভ হিসেবে যোগ দিয়েছে বেদুইন বৈমানিক ওমর শরীফ। তাতে সুবিধে হয়েছে তিন গোয়েন্দার। কোন তথ্য বা খোঁজ-খবরের প্রয়োজন পড়লেই ওমরভাইয়ের শরণাপন্ন হয়।

ওমরের অফিস রকি বীচে হলেও আপাতত সে রকি বীচে নেই। জরুরী একটা তদন্তের কাজে লস অ্যাঞ্জেলেস গেছে।

'জিবয়া সম্পর্কে রাবাটু যে সব তথ্য দিয়েছে, ওমরভাইয়ের সঙ্গে যদি মিলে

যায়, তাহলে?' মুসার প্রশ্ন।

'কালকেই খুঁজতে বেরোব মারিসাকে। রাবাটুর বিশ্বাস, ওখানে গেলে মেয়েটার খোঁজ পাওয়া যাবেই।'

মলিন হয়ে আসা ছবিটার দিকে তাকাল আবার মুসা। 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। রাবাটু নামের অচেনা একটা লোক স্রেফ বাতাস থেকে উদয় হয়ে এসে একটা ছবি ধরিয়ে দিয়ে বলল, আর...'

হাত নেড়ে মুসাকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'সব জানো না বলেই এ রকম মনে হচ্ছে। গোড়া থেকে সব শুনলে বুঝতে পারবে।'

'তাহলে শোনাচ্ছ না কেন?'

'দাঁড়াও, একটা কোক বের করি।' ফ্রিজ থেকে বোতল বের করে এনে টেবিলে রাখল কিশোর। মুসার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'তোমারটা ঢেলে নাও। হ্যাঁ, কি হয়েছে শোনো। ওঅর্কশপে বসে পুরানো টেলিভিশন মেরামত করছিলাম, দরজায় এসে দাঁড়াল লম্বা এক লোক। আমি কোথায় আছি, বোরিস দেখিয়ে দিয়েছে। লোকটা ছয় ফুটের ওপর লম্বা, হাতে একটা ব্রীফকেস, কয়লা-কালো চোখ। জানাল প্রায় ছয় মাস ধরে লস অ্যাঞ্জেলেস আর আশেপাশের এলাকায় মারিসাকে খুঁজে বেড়িয়েছে সে। পায়নি। দেশে ফেরার সময় হয়েছে এখন। কারও ওপর মেয়েটাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিতে পারলে নিশ্চিন্তে দেশে চলে যেতে পারত।'

'তারমানে সে জানে মেয়েটা লস অ্যাঞ্জেলেসে আছে,' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। তবে কোথায় আছে জানে না।'

'আমাদের কাছে আসার যুক্তিটা কি?'

'আমাদের সুনাম। তার দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটাকে আমরা খুঁজে বের করতে পারবই।'

'হুঁ! তা জিবুয়াটা কি জিনিস শোনাও না একটু।'

'মধ্য আফ্রিকার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য জিবুয়া। মারিসার বাবা ওম্বা ওমাঙ্গা ওদেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বছর দুই আগে এক সশস্ত্র বিপ্লব ঘটে যায় ওখানে। বিরোধী দলীয়রা টোটা নামের একদল সন্ত্রাসীর সহায়তায় প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে চড়াও হয়ে মারিসার বাবাকে খুন করে। ওমাঙ্গার দলের অনেকে তার সঙ্গে খুন হয়। বাকি সবাই পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে প্রাণ রক্ষা করে। মারিসাও পালিয়ে যায়।'

'টোটারা খুব ভয়ঙ্কর লোক মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। নামকা ওয়াস্তে সিভিলিয়ানদের পুতুল সরকার একটা আছে বটে, কিন্তু দেশ চলে সেনাবাহিনীর হুকুমে। আর সেনাবাহিনী বলতে বেশির ভাগই টোটা। তারা নির্যাতন চালিয়ে বশে রাখার চেষ্টা করে জনগণকে।'

'তারমানে স্বৈরাচারী কাণ্ড-কারখানা!' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল মুসা। 'মারিসার ভাগ্য ভাল যে সে পালাতে পেরেছে।'

'প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে, ওটুকুই ভাগ্য,' কিশোর বলল। 'বাবা খুন হলেন আততায়ীর হাতে, মা মারা গেছেন ছোটবেলায়, প্রাণের ভয়ে ঘর ছাড়তে হলো, তারপর থেকে দৌড়ের ওপর–এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়ানো। ও তো রীতিমত

দুর্ভাগা।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এই রাবাটু লোকটা কে? মারিসাকে তার কেন দরকার?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'ওমাঙ্গাভক্তরা আবার একজোট হয়েছে। বিপ্লবীদের কাছ থেকে ক্ষমতা ফেরত নিতে চায়। রাবাটু সেই ভক্তদের একজন। তাদের নেতা তাকে পাঠিয়েছে মারিসাকে খুঁজে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তাকে সামনে পেলে মানসিক বল পাবে ভক্তরা। জিবুয়ানিয়ানরা ওমাঙ্গাকে ভালবাসত, মারিসাকেও ভালবাসে। তাকে নেত্রী বানিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। রাবাটুর ধারণা মারিসাকে দেখলে সাহস বেড়ে যাবে ওদের।'

কোকের দেড় লিটারের বোতল থেকে কিশোর মাত্র এক গ্লাস নিয়েছে, বাকিটা মুসা একাই শেষ করল। শূন্য গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কিশোরের দিকে তাকাল। 'বুঝলাম। কিন্তু রাবাটুর কাহিনী কি বিশ্বাস করার মত? দুনিয়ায় এত লোক থাকতে আমাদের কাছেই বা এল কেন?—ওর যুক্তি কেন যেন মেনে নিতে মন চাইছে না আমার। কেমন অদ্ভুত না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মেনে নিতে আমারও ইচ্ছে করছে না। সে-জন্যেই কেসটা আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে আমার কাছে। দেখি, ওমরভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করি। কি সংবাদ দেয়।'

ঘড়ি দেখল মুসা, 'ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।'

ঠিক ছ'টায় ফোন করল ওমর। ধরল কিশোর।

'রাবাটু যা যা বলেছে, চেক করে দেখেছি,' ওমর জানাল। 'দুই বছর আগে সত্যিই জিবুয়ায় বিদ্রোহ হয়েছে, ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে বিপ্লবীরা। এখন পর্বতের মধ্যে গোপন জায়গায় জমায়েত হয়েছে ওমাঙ্গাভক্তরা। পাল্টা আঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের নেতার নাম নানুঙ্গু। ওমাঙ্গার সেনাবাহিনীর একজন নামকরা জেনারেল। মারিসাকে চাইবেই সে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, দেশবাসীর মনে আবেগ সঞ্চারের জন্যে। নিষ্ঠুর, নির্দয়, জনগণের চাহিদা কিংবা অধিকারের দিকে সামান্যতম নজর নেই বর্তমান সরকারের; পুরোপুরি স্বৈরাচার। আমেরিকান সরকারও মনে মনে ওমাঙ্গাভক্তদের পক্ষে।'

'হুঁ। আমাদের জন্যে আপনার কোন পরামর্শ আছে?' কিশোরের প্রশ্ন।

চুপ হয়ে গেল ওমর। ভাবল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'আগ্রহী যখন হয়েছ, কেসটা নেবে তা তো বুঝতেই পারছি। তবে রাবাটুর ব্যাপারে সাবধান। এ কাজের জন্যে সে তোমাদের কেন বাছাই করল বুঝতে পারছি না । আগে মারিসাকে খুঁজে বের করো। তাকে পেলেই রাবাটুর কথার সত্যতা বিচার করতে পারবে। বুঝে শুনে মারিসাকে তার হাতে তুলে দেবে। দু'বছর ধরে ডুব দিয়ে আছে মেয়েটা, শুধু শুধু নয়, নিশ্চয় কোন জরুরী কারণ আছে...'

হঠাৎ থেমে গেল ওমর। বৃষ্টির শব্দের মত শব্দ ভেসে আসতে শুরু করেছে টেলিফোনে।

'তোমাদের ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?' জানতে চাইল ওমর।

'কই, না তো!'

থেমে গেল বৃষ্টির শব্দ। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো না। মাউথপীসে

হাতচাপা দিয়ে শব্দটা থামানো হয়েছে।

'জলদি বাথরুমে গিয়ে দেখে এসো!' ওমর বলল।

রিসিভার রেখে সিঁড়ির দিকে দৌড় মারল কিশোর। কিসের শব্দ সে-ও বুঝে গেছে।

'আরে, কোথায় যাচ্ছ?' পেছনে চিৎকার করে উঠল মুসা।

'জলদি এসো!' না ফিরেই বলল কিশোর।

দোতলায় উঠে দেখল বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মেরিচাচী। গায়ে বাথরোব জড়ানো। ঝুঁটি করে চুল বেঁধেছেন।

'বাথরুমে কে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমি তো ভাবছিলাম তুই!' অবাক কণ্ঠে বললেন চাচী। 'গোসল করতে যাচ্ছিলাম। দরজা বন্ধ দেখে···তুই যখন বাইরে, তারমানে মিস কোয়াড্রুপল।'

'উঁহু, একটু আগে বাজারে গেছে ইজিআন্টি,' দরজার লক্ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কিশোর। ঘুরে তাকাল মুসার দিকে, 'এসো তো, ধাক্কা দাও। ভেঙে ফেলতে হবে।'

'কে ঢুকেছে!' চিৎকার করে উঠলেন মেরিচাচী।

জবাব দেবার সময় নেই। কাঁধ দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করেছে কিশোর আর মুসা। লক্ ভাঙতে সময় লাগল না। দড়াম করে ভেতরের দরজায় গিয়ে বাড়ি খেল পাল্লাটা।

কেউ নেই বাথরুমে। শাওয়ার থেকে পানি পড়ছে। জানালাটা হাঁ হয়ে খোলা। মেঝেতে পড়ে আছে একটা কর্ডলেস ফোন।

জানালার কাছে দৌড়ে গেল দুজনে। নিচে তাকিয়ে দেখল কাউকে দেখা যায় কিনা। ঠিক এই সময় বেজে উঠল বার্গলার অ্যালার্ম। পেছনের চত্বরটা আতিপাতি করে খুঁজল ওরা। কাউকে চোখে পড়ল না।

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। 'তারমানে পুরো বিকেল এখানে লুকিয়ে ছিল লোকটা।' শূন্য চত্বরে স্থির হয়ে আছে তার চোখ।

'কোন লোকটা?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন বিস্মিত মেরিচাচী।

'কেউ একজন চুরি করে ঢুকে পড়েছিল এখানে। সারাটা বিকেল লুকিয়ে বসে ছিল।'

'তারমানে আমি যখন আয়নার সামনে চুল বাঁধছি লোকটা তখন বাথরুমে!' আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলে আর দাঁড়াল না কিশোর। দৌড়ে নেমে এল আবার নিচতলায়। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। এখনও ধরে রেখেছে ওমর। 'হ্যাঁ, ওমরভাই, বাথরুমেই ছিল লোকটা। মনে হচ্ছে সারা বিকেল ধরেই বাড়িতে ছিল। ঘরে ঘরে ঘুরেছে। কিছু একটা খুঁজে বেড়িয়েছে হয়তো।'

'কিন্তু শাওয়ার খুলল কেন?' ওমরের প্রশ্ন।

'নিশ্চয় মেরিচাচীর সাড়া পেয়েছে। চাচী বাথরুমে ঢুকবে ভেবে শাওয়ার ছেড়ে বুঝিয়েছে বাথরুমে লোক আছে। আমাদের কথা শোনার সময় মাউথপীসে হাত রাখতে ভুলে গিয়েছিল। চাচী তো কল্পনাই করেনি বাইরের লোক।'

'সবচেয়ে বড় প্রশ্নটারই জবাব পাওয়া গেল না। মোটিভ। উদ্দেশ্য। কেন এ ভাবে ঝুঁকি নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল লোকটা?'

'আমি শিওর, রাবাটুর সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ রয়েছে,' কিশোর বলল।

'তা থাকতে পারে,' ওমর বলল। 'তবে অন্য কেউও হতে পারে, রাবাটুর মতই যে হন্যে হয়ে মারিসাকে খুঁজছে।'

তিন

পরদিন সকালে আবার এসে হাজির হলো রাবাটু। ওঅর্কশপে তখন মুসা একা। কিশোর গেছে বাড়ির ভেতরে।

মুসাকে দেখে থমকে গেল রাবাটু, পরক্ষণে হাসি ফোটাল মুখে, 'গুড ডে! আমি রাবাটু। তোমার বন্ধু নিশ্চয় আমার কথা বলেছে তোমাকে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে সে ভাল না মন্দ বোঝার চেষ্টা করল মুসা। লম্বা ছয় ফুট তিন ইঞ্চির কম হবে না। গায়ে উজ্জ্বল রঙের প্রিন্টের শার্ট। চোখ দুটো এত কালো, মনে হচ্ছে কোটরে বসানো দুটো কালো আগুনের টুকরো। অদ্ভুত! চোখ দেখে তার মনের কথা বোঝা অসম্ভব।

'ও, এসে পড়েছেন,' পেছন থেকে বলে উঠল কিশোর। 'বসুন। আমরা কেসটা নেব ঠিক করেছি।'

'গুড!' হাসিটা চওড়া হলো রাবাটুর, কালো চোখে খুশির ঝিলিক। 'তাহলে এখন কাজের কথায় আসা যাক।'

ছবিটা তো আছেই, প্রয়োজন হতে পারে ভেবে মারিসাকে চেনার জন্যে আরও কিছু তথ্য দিল ওদেরকে রাবাটু। কারণ, ছবিটা তোলা হয়েছে চার বছর আগে। ছিল কিশোরী। এখন যুবতী। এতদিনে মারিসার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে নিশ্চয়। এমন একটা তথ্য জানাল রাবাটু, মারিসাকে চিনতে কোনমতেই ভুল হবে না আর। ওর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা গোড়া থেকে কাটা।

'আমার ধারণা বিদ্রোহের রাতে আঙুলটা হারিয়েছে সে,' রাবাটু বলল। 'তার চেহারার কাউকে খুঁজে পেলে আগেই আঙুলটা আছে কিনা দেখে নিয়ো।'

'দেখব,' কিশোর বলল। 'কোন্‌খান থেকে খোঁজা শুরু করব তাকে?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীতে একটা বিউটি স্যালুন আছে,' একটা প্যাড বের করে তাতে বিউটিশিয়ানের নাম-ঠিকানা লিখে দিল রাবাটু। 'এই দোকানটা থেকে তদন্ত শুরু করবে তোমরা।'

'ফাইন,' কাগজটা নিয়ে সাবধানে মানিব্যাগে ভরে রাখল কিশোর। ওদের খরচের জন্যে একটা ক্রেডিট কার্ড দিল রাবাটু। সেটাও মানিব্যাগে ভরল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'এখনই। দুই ঘণ্টা পর বাস ছাড়বে তোমাদের।'

'দুই ঘণ্টা?'

হেসে উঠল রাবাটু। ঝকঝক করে উঠল চোখের তারা। 'হ্যাঁ। তোমাদের রওনা করিয়ে দিয়েই জিবুয়া রওনা হব আমি। প্লেনের টিকেট কাটা হয়ে গেছে। নাও, ওঠো। মালপত্র গুছিয়ে নাওগে। তোমাদের আরেক বন্ধু কোথায়? রবিন?'

'সকালে ফোন করেছিলাম তাকে,' জানাল কিশোর। 'বাড়িতে পাওয়া যায়নি। রবিনের আম্মা জানালেন, স্কুলের সুন্দরী প্রতিযোগিতা নিয়ে মেতেছে। খুব ব্যস্ত।'

'স্কুলে ফোন করলেই পারো।'

'করেছি। পাওয়া যায়নি। কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারে।'

'খবর দেয়ার ব্যবস্থা কি?'

'আর কি, ব্ল্যাক ফরেস্টে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে–যে শহরে ওরা থাকে। অন্য কোন উপায় তো দেখি না।'

'দুই ঘণ্টায় পাওয়া সম্ভব?' রাবাটু জানতে চাইল।

'না।'

'তাহলে আর হলো না। তাকে বাদ রেখেই যেতে হবে তোমাদের। ওকে বাদ দিয়ে খুঁজতে পারবে না?'

'পারব না কেন। রবিন পরে শুনলে যেতে পারল না বলে দুঃখ পাবে আরকি।'

'কিন্তু তাকে পাওয়া না গেলে আর কি করা।'

'না, কিছু করার নেই। ঠিক আছে, যাচ্ছি আমরা, তৈরি হয়ে নিই।' মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'বাড়ি যেতে হবে তোমার? নাকি এখান থেকে ফোন করে দিলেই চলবে?'

মাথা কাত করল মুসা, 'চলবে।'

ঘণ্টাখানেক পর বাস টার্মিনালে এসে দেখল দুজনে, রাবাটু ওদের অপেক্ষা করছে। বাসের দুটো টিকেট হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'মারিসাকে পেলে তোমাদের হোম ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে জিবুয়ায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে,' রাবাটু বলল। 'আর কোন প্রশ্ন আছে?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না।'

রাবাটুর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। স্টেশনে আসার পর থেকেই দেখছে লোকটাকে। ওয়েইটিং রূমে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। গায়ে রেইনকোট। মাঝে মাঝে চোখ তুলে আড়চোখে তাকাচ্ছে এদিকে। কপালের এক পাশে একটা গভীর ক্ষত। ভাবভঙ্গি সন্দেহ জাগানোর মত।

'তাহলে আমি এখন যাই,' হাত বাড়িয়ে দিল রাবাটু। হাসিমুখে বলল, 'মনে রেখো, আমাদের দেশটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমাদের ওপর। গুড-বাই, মাই ইয়াং ফ্রেন্ডস।'

সামান্য মাথা নুইয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করে ঘুরে দাঁড়াল রাবাটু। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। মুহূর্তে হারিয়ে গেল জনতার ভিড়ে।

বাস এল।

চড়ে বসল দুই গোয়েন্দা।

গম্ভীর মুখে দেখল কিশোর, রেইনকোট পরা লোকটাও একই বাসে চড়েছে।

'সরাসরি তাকাবে না,' মুসার কানে কানে বলল কিশোর। 'আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে। দুই সীট পেছনে ডান সারির প্রথম সীটটা।'

পকেট থেকে ক্যান্ডি বের করল মুসা। ইচ্ছে করে হাত থেকে ফেলে দিল। তুলে নেয়ার ছুতোয় লোকটাকে দেখে নিল।

'কথা বলবে নাকি?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লাভ হবে না। কিছু একটা বানিয়ে বলে দেবে। লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে তখন। ও সতর্ক হয়ে যাবে। বুঝে ফেলবে আমরা তাকে সন্দেহ করেছি। তারচেয়ে অপেক্ষা করে দেখা যেতে পারে কি করে।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'হুঁ। লোকটা কে, কিছু অনুমান করতে পারো?'

'হবে হয়তো বিপ্লবীদের গুপ্তচর,' কিশোর বলল।

দুই ঠোঁট বিচিত্র ভঙ্গিতে সামনে ঠেলে দিয়ে মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তা-ই হবে। মারিসার জিবুয়ায় যাওয়া ঠেকাতে সব রকম চেষ্টা চালাবে ওরা।'

কিশোরের ধারণা, তাকে খুন করতেও দ্বিধা করবে না বিপ্লবীরা। রাবাটু যে মারিসাকে খুঁজতে আসছে, জেনে গিয়েছিল হয়তো ওরা। সঙ্গে সঙ্গে রাবাটুর পেছনে লোক পাঠিয়েছে। চোখে চোখে রাখার জন্যে।

'এখন রাবাটু ফিরে যাচ্ছে দেখে আমাদের পেছনে লেগেছে,' মুসা বলল। 'জেনে গেছে, মারিসাকে খুঁজতে যাচ্ছি আমরা।'

'ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমি ভাবছি, কাল আমাদের বাড়িতে চুরি করে ঢুকেছিল যে লোকটা, সে এই লোক নয়তো?'

'ও-ই হবে,' মুসাও কিশোরের সঙ্গে একমত। 'নইলে জানল কি করে, আমরা মারিসাকে খুঁজতে যাচ্ছি?'

চার

পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা।

মনকে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, এতদিন চেষ্টা করেও যে কাজে সফল হতে পারেনি রাবাটু, সেটা দু'দিনেই কি ভাবে সম্ভব করবে ওরা? কিন্তু তার পরেও হতাশা কাটাতে পারল না। পারেনি বলেই তো ভরসা করে ওদের কাছে এসেছিল।

খবর পেয়ে বিকেল বেলা স্যালভিজ ইয়ার্ডে এল রবিন। মারিসার ছবিটা দেখেই চিৎকার করে উঠল সে, 'আরে একে তো দেখেছি! ব্ল্যাক ফরেস্ট স্কুলের বিউটি কুইন প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় ফাইনাল।'

শুনে হাঁ হয়ে গেল কিশোর আর মুসা। ব্যাপারটা সাংঘাতিক কাকতালীয় মনে হলো কিশোরের কাছে। রাবাটু ওদের পাঠাল লস অ্যাঞ্জেলেসে খুঁজতে, আর মেয়েটা একেবারে ওদের নাকের ডগাতেই বসে আছে।

রবিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে যেতে তৈরি হলো সে আর মুসা।

চমকের পর চমক।

মারিসা ওমাঙ্গাকে এক পলক দেখেই নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর, একেই খুঁজে বেড়িয়েছে ওরা। আরও শিওর হওয়ার জন্যে হাতের দিকে তাকাল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা নেই।

'খাইছে!' ফিসফিস করে বলল উত্তেজিত মুসা। 'ওই দেখো, কে!'

দর্শকদের ভিড়ে দেখা যাচ্ছে রাবাটুকে। কয়লা-কালো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে মারিসার দিকে।

'ও এখানে কি করছে?' বিস্ময় চাপা দিতে না পেরে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ওর না আফ্রিকায় থাকার কথা?'

'আমিও তো তা-ই বলি!' জবাব দিল বিমূঢ় মুসা।

দর্শকের সারির একেবারে সামনের সারিতে বসেছে রাবাটু। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মারিসার দিকে। অন্য কোন দিকে চোখ নেই তার। মুসা বা কিশোরকে দেখতে পেল না।

প্রতিযোগিতা শুরু হলো। নানা ভাবে পরীক্ষা দেয়ার পর জিতে গেল মারিসা। শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ঘোষিত হওয়ার পর করতালিতে ফেটে পড়ল অডিটরিয়াম। তার মাথায় পরিয়ে দেয়া হলো মুকুট। কাঁধ থেকে পেট বেয়ে চলে যাওয়া চওড়া ফিতেতে স্কুলের নাম।

আরও কিছু নিয়ম-কানুন বাদে স্টেজ থেকে একে একে নেমে চলে গেল সুন্দরীরা।

রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবে?'

'তা তো পারবই। গত কয়েক দিনে বেশ খাতির হয়ে গেছে।'

ড্রেসিং রূমে দেখা পাওয়া গেল মারিসার। তাকে ডেকে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে এল রবিন।

কোন রকম ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমার নাম মারিসা ওমাঙ্গা, তাই না?'

সতর্ক হয়ে গেল মারিসা। 'কে বলল? আমার নাম সাদিয়া জুহুন।'

'আমরা বন্ধু, আমাদের সঙ্গে ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজন নেই,' অভয় দিল কিশোর। 'তবে এ শহরে সবাই তোমার বন্ধু নয়। আমার ধারণা, শত্রুও এসে হাজির হয়েছে।'

শঙ্কিত হয়ে উঠল মারিসা। 'জিবুয়া থেকে?'

'হ্যাঁ। তবে আমরা যতক্ষণ আছি, কোন রকম ক্ষতি হতে দেব না তোমার।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'রবিন, ড্রেসিং রূমে নিয়ে যাও ওকে। ঘরে ছিটকানি আটকে দিয়ে বসে থাকবে। মুসা, তুমি দরজার বাইরে পাহারা দেবে। রেইনকোট পরা কপাল কাটা লোকটাকে দেখলে কোনমতেই ঢুকতে দেবে না। আমি আসছি দুই মিনিটের মধ্যে।'

অডিটরিয়ামে ফিরে এল কিশোর। রাবাটুকে দেখতে পেল অস্থির হয়ে উঠেছে। তার সামনে এসে দাঁড়াল।

কিশোরকে দেখে ভীষণ চমকে গেল রাবাটু। 'তুমি এখানে?'

'কি করব। লস অ্যাঞ্জেলেসে তো খুঁজে খুঁজে হয়রান। পেলাম না ওকে। ফিরে

এসে দেখি বাড়ির কাছেই বসে আছে। কিন্তু আপনি এখানে কেন? আপনার তো আফ্রিকায় চলে যাওয়ার কথা।'

'হ্যাঁ,' হাসল রাবাটু। 'চলেই যাচ্ছিলাম। এয়ারপোর্টে গিয়ে পত্রিকার ভেতরের পাতায় ছোট্ট একটা খবর দেখতে পেলাম। ব্ল্যাক ফরেস্ট হাই স্কুলে সুন্দরী প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রতিযোগীদের ছবি দেখেই চিনে ফেললাম মারিসাকে। যাওয়া বাতিল করে দিয়ে সোজা চলে এলাম এখানে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে লক্ষ করছে কিশোর। মিথ্যে বলছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। 'মারিসাকে ড্রেসিং রূমে রেখে এসেছি। ওর সন্দেহ, শত্রু ওর পিছু লেগেছে। জিবুয়া থেকে আসা কেউ।'

'আমার তরফ থেকে ভয়ের কিছু নেই,' জবাব দিল রাবাটু। ওর কালো চোখের তারা মনের কথা ফাঁস করল না। 'চলো, ওর সঙ্গে দেখা করব।'

'কিন্তু তার আগে আমাদের শিওর হতে হবে, আপনি আসলেই ওর বন্ধু কিনা,' দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিল কিশোর।

মুহূর্তের জন্যে রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল রাবাটুর চোখে। পরক্ষণে সামলে নিল নিজেকে। 'বেশ, যা ভাল বোঝো, করো।'

'আপনাকেও কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে।'

'করে ফেলো।'

লস অ্যাঞ্জেলেসে ওদের পিছু নিয়েছিল যে লোকটা, তার কথা জানাল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রাবাটু। 'হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি তোমাদের এত সাবধান হবার কারণ। তোমাদের সন্দেহ ঠিকই, ও বিপ্লবীদের দলের লোক। কিলার। মারিসাকে খুন করতে পাঠানো হয়েছে। নিশ্চয়ই আমার পিছু নিয়ে দেশ থেকে এসেছে ও। আমি জানতাম না। কোনমতেই মারিসাকে তার প্রিয় জনগণের কাছে নিতে দিতে চায় না। এটা কি বুঝেছ?'

'আমাদের বোঝায় কিছু হবে না। মারিসা যেটা বুঝবে সেটাই ঠিক,' জবাব দিল কিশোর। 'আপনি এখানেই থাকুন। আমি আসছি।'

ড্রেসিং রূমে ফিরে এল কিশোর। রাবাটুর কথা শুনে বলল মারিসা, 'চিনি ওকে। বাবার সেনাবাহিনীতে কর্পোরাল ছিল।'

'ও তাহলে টোটা নয়?'

'না!' মাথা নাড়ল মারিসা। 'তবে বিরোধী দলীয় হতে বাধা নেই। বাবার সেনাবাহিনীতেও বিশ্বাসঘাতক আছে। ওদের সহায়তা ছাড়া বিপ্লবীরা বাবাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারত না। ওরা আমারও মৃত্যু চায়। কারণ বাবার মৃত্যুর সময় ওখানে উপস্থিত ছিলাম আমি। খুনীকে দেখেছি। আমার বেঁচে থাকা ওদের জন্যে মোটেও নিরাপদ নয়।'

'চেনো তাদের?' কিশোরের প্রশ্ন।

'না। তবে দেশে গেলে খুঁজে বের করতে পারব। টোটাদের ভয়ে যতটা না, তারচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকদের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছি। টোটাদের চিনি, তাদের হাত থেকে হয়তো বাঁচতে পারতাম, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের চিনি না। আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যে-কোন সময় ওরা আমাকে খুন করতে পারত। শুধু কি

দেশে? আমেরিকায় এসেও লুকিয়ে থাকতে হয়েছে ওদের ভয়ে।'

কৌতূহলী চোখে মারিসার দিকে তাকাল কিশোর। 'লুকিয়েই যদি থাকো, তাহলে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে কেন? জানতে না, খবর ছাপা হবে, শত্রুর চোখে পড়ে যেতে পারো?'

বিষণ্ন হয়ে গেল মারিসা, 'লুকিয়ে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে গেছি আমি। আর লুকাতে চাই না। যা হয় হোকগে।'

'জিবুয়ায় ফিরে যেতে চাও?'

'চাই। যদি আমাকে সাহায্য করার মত কাউকে পেয়ে যাই। দেশের জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়াব আমি। গদি থেকে সন্ত্রাসীদের উৎখাতের চেষ্টা করব।'

আবার মুসা আর রবিনকে মারিসার পাহারায় রেখে হলঘরে ফিরে এল কিশোর। উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছে রাবাটু। কিশোরকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

মারিসা যা যা বলেছে, সব রাবাটুকে জানাল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে গেল রাবাটুর। 'খুনীকে যে দেখেছে সে, এটা জানতাম না। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তবে জিবুয়ায় ফিরে যেতে পারে এখন। ওই খুনীর ভয় আর নেই। প্রেসিডেন্ট ওমাঙ্গার বিশ্বস্ত লোক ছিল সে। নাম হাম্বরু। কিছুদিন আগে ওকে মেরে ফেলেছে টোটারা। মারিসা কি আমার সঙ্গে দেখা করবে?'

'আপনি বসুন। আমি জিজ্ঞেস করে আসি।'

রাবাটুর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলো মারিসা।

'তারমানে তুমি জিবুয়ায় যাবে?' রবিন বলল।

'তা তো যেতেই হবে। ওটা আমার দেশ।'

'কিন্তু তোমার স্কলারশিপ? যেটার জন্যে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখালে?'

'সেটা আমি দান করে যাব দ্বিতীয় সুন্দরীকে। ওরও আমার মতই পড়ালেখার জন্যে টাকা দরকার। এ মুহূর্তে পড়ালেখার চেয়ে দেশবাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো আমার বড় কর্তব্য।'

রাবাটুকে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল কিশোর।

মারিসাকে আফ্রিকান কায়দায় সালাম জানাল রাবাটু। নানা ভাবে তাকে অভয় দেয়ার পর বলল, 'আজ রাতেই আমরা জিবুয়া রওনা হব। দেরি করা ঠিক হবে না আর। বহুদিন হলো দেশ থেকে বেরিয়েছি। আমার দেরি দেখে নানুঙ্গু অস্থির হয়ে উঠেছে।'

কি যেন ভাবল মারিসা। তারপর কিশোরের দিকে তাকাল। 'কিশোর, গোয়েন্দা হিসেবে তোমাদের খ্যাতির কথা আমি জানি। তোমরা যদি আমার সঙ্গে যেতে, অনেক সাহস পেতাম। যদিও দুরাশা, তবু অনুরোধ করছি, যাবে আমার সঙ্গে?'

এ ধরনের অনুরোধ আসতে পারে, যেন সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল কিশোর। হাসি ফুটল মুখে। 'যাব। কিন্তু মুসা আর রবিনের কথা আমি বলতে পারছি না। ওদের জিজ্ঞেস করে দেখো।'

জিজ্ঞেস করতে হলো না। মুসা জবাব দিল, 'আফ্রিকা আমারও দেশ, যদিও জিবুয়া আমার জন্মস্থান নয়। বৃহৎ অর্থে ওই মহাদেশের মানুষ আমারও আপনজন। মারিসা যদি তার দেশের জনগণকে সাহায্য করতে চায়, আমিই বা সুযোগ ছাড়ি

কেন?'

'কিন্তু আমার তো দেশ নয়,' হাসিমুখে বলল রবিন।

'তাহলে আর যাবে কেন?'

'যাব না-ই বা কেন?' হাসিটা বাড়ল রবিনের। 'তোমরা দু'জন যাবে নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য করতে। সেই দিক থেকে আরও বৃহৎ অর্থে পৃথিবীর যে কোন দেশের নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য করতে যাওয়ার অধিকার আমার আছে। কি বলো, কিশোর?'

'একদম ঠিক,' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'ঠিক তোমার মত এ কথা ভেবেই জিবুয়ায় যেতে আগ্রহী হয়েছি আমি।'

পাঁচ

ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল কিশোর।

গন্তব্যে যখন পৌঁছাল ওরা, দিগন্তের অনেক নিচে নেমে এসেছে সূর্য। পার্বত্য অঞ্চলের ছোট্ট একটা শহরে ঢুকেছে ওরা। জিবুয়ার সীমান্ত ওখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল সামনে।

'ওইটাই হবে বোধহয়,' হাত তুলে কতগুলো কাদার কুঁড়ের মাঝখানে একটা কাঠের বাড়ি দেখাল মারিসা।

শহরবাসীরাও মরুভূমির বাসিন্দাদের চেয়ে ভাল অবস্থায় নেই। তবে যে লোকটা ঘরের দরজা খুলে দিল, তাকে দেখে বোঝা গেল, এ লোকের খাবারের অভাব হয় না। বরং অতিরিক্ত খেয়ে গোল পিপা হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, আমি জোহ্যান্স,' জবাব দিল লোকটা। অকারণে জোরে জোরে হেসে উঠল। হাসির দমকে ভুঁড়ি দুলছে। 'রাবাটুর মেসেজ পেয়েছি। তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি। এসো, ঘরে এসো। একেবারে উপযুক্ত সময়ে এসেছ। খেতে যাচ্ছিলাম আমি।'

খিদেয় পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে মুসার। কিন্তু জীবনে এই প্রথম খাবারের কথা শুনে হাসি ফুটল না তার মুখে। মারিসার আচরণও শীতল। দেখেই লোকটাকে অপছন্দ করল সে। আশেপাশের সবাই না খেয়ে মরছে, আর এ লোক খেয়ে খেয়ে চর্বি জমাচ্ছে। কিন্তু কিছু বলল না। একে ছাড়া চলবে না ওদের। জিবুয়ায় যাওয়ার জন্যে এর সাহায্যের দরকার আছে। অসহায় ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াতে লাগল তাই।

'রাবাটু না আসা পর্যন্ত কি এখানেই থাকব আমরা?' ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

শ্রাগ করল জোহ্যান্স। 'ইচ্ছে করলে অপেক্ষা করতে পারো। তবে তার কোন প্রয়োজন নেই। আগেও তোমরা রওনা হয়ে যেতে পারো। যাবেই যখন, দেরি করার দরকার কি?'

পরামর্শটা পছন্দ হলো না কিশোরের। 'তার সঙ্গে এলাম, তাকে রেখেই চলে যাব?'

'সে কি আর দুধের শিশু যে একা যেতে পারবে না?' বিশাল ভুঁড়িতে ভূমিকম্প তুলে হাসতে লাগল আবার জোহ্যান্স। এতে হাসির কি দেখল সে-ই জানে। 'তোমাদের যাওয়া নিয়েও অত চিন্তা করতে হবে না। নিরাপদে যাতে যেতে পারো, সে-ব্যবস্থা আমি করব।'

ডাইনিং রুমের টেবিলে বসল সবাই। খাবারের অপেক্ষা করছে। দু'জন চাকর টেবিল সাজাতে ব্যস্ত। দু'জনেই স্থানীয় লোক। প্রথম এল ফ্রুট স্যালাড।

'মনে হচ্ছে খুব আরামেই আছেন এখানে.' মন্তব্য না করে পারল না কিশোর।

শয়তানি হাসিতে ভরে গেল জোহ্যান্সের মুখ। 'নানুঙ্গু আর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ করি। ওরা আমাকে ভাল টাকা দেয়।'

'আপনি অস্ত্র পান কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'বেশির ভাগ পাই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে,' জানাতে কোন দ্বিধা নেই জোহ্যান্সের। 'ওরা কাদের কাছ থেকে পায়, জানো নিশ্চয়। দুনিয়ার তাবৎ বড় বড় দেশ থেকে। জেট প্লেন, ট্যাংক, মেশিনগান থেকে শুরু করে সব ধরনের অস্ত্র সাপ্লাই দেয় সে-সব দেশ। ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে অস্ত্র কিনি আমি। আমার কাছ থেকে যারা কেনে–আমি কোথায় পাই, কোনখান থেকে আনি–এ নিয়ে তারা কোন প্রশ্ন করে না, ওরা তাদের জিনিস পেলেই খুশি। আমিও জানতে বা বুঝতে চাই না, কারা আমার কাছ থেকে অস্ত্র নিচ্ছে, তারা ভাল না মন্দ।'

চেয়ারে হেলান দিল রবিন। 'তারমানে বিপ্লবীদের তো বটেই, সন্ত্রাসী টোটাদের কাছেও অস্ত্র বিক্রি করেন আপনি?'

'তাদেরকে দেয়ার প্রয়োজনই পড়ে না,' হাসল জোহ্যান্স। 'সেনাবাহিনীর কাছে চাইলেই পাওয়া যায়। আমার মত চোরা ব্যবসায়ীর কাছে আসতে যাবে কেন?'

'চাকরদের বেতন-টেতন দেন তো ঠিকমত?' খোঁচা দিয়ে বলল মারিসা।

'আমি যা খেতে না পারি, ওদের দিয়ে দিই। এখানে বেতন চায় না কেউ, খাবার চায়···ওই যে, আসল জিনিস এসে গেছে!' লোভে টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করে উঠল জোহ্যান্স। 'তাজা বানরের মাংস!'

বড় একটা ডিশ এনে টেবিলে রাখল একজন চাকর। সস দেয়া ধূমায়িত মাংসটাকে সাধারণ কাবাবের মতই লাগছে, কিন্তু কিসের মাংস শুনে মুসার পর্যন্ত খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেল।

'আ-আ-আমার···আমার আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না এখন।'

'কি যে বলো,' চাপাচাপি শুরু করল জোহ্যান্স, 'আর কবে খাবে? খাওয়ার তো এটাই বয়েস তোমাদের।' মস্ত এক টুকরো মাংস তার প্লেটে তুলে দিল সে।

লোকটা আহত হতে পারে ভেবে সামান্য একটু চেখে দেখল মুসা। কিন্তু ছুঁয়েও দেখল না কিশোর আর রবিন। মারিসাও যখন খেতে অস্বীকার করল, জোহ্যান্স বলল, 'তুমিও খাবে না? তুমি তো আর ভিনদেশী নও, এ দেশেরই মেয়ে। এখানকার প্রিয় খাবারে অনীহা?'

জবাব দিল না মারিসা। স্মৃতিতে নাড়া লেগেছে। দু'চোখ পানিতে ভরে উঠল তার।

'সরি,' তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল সে। 'হঠাৎ কি যে হয়ে গেল!'

সহানুভূতির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কিশোর।

মারিসা জানাল, কেন বানরের মাংস খেতে আপত্তি তার। যে রাতে সন্ত্রাসীরা তার বাবাকে হত্যা করেছিল সে-রাতে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল একটা বানর। জানাল সে-কথা।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'বানরে প্রাণ বাঁচিয়েছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল মারিসা। 'হ্যাঁ। একটা শিম্পাঞ্জি। বাবার পোষা বানর। ওর নাম ছিল কুকু।'

মারিসার দুঃখ বুঝতে পারল কিশোর আর রবিন। কোন প্রশ্ন করল না মারিসাকে। কিন্তু কথার নেশায় পেয়ে বসল যেন মারিসাকে। একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে যেন। বাঁধ ভাঙা বন্যার মত শব্দ বেরিয়ে আসতে শুরু করল তার মুখ থেকে। পুরো দুটো বছর নিজের ভেতর আটকে রেখেছিল সব। সেই ভয়ঙ্কর রাতের বর্ণনা দিয়ে চলল সে।

'সেই সন্ধ্যায় বাবার ঘরে ছিল কুকু,' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল মারিসা। 'আগেই বলেছি খুনীকে দেখেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি। তার কারণ মুখোশ পরা ছিল। বাবাকে খুন করার পর আমাকে দেখে আমাকেও খুন করতে তেড়ে এল। কুকু না থাকলে ঠিক মেরে ফেলত আমাকে।'

কি করে খুনীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কুকু, লোকটার ছুরি ধরা হাত কামড়ে দিয়ে মারিসাকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছিল, সব খুলে বলল। এ সময় দুর্ঘটনাক্রমে মারিসার হাতে কামড় লেগে গিয়েছিল কুকুর। মারিসার কড়ে আঙুলটা তখনই কেটে পড়েছে।

'আমার ওই আঙুলে একটা আঙটি ছিল,' মারিসা বলল। 'সোনার তৈরি। পুরো রিঙ জুড়ে খোদাই করা ছোট ছোট বানর আর জলহস্তীর ছবি ছিল তাতে। আমার এগারোতম জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল বাবা।'

মারিসা জানাল, পুরো বাড়িটাকে তখন তছনছ করছে বিদ্রোহীরা। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায় মারিসা। তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত জঙ্গলে জঙ্গলে ছুটে কয়েক হপ্তা পর অবশেষে গিয়ে পৌঁছে নিরাপদ স্থানে। কে খুন করে তার বাবাকে, কোন ধারণাই ছিল না।

'কুকুর কি হলো?' জানতে চাইল কিশোর।

'জানি না,' ঘোর কাটেনি যেন মারিসার। 'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখনও সব। নেমে আসছে ছুরি…অন্ধকারেও চকচক করছে ওটার রত্নখচিত বাঁট…আমাকে বাঁচাতে ঠিক সময়ে খুনীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকু।…কুকু এখন কোথায় যদি জানতে পারতাম! ও ছিল আমার খুব বড় বন্ধু। আমার কাছে যখন এসেছিল ও, আমি তখন খুব ছোট।'

'ছুরির বাঁটে রত্ন থাকার ব্যাপারে নিশ্চয় ভুল হয়েছে তোমার,' জোহ্যান্স বলল। 'কারণ হাম্বরুর ছুরিটা পাওয়া গেছে তোমার বাবার বেডরুমে, যেটা দিয়ে খুন করা

হয়েছে তাঁকে। অতি সাধারণ জিনিস। রত্নটত্ন কিছু ছিল না তাতে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মারিসা। 'কি জানি! আমার যদ্দূর মনে পড়ে, বাঁটটায় রত্নখচিত দেখেছি। তবে অন্ধকারে ভুল হতেই পারে।'

'তাই হবে,' জোহ্যান্স বলল। 'হাম্বরু তোমার বাবাকে খুন করেছে শুনে নিশ্চয় চমকে গেছ?'

'হাম্বরু কি স্বীকার করেছে সে খুনী?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানি না। বনের মধ্যে মৃত পাওয়া গেছে তাকে। মজাটা হলো, সে বিপ্লবীদের লোক নয়, টোটার দলেরও না, প্রেসিডেন্ট ওমাঙ্গার প্রিয়পাত্র। নিশ্চয় কোন কারণে আক্রোশ জন্মেছিল ওমাঙ্গার ওপর, সুযোগ পেয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। বিপ্লবীরা কেউ খুন করেনি ওমাঙ্গাকে, টোটারাও না। কিন্তু খুন হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। কে করল?'

খাওয়া শেষ হলে ওদেরকে বাইরে নিয়ে এল জোহ্যান্স। বাড়ির পেছনের একটা ছাউনিতে নিয়ে গেল।

'এই যে এখানেই আছে সেই জিনিস,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে, 'যেটা তোমাদেরকে জিবুয়ায় নিয়ে যাবে।' দরজাটা খুলে দিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে হাসল সে। 'কি, পছন্দ হলো?'

ছাউনির অস্পষ্ট আলোয় যা দেখল, চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'এটা...এটা...এটা...!'

ছয়

জিনিসটা দেখতে অনেকটা ট্যাংক আর নৌকার মিশ্ররূপ, গাড়ির মত চাকাও আছে। হালকা ইস্পাতের অ্যালয়ে ঢাকা দেহ, পেছন দিকে গোলাগুলি ঠেকানোর উপযোগী ভারী ডিফ্লেক্টর। সেখানে একটা ছোট কামান বসানো। সেন্টার ককপিটে বসানো একটা মেশিনগান। সামনে গণ্ডারের শিঙের মত বেরিয়ে আছে একটা ব্যাটারিং র‍্যাম।

'এটার ডিজাইন করেছি আমি নিজে,' গর্বের হাসি হেসে জানাল জোহ্যান্স। আফ্রিকান ভাষায় নাম যেটা রেখেছে তার বাংলা হলো 'গণ্ডার'।

'বাহ্, দারুণ নাম,' অদ্ভুত যুদ্ধযানটার মাথার কাছে বেরিয়ে থাকা শিংটার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, 'খুব মানিয়েছে। আপনি চাইছেন এটা চালিয়ে জিবুয়ায় যাব আমরা?'

হাসল জোহ্যান্স। 'কি ভাবে চালাতে হয় কাল সকালে শিখিয়ে দেব তোমাদের। এটাতে থাকলে যে কোন ধরনের আক্রমণ থেকে তোমরা নিরাপদ।'

'গণ্ডার'-এ কি কি সরঞ্জাম আছে দেখাতে লাগল সে। একটা রাডার আছে, যেটা দিয়ে মাইলখানেকের মধ্যে যে কোন বড় ধাতব জিনিসের সন্ধান পেয়ে যাবে

ওরা। একটা ধোঁয়া বানানোর মেশিন আছে, যেটার সাহায্যে প্রচুর কালো ধোঁয়া তৈরি করে শত্রুর চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব, জোহ্যান্স ওটার নাম দিয়েছে 'স্মোক-স্ক্রীন'। দুটো রোল বার লাগানো রয়েছে, বিশেষ মুহূর্তে চালানোর জন্যে।

'আর এই যে দেখো,' পেছনে নিচের দিকে দেখাল জোহ্যান্স, 'এটা প্রপেলার। পানিতে চালানোর জন্যে। ইচ্ছে করলে স্পীড-বোটের মতও ব্যবহার করতে পারবে গণ্ডারকে।'

'আপনি বলছেন, এটা ভাসে?' ইস্পাতে মোড়া উদ্ভট যানটার দিকে সন্দিহান চোখে তাকিয়ে আছে কিশোর।

'হ্যাঁ, ভাসে,' গর্বের হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জোহ্যান্সের। 'নৌকার মত ভেসে থাকে।'

'আর কি কি ক্ষমতা আছে?' প্রশ্ন করল বিমূঢ় মুসা। 'জেমস বন্ডের ছবি দেখছি না তো?'

'বন্ড এ জিনিস পেলে বর্তে যেত।' চিবুকে টোকা দিয়ে মগজে জরিপ চালানোর ভঙ্গি করল জোহ্যান্স, 'দাঁড়াও, ভেবে দেখি। কামান, মেশিনগান, ডিফ্লেক্টর, স্মোক-স্ক্রীন, রাডার, প্রপেলার–আর কি? ও, হ্যাঁ, রিমোট কন্ট্রোলটার কথা বলতে ভুলে গেছি।'

ককপিট থেকে ছোট একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র বের করে আনল হাসিখুশি লোকটা। দেখতে টেলিভিশনের রিমোটের মতই। কয়েকটা বোতাম আছে। আর একটা খুদে ডায়াল।

'এটার সাহায্যে দূর থেকেও চালাতে পারবে গণ্ডারকে,' যন্ত্রটা কিশোরকে দিতে দিতে বলল জোহ্যান্স। 'খেলনা গাড়ি কিংবা এরোপ্লেন চালানোর মত করে।'

'দারুণ তো,' ছোট যন্ত্রটা দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'কিন্তু এটা ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে কখনও?'

হাহ্ হাহ্ করে দরাজ হাসল জোহ্যান্স। লাফাতে লাগল তার বিশাল ভুঁড়ি। 'তা জানি না। বানাতে ইচ্ছে করল, বানিয়েছি। কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় সকাল বেলা দেখিয়ে দেব। কিন্তু এখন খানিকটা ঘুমিয়ে নাও তো গিয়ে।'

জোহ্যান্সের পিছু পিছু আবার ঘরে ফিরে এল ওরা। থাকার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে 'গুড-নাইট' জানিয়ে চলে গেল। মারিসার চোখে ঘুম নেই। স্মৃতিগুলো ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলেছে তাকে। তার জন্যে তিন গোয়েন্দাকেও জেগে থাকতে হলো অনেক রাত পর্যন্ত।

অবশেষে তন্দ্রা এল মারিসার চোখে।

কি ভাবে ট্যাংকটা চালাতে হয় পরদিন সকালে শিখিয়ে দিল জোহ্যান্স। ওটার নানা রকম যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। দুপুর নাগাদ চালানো শিখে গেল ওরা, বিশেষ করে মুসা–দক্ষ হয়ে গেল সে, কামান আর মেশিনগান চালানোও শিখে গেল।

'এগুলো কি সত্যি সত্যি ব্যবহার করতে হবে আমাদের?' এত সব ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র দেখে অস্বস্তি বোধ করছে রবিন।

'যদি তোমাদের ভাগ্য ভাল হয়,' জবাব দিল জোহ্যান্স। 'তবে সে-সম্ভাবনা

কম। প্রচুর ট্যাংক-ফ্যাংক আর কামান-বন্দুক আছে টোটাদের কাছে। যদি তাড়া করে বসে, ব্যবহার না করে বাঁচতে পারবে না।'

এ কথা শুনে সবাই অস্বস্তিতে পড়ে গেল। তাদের মিশন সফল হবে কিনা ভাবতে লাগল। তবে মারিসা তার সিদ্ধান্তে অটল। নানুঙ্গুর নেতৃত্বে পর্বতে লুকানো ওমাঙ্গাভক্তদের কাছে পৌঁছতেই হবে, যে কোন মূল্যে।

পায়ে হেঁটে গেলে অসুবিধে কি?' জোহ্যান্সকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ট্যাংক নিয়ে গেলে চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। তারচেয়ে হেঁটে যাই। রাতে হাঁটব, দিনে লুকিয়ে থাকব জঙ্গলে...'

'না!' দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিল জোহ্যান্স। 'জঙ্গলে চোর-ডাকাতের আড্ডা। টোটাদের হাত থেকে যদি কপালগুণে বেঁচেও যাও, ওদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। মারিসা এখন আমাদের কাছে মহামূল্যবান। তার কোন ক্ষতি হলে নানুঙ্গু আমাকে খুন করে ফেলবে। ট্যাংক নিয়েই যেতে হবে তোমাদের, এটাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

দুপুরে খাওয়ার পর নকশা এঁকে দেখাতে বসল জোহ্যান্স, কোন পথে জিবুয়া যেতে হবে। পার্বত্য এলাকার জঙ্গলে ঢুকে এগিয়ে যেতে হবে ওদের, যতক্ষণ না গভীর একটা নদীর তীরে পৌঁছায়। সেখানে উভচর যানটাকে নৌকায় পরিণত করে নদী পেরোতে হবে। বিপ্লবী বা টোটারা ওদের পিছু নিলে এ ভাবে ধোঁকা দেয়া সম্ভব। নদী পেরিয়ে কয়েক মাইল গেলেই পাওয়া যাবে নানুঙ্গুর ক্যাম্প।

'আরও একটা রাত কাটাও এখানে,' জোহ্যান্স বলল। 'কাল খুব ভোরে রওনা দেবে। রাতে গেলে জঙ্গলে পথ হারানোর ভয় আছে। ভোরবেলাটাই উপযুক্ত সময়। তাতে আরও একটা সুবিধে পাবে, সারারাত জেগে থেকে ওই সময় ঘুমিয়ে পড়ে সীমান্ত প্রহরীরা। হাঁটতে হাঁটতেও ঘুমায়।' সাংঘাতিক রসিকতা করে ফেলেছে ভেবে হা-হা করে হেসে উঠল জোহ্যান্স।

প্রথম রাতে যা-ও বা ঘুমিয়েছিল, দ্বিতীয় রাতে তা-ও পারল না ওরা। গভীর উত্তেজনায়। সবাই ভোরের অপেক্ষা করছে।

সাত

অবশেষে ভোর হলো। দিগন্তে আলোর আভাস দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছাড়ল ওরা। নাস্তা করতে বসল। স্মৃতিচারণ শুরু করল আবার মারিসা। কি করে বাবার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছে, তার প্রতি বাবার ভালবাসা, কি ভাবে মরুভূমিতে কুড়িয়ে পেয়েছিল শিশু কুকুকে। হয় মারা পড়েছিল কুকুর বাবা-মা, কিংবা অন্য কোন কারণে তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, নিশ্চিত নয় মারিসা। তবে শিম্পাঞ্জি-শিশুটাকে সঙ্গে করে প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিল সে। বড় করে তুলেছিল।

'হাম্বরুর কথা কিছু বলো,' অনুরোধ করল রবিন।

'আর বলে কি হবে! তাকে চাচার মত দেখতাম, দীর্ঘশ্বাস ফেলল মারিসা।

'আমার সঙ্গে এত ভাল আচরণ করত...কিন্তু ক্ষমতার লোভ মানুষকে যে কোথায় নিয়ে যায়!'

'সে-রাতের কথা আর কিছু মনে আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'এখনও কি তুমি মনে করো তোমার বাবাকে খুন করার জন্যে রত্নখচিত ছুরি নিয়ে এসেছিল খুনী?'

মাথা ঝাঁকাল মারিসা। 'আমাকেও তো ওটা দিয়েই খুন করতে চেয়েছিল। তাহলে হাম্বরুর ছুরি বাবার ঘরে কি করে? কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার।'

নিচের ঠোঁট চিমটি কাটল কিশোর। এ রহস্যের জবাব কি সে-ও বুঝতে পারছে না। ভুল করে হাম্বরুকে বিনা দোষে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি তো?

গত দুই বছর কি কি করেছে মারিসা, জানাল ওদের। স্বদেশ থেকে বেরিয়ে উত্তরে চলে গিয়েছিল সে। বহু কষ্টে ইয়োরোপে পৌঁছেছিল। বহু মাস ভবঘুরের মত কাটিয়েছে। কপর্দকহীন। কেবল দৌড়ের ওপর থেকেছে। জীবিকার জন্যে কত নিম্নমানের কাজ যে করতে হয়েছে। ঘুমিয়েছে রেল স্টেশনে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় তার এক আত্মীয়র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে। সেই লোক তাকে আমেরিকায় যাওয়ার প্লেন ভাড়া পাঠিয়েছিল। আবার নিরাপদ জীবন ফিরে পেল মারিসা। মডেল হওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগল। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়াটা ছিল সেই স্বপ্ন-পূরণের প্রথম ধাপ।

'কিন্তু আমি জানতাম,' কথা শেষ করল মারিসা, 'একদিন না একদিন জিবুয়াতে আমি ফিরবই। দেশপ্রেম আমার রক্তে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। দিগন্তের কালো চাদর ম্লান করে দিয়েছে ধূসর আলো। আচমকা ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, 'চলো, যাওয়ার সময় হয়েছে।'

গণ্ডারের ইঞ্জিন ততক্ষণে গরম করে ফেলেছে জোহ্যান্স। চালকের আসনে বসল মুসা। মেশিন গানে গুলি ভরতে লাগল কিশোর। রবিন রইল কামানের কাছে, যদি প্রয়োজন পড়ে। আর মারিসা থাকল রাডারের দায়িত্বে।

'গুড লাক!' সামনে থেকে সরে দাঁড়াল জোহ্যান্স। হেসে বলল, 'দয়া করে আস্ত রেখো আমার অত সাধের যন্ত্রটা।'

পুবে রওনা হলো ওরা। পর্বতের দিকে।

উদ্ভট যানটাতে করে চলতে চলতে হঠাৎ একটা ভয়ানক ভাবনা মাথায় এল কিশোরের। ওদের ব্যবহার করছে না তো জোহ্যান্স? ট্যাংক ব্যবহার করার জন্যে চাপাচাপির পেছনে তার কোন উদ্দেশ্য নেই তো? হয়তো এই যানটা নানুঙ্গুর কাছে পৌঁছে দেয়ার ইচ্ছে জোহ্যান্সের। সে-কারণে হেঁটে যেতে বাধা দিয়েছে ওদের।

কথাটা সঙ্গীদের জানাল সে। 'সময় থাকতেই এটাকে ফেলে যাওয়া দরকার,' এগিয়ে আসতে থাকা সীমান্তের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'শত্রুর কামানের সহজ নিশানা হওয়ার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

'কিন্তু আমার সে-রকম মনে হচ্ছে না,' মুসা বলল। ট্যাংক চালানোয় মজা পেয়ে গেছে সে। আরও জোরে চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটর। গতি বাড়াল। 'এসেই যখন পড়েছি, দেখিই না কি হয়? শেষে দেখা যাবে শুধু শুধু হেঁটে যাওয়ার কষ্ট

করলাম।'

তার যুক্তিটাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

রাস্তার আরেকটা মোড় নিতেই সামনে মাত্র শ'খানেক গজ দূরে দেখা গেল সীমান্ত প্রহরায় রয়েছে টোটা বাহিনী।

'মাথা নামাও!' চিৎকার করে সাবধান করল কিশোর। নিজেও মাথা ঢুকিয়ে ফেলল ইস্পাতের বেড়ার আড়ালে। দেখে ফেলেছে টোটারা। গুলি চালানোর আদেশ দিল ওদের সার্জেন্ট।

গুলির ঝাঁক এসে আঘাত হানতে লাগল ট্যাংকের ধাতব বডিতে। প্রাণ কাঁপানো শব্দ তুলতে লাগল। কোন কোনটা পিছলে উড়ে গেল এদিক ওদিক। তবে ওদের কোন ক্ষতি করতে পারল না। সোজা টোটাদের লক্ষ্য করে ট্যাংক চালিয়ে দিল মুসা। পিষ্ট হওয়ার ভয়ে রাস্তা থেকে ঝাঁপ দিয়ে সরে গেল প্রহরীরা।

'এ আক্রমণটাই শেষ আক্রমণ হলে বাঁচা যেত,' রবিন বলল। উত্তেজনায় গলা কাঁপছে তার।

সৈন্যদের পেছনে ফেলে এল ট্যাংক। গুলি করা বন্ধ করেনি ওরা। ট্যাংকের পেছনে এসে লাগছে দু'চারটা ছুটকো-ছাটকা বুলেট।

একেবারে থেমে যাওয়ার পর সাবধানে ককপিটের ওপর দিয়ে মাথা তুলল কিশোর। গুলির সীমার বাইরে পড়ে গেছে টোটারা। তবে সার্জেন্টকে ওয়াকি-টকিতে কথা বলতে দেখতে পেল।

'শেষ আক্রমণ তো নয়ই,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'সবে শুরু।'

'রাডারে শব্দ আসা শুরু হয়েছে,' নিচের সীট থেকে ঘোষণা করল মারিসা।

'তারমানে রওনা হয়ে গেছে,' মুসা বলল। কথার ভঙ্গিতে বোঝা গেল খেলাটা ভালই লাগছে তার। কাঁচা রাস্তা ধরে তীব্র গতিতে ট্যাংক ছুটিয়েছে সে।

রাডারের পর্দা থেকে মুহূর্তের জন্যে সরছে না মারিসার চোখ। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কত দূরে?'

'মাইলখানেক হবে না।'

দিগন্ত ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে মরুভূমির লাল সূর্য। রাস্তার পাশে ঘন জঙ্গল। বাঁ পাশে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে পর্বতের দেয়াল। তীক্ষ্ণ চূড়াগুলো আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে।

মেশিন গানের হাতল চেপে ধরে রবিনকে আদেশ দিল কিশোর, 'কামান রেডি করো!'

কামানটা বাজুকার সমান। গোলা ভরে ওটাকে রেডি করতে গিয়ে এত হাত কাঁপতে শুরু করল রবিনের, ফায়ারিং মেকানিজমটা ঠিক করতেই বহু সময় লাগিয়ে দিল। গোলা ছোঁড়ার অর্থই হচ্ছে মানুষ খুন! মেনে নিতে পারছে না সে। না নিয়েও উপায় নেই। নিজেকে মরতে হবে তাহলে। এরই নাম যুদ্ধ!

'ওই যে, চলে এসেছে!' চিৎকার করে জানাল মুসা।

সামনে উঁচু হয়ে থাকা রাস্তাটার ওপাশে ধুলোর মেঘ উড়তে দেখা গেল। মেশিন গানের নলের মুখ ঘুরিয়ে উঁচু জায়গাটাকে নিশানা করল কিশোর।

'কয়টা?' নিচে উঁকি দিয়ে জানতে চাইল সে।

'পেছনে দুটো,' মারিসা জানাল, 'সামনে তিনটে।'

ফিরে তাকাল কিশোর। পেছনের গাড়িগুলো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না এখনও। আবার সামনে নজর দিল। বাঁয়ে জঙ্গলের মাঝে সামান্য জায়গা ফাঁকা দেখতে পেল।

'বাঁয়ের কি অবস্থা?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু নেই,' মারিসা জবাব দিল।

'ওদিকে যাও,' কমান্ডারের ভঙ্গিতে মুসাকে নির্দেশ দিল কিশোর।

বাঁয়ে কাটল মুসা। সামনে উঁচু জায়গাটাতে উঠে চলে এসেছে ততক্ষণে দুটো জীপ। সশস্ত্র বাহিনীর লোক।

'যাক, বাঁচা গেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, 'ট্যাংক নিয়ে এলে মহাবিপদ হত।'

গুলি শুরু করে দিল টোটারা। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। ঠা-ঠা ঠা-ঠা শব্দে শত্রুকে লক্ষ্য করে গুলি ছিটিয়ে চলল তার মেশিন গান।

স্বস্তিটা বেশিক্ষণ টিকল না তার। উঁচু জায়গায় তৃতীয় যে গাড়িটা উঠে আসতে দেখল, সেটা একটা ট্যাংক। মুহূর্ত পরেই আরও দুটো দেখা দিল পেছন থেকে। সময়মত রাস্তা থেকে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে মুসা। লম্বা ঘাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে থাকা পাথরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছে গণ্ডার।

'নিশানাই তো করতে পারছি না!' চিৎকার করে জানাল রবিন। ঝাঁকুনির চোটে হাত স্থির রাখতে পারছে না সে।

একটা হাইড্রলিক লীভার চেপে ট্যাংকের চেইন নামিয়ে দিল মুসা। গাড়ির মত চাকাগুলো উঠে গেল ওপরে। চেনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল গণ্ডার, স্বাভাবিক ট্যাংক যে ভাবে চলে। রবিনকে বলল, 'নাও, ঝাঁকি কমিয়ে দিলাম। এবার চেষ্টা করে দেখো।'

টোটারাও নেমে পড়ল রাস্তা থেকে। পিছু নিল ওদের। মেশিন গানের নল স্থির রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিশোর। জানে এ রকম জায়গায় চলতে গিয়ে জীপগুলো সুবিধে করতে পারবে না, শীঘ্রি পিছিয়ে পড়বে, কিন্তু ট্যাংকের কথা আলাদা। কোনমতে একটা গোলা এসে জায়গামত লাগলেই দেখতে হবে না আর।

কামানের গোলার শব্দ হলো এই সময়।

আট

শত্রুরা করেনি। রবিন করেছে। একটা খোলা মাঠের কিনার থেকে গায়েব হয়ে গেল দুটো পাম গাছ।

'আমি বললাম যে নিশানা ঠিক রাখতে পারছি না!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ঝাঁকির বহর দেখে তো মনে হচ্ছে উল্টে যাবে।'

'কি করতে বলো আমাকে? থামিয়ে দেব?' মুসা বলল। 'চালিয়ে যাও। গুলি

করতে থাকো। লাগাতে না পারলেও, আর কিছু না হোক, ভয় দেখাতে পারবে।'

আবার কামানে গোলা ভরতে শুরু করল রবিন। এঁকেবেঁকে ছুটল মুসা, শত্রুর কামান থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে জীপ দুটো। ট্যাংকগুলো লেগে রয়েছে একভাবে।

আবার গোলা ছুঁড়ল রবিনের কামান। মিস করল যথারীতি। নিশানার বহুদূর দিয়ে উড়ে চলে গেল গোলা। কিন্তু শত্রুর নিশানা এতটা খারাপ হলো না।

পর পর দুটো শেল বিস্ফোরিত হলো। গণ্ডারের বিশ ফুট দূরে ছোটখাট একটা পুকুর বানিয়ে ফেলল।

শেলের টুকরো থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নামিয়ে ফেলল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'স্মোক-স্ক্রীন! স্মোক-স্ক্রীন!'

কন্ট্রোল প্যানেলে একটা সুইচ টিপে দিল মুসা। এক সেকেন্ড পরেই এগজস্ট পাইপের মুখ দিয়ে গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। ঘন মেঘে ঘিরে ফেলল গণ্ডারকে।

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'ভাল হলো,' জবাব দিল মুসা। 'তারমানে ওরাও দেখতে পাচ্ছে না আমাদের।'

ধোঁয়া বেরোনোর বিরাম নেই। ক্রমাগত বেরোচ্ছে। সুযোগটা কাজে লাগাল মুসা। এঁকেবেঁকে ছুটতে থাকল তৃণভূমির ওপর দিয়ে। পেছনে কালো ধোঁয়ার ঘন দেয়াল। সেই দেয়াল ভেদ করে সামনের কিছুই যে চোখে পড়ছে না টোটাদের, কোন সন্দেহ নেই তাতে। ঘন কুয়াশার মধ্যে বজ্রপাতের মত আশেপাশে বিস্ফোরিত হচ্ছে শেল। কিন্তু প্রথম দুটোর মত কাছে এল না কোনটাই।

'ঘিরে ফেলার আগেই পালাতে হবে,' কিশোর বলল।

'রাডার কি বলছে?' মারিসাকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তিন দিক থেকে ঘিরে আসছে। উত্তরটা খোলা। পুব আর পশ্চিম থেকে আসছে আরও বারোটা।'

'চমৎকার!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'তারমানে উত্তরেই যেতে হবে। পর্বতের দিকে। একমাত্র পথ। অ্যাই, শক্ত হয়ে বসো সবাই।'

সুইচ টিপে ধোঁয়া বন্ধ করে দিয়ে উত্তরে ছুটল সে। মাঠের শেষে ঘন জঙ্গল ওদিকটায়। জঙ্গলের দেয়ালে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল গণ্ডার। শিং দিয়ে গুঁতো মেরে শক্ত কাঁটাঝোপের বাধা ছিন্ন করতে করতে দানবীয় গতিতে এগোল। দম আটকে ফেলল সবাই। মনে হলো না এই বাধা অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু থামল না গণ্ডার। ইঞ্জিনও বন্ধ হলো না। ঝোপ, লতাপাতা, গাছের চারার বেড়া, কোন কিছুই ঠেকাতে পারল না ওটাকে। বুলডোজারের মত সব তছনছ করে দিয়ে ভেঙেচুরে এগিয়ে চলল।

মেশিন গান ছেড়ে দিয়ে নিচে চলে এল কিশোর। রাডারের পর্দায় চোখ রাখল।

'ওরা ধরে ফেলার আগেই পর্বতে পৌঁছতে না পারলে কপালে দুঃখ আছে,' বিড়বিড় করে বলল সে। দুজনেই তাকিয়ে আছে ছোট ছোট বিন্দুগুলোর দিকে। ঘিরে আসতে থাকা টোটা বাহিনীর চিহ্ন।

'তোমাদের এই অবস্থায় ফেলার জন্যে আমিই দায়ী,' কম্পিত কণ্ঠে বলল

মারিসা। 'তোমাদের আসতে বলা উচিত হয়নি আমার। যদি জানতাম...'

'ওরা এখনও ধরতে পারেনি আমাদের,' মারিসাকে চুপ করিয়ে দিল কিশোর।

লড়াইটা শুরু হওয়ার পর এই প্রথম ভাবার সুযোগ পেল। মানুষের ওপর এ ভাবে গুলি চালাতে রবিনের মতই ভাল লাগেনি তারও। রাগ হতে লাগল জোহ্যান্সের ওপর। ট্যাংক নিয়ে আসার জন্যে বাধ্য না করলে এই সমস্যায় পড়তে হত না ওদের। রাতে দিব্যি পথ চলতে পারত, দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত জঙ্গলে। কিন্তু ভুল পরামর্শ দিয়েছে ওদের জোহ্যান্স। ইচ্ছে করেই দিয়েছে। কোন উদ্দেশ্য আছে ওর। হতে পারে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কথা বললেও ওদেরই চর সে, কায়দা করে খুন করাতে চাইছে মারিসাকে। রাবাটুও তার ফাঁকিতে পড়েছে।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। ঘন জঙ্গলের দিকে নিবদ্ধ মুসার চোখ। গভীর মনোযোগে ট্যাংক চালাচ্ছে।

কেউ কথা বলছে না। সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লে কি ঘটবে ভাবতেও ভয় পাচ্ছে যেন।

পর্বতের পাদদেশে পৌঁছে গেল অবশেষে গণ্ডার। পেছনের ট্যাংকগুলো এখনও এটাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। খাড়া দেয়ালের মাঝখানে একটা গিরিপথ চোখে পড়ল মুসার।

'এটা দিয়ে ওপারে চলে যাওয়া গেলে হয়তো বাঁচতে পারব,' বলল সে।

পাক খেয়ে খেয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে গিরিপথটা। জঙ্গল পেছনে রেখে সেই পথ ধরে উঠে চলল গণ্ডার। ভালই এগোচ্ছে। আশা বাড়ছে গোয়েন্দাদের। চূড়ায় উঠতে পারলে নেমে যাওয়া যাবে অন্য পাশের ঢাল বেয়ে। মরুভূমিতে।

মারিসাকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'ওপাশে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'কিচ্ছু না!' হাসিমুখে জবাব দিল মারিসা। মরুভূমির দিকটা একেবারে পরিষ্কার। পেছনের ট্যাংকবহরও অনেক পেছনে পড়ে গেছে। 'এবং বর্ডার মাত্র কয়েক মাইল দূরে।'

সীমান্ত পেরিয়ে দেশের ভেতর ঢুকে যেতে পারলে আপাতত নিরাপদ। কিন্তু সামনে তাকিয়ে দমে গেল সবাই। ক্রমশ সরু হয়ে আসছে গিরিপথ। দুই ধারে পাহাড়ের দেয়াল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে জেলখানার প্রাচীরের মত।

সামনের মোড়টা ঘুরতেই ফাটা বেলুনের মত ফুস করে চুপসে গেল সমস্ত আশা। সামনের পথ রুদ্ধ। পঞ্চাশ ফুট উঁচু দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়।

'আমি জানতাম হতচ্ছাড়া এই যন্ত্রটা নিয়ে বিপদে আমরা পড়বই!' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর।

হেঁটেও যদি যেতে চায় এখন, পথ একটাই–গিরিপথ বেয়ে ফিরে যাওয়া, যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'থামলে কেন?' চেঁচিয়ে উঠল মারিসা। 'আসছে ওরা। কাছে চলে আসছে।'

'ফাঁদে আটকা পড়েছি আমরা,' দমে গেছে মুসা, মজা-মজা ভঙ্গিটা আর নেই।

আসতে কেন তাড়াহুড়া করেনি টোটারা, বোঝা গেল এতক্ষণে। চালাকি করে ওদেরকে ঠেলে দিয়েছে গিরিখাতের মাধ্য। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায়

নেই এখন গোয়েন্দাদের। ট্যাংক থেকে নেমে এল ওরা। দুই হাত তুলে দাঁড়াল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। বদ্ধ জায়গায় বিকট গর্জন তুলে এগিয়ে আসছে টোটাদের ট্যাংকগুলো।

'কিছুতেই নিজের পরিচয় ওদের কাছে দেবে না,' মারিসাকে সাবধান করে দিল কিশোর। ভয় পাচ্ছে, দেখেই না মারিসাকে চিনে ফেলে টোটারা।

থামল ট্যাংকগুলো। পিঁপড়ের সারির মত বেরিয়ে আসতে লাগল সশস্ত্র টোটারা। অবাক কাণ্ড, কেউ চিনতে পারল না মারিসাকে। কিন্তু তাতে খুশি হওয়ার কিছু নেই, বুঝতে পারছে কিশোর। হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে, অনুমান করতে কষ্ট হলো না।

কিছুই না বললে, কোন প্রতিবাদ না করলে সন্দেহ বাড়তে পারে টোটাদের, সে-জন্যে অকারণে চেঁচামেচি শুরু করল কিশোর, 'আমি আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলব।'

ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল একজন টোটা। পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো! কিন্তু খোকা, আমেরিকান অ্যামবাসাডারকে তো এখন পাবে না। ছুটিতে আছে। চিরকালের ছুটি। হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

দেহতল্লাশী করে অস্ত্র লুকানো আছে কিনা দেখার পর আবার ওদেরকে গণ্ডারে উঠতে বাধ্য করল টোটারা। পিঠে রাইফেল ঠেকিয়ে রাখল। সামনের ট্যাংকগুলোকে অনুসরণ করে ট্যাংক চালাতে লাগল আবার মুসা।

ঘণ্টাখানেক চলার পর পর্বতের মাঝের একটা মিলিটারি আউটপোস্টে পৌঁছাল ওরা। ওদেরকে আটকে রাখা হলো একটা জেলখানায়। এক এক করে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল কমান্ডারের অফিসে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

মুসাকে ফিরিয়ে এনে আবার জেলের মধ্যে ঠেলে দিল একজন গার্ড।

'খুব পিটিয়েছে?' জানতে চাইল মারিসা।

'সহ্য করার মত,' দুর্বল হাসি হেসে জবাব দিল মুসা।

ডান চোখের চারপাশ ঘিরে ফুলে উঠেছে বিশ্রী ভাবে। ঘুসির চিহ্ন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে সবার পরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে, সেজন্যেই বোধহয় ব্যবহারটাও বেশি খারাপ করেছে তার সঙ্গে। তবে জানে, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদের সময় অনেক বেশি খারাপ ব্যবহার করবে সবার সঙ্গেই।

'গুড,' কিশোর বলল, 'এখন পর্যন্ত ওরা ভাবছে আমরা জোহ্যান্সের লোক, অস্ত্র সাপ্লাইয়ে জড়িত। একটা কথা ঠিক বলেছে জোহ্যান্স, টোটারা ওর পছন্দের লোক নয়।'

মারিসার আসল পরিচয় জানতে পারেনি এখনও আউটপোস্ট কমান্ডার। সেটা এবং কমান্ডারের অফিসের সামনে রাখা গণ্ডার একটা বুদ্ধি জাগাল কিশোরের মনে।

'ওরা কি আমাদের ওপর অত্যাচার করবে?' বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পারবে না, যদি আমার ফন্দিটা কাজে লেগে যায়,' জবাব দিল কিশোর।

বুদ্ধিটা কি, সবাইকে বুঝিয়ে দিল কিশোর। সুতরাং গার্ড যখন দ্বিতীয় দফা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিতে এল ওদের, আগ বাড়িয়ে কিশোর বলল, 'আমাকে আগে

নিয়ে যান।'

কিশোরকে মাঝখানে রেখে দু'জন প্রহরী তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল কমান্ডারের অফিসে। জেলখানার দেয়ালের মতই অফিসের দেয়ালও মাটি দিয়ে তৈরি। বহুকাল আগে প্রথম যখন এখানে এসেছিল মিশনারিরা, তখন তৈরি করে রেখে গিয়েছিল এ সব বাড়িঘর।

কমান্ডারের ডেস্কের পেছনে একটা জানালা। ওটা দিয়ে গণ্ডারকে দেখতে পাচ্ছে কিশোর। বিশ গজও হবে না। কমান্ডার একজন হালকা-পাতলা মানুষ, রগগুলো অতিরিক্ত ফুলে আছে। পরনে আর্মি ফ্যাটিগ। ডেস্কের ওপাশ থেকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে তার বন্দির দিকে।

'তুমি বলে পাঠিয়েছ, তুমি কথা বলতে তৈরি। শুরু করো।'

লোকটার কাঁধের ওপর দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। মনে মনে হিসেব কষছে। অফিস থেকে গণ্ডারের দূরত্ব মেপে নিচ্ছে। চোখ ফেরাল কমান্ডারের দিকে। চোখে চোখে তাকাল।

'আপনার সঙ্গে একটা রফা করতে চাই,' কিশোর বলল। 'তবে কথা দিতে হবে, নিরাপদে আমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে দিতে হবে।'

'রফাটা কি?'

'নানুঙ্গুর ঠিকানা দেব আপনাকে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'কোথায় লুকিয়ে আছে জানাব। এমন ব্যবস্থা করব, যাতে কোন রকম বিপদ ছাড়াই নির্বিঘ্নে তার ক্যাম্পে চড়াও হতে পারেন।'

'কিভাবে?' কমান্ডারের কণ্ঠে পূর্ণ অবিশ্বাস। তাকে বিশ্বাস করাতে বেগ পেতে হবে বুঝতে পারছে কিশোর।

'যোগাযোগ করার একটা যন্ত্র রয়েছে আমাদের ট্যাংকে,' হাল ছাড়ল না কিশোর। 'ওটার সাহায্যে নানুঙ্গুর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। তাকে বলব, শত্রুরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। সাহায্য দরকার। তাতে ওমাঙ্গাভক্তদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে চলে আসবে ওরা। ফাঁকা করে দিয়ে আসবে আপনাদের জন্যে।'

কিশোর জানে, যদি তার কথামত চলেও কমান্ডার, সহজে ওদেরকে ছাড়বে না।

লোক ডেকে ট্যাংক থেকে যন্ত্রটা আনতে আদেশ দিল কমান্ডার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আদেশ পালিত হলো। নিয়ে আসা হলো যন্ত্রটা। মনে মনে হাসল কিশোর। গণ্ডারের রিমোট কন্ট্রোল ওটা।

হাতে নিয়ে জিনিসটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে কমান্ডার জিজ্ঞেস করল, 'এটার সাহায্যে নানুঙ্গুর সঙ্গে কথা বলবে তুমি?'

'না, কথা বলা যাবে না এটা দিয়ে,' স্বীকার করল কিশোর। 'তবে বোতাম টিপে সিগন্যাল পাঠাতে পারব তার কাছে, কোড মেসেজ। নানুঙ্গুর তৈরি গোপন কোড। এর সাহায্যে তার বাহিনীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে নানুঙ্গু।'

কিন্তু কোনমতেই সন্দেহ যাচ্ছে না কমান্ডারের। কিশোরের সমস্ত স্নায়ু টানটান, পেটের মধ্যে থেকে থেকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে ভয়, শার্টের নিচে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে শরীর। কিন্তু শান্ত থাকতে হচ্ছে তাকে। একটু এদিক ওদিক হলেই সর্বনাশ।

অনর্গল কথা বলে চলেছে সে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে কমান্ডার, জবাব দিয়ে চলেছে কিশোর। ভুল হবার উপায় নেই। তার কথা বিশ্বাস করাতে হবে লোকটাকে। বোঝাতে হবে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ীর সে একজন লোভী সহচর। নিজের চামড়া বাঁচাতে যে কোন অন্যায় করতে, যাকে খুশি ফাঁসিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই তার। কিশোরের মনে হচ্ছে, যে কাজটা করছে তার জন্যে তার একটা অ্যাকাডেমি অ্যাওঅর্ড পাওয়া উচিত।

'বেশ, কোডগুলো দাও আমাকে,' অবশেষে বলল কমান্ডার। 'ক্যাম্পটা কোথায় বলো। দিন কয়েকের মধ্যেই হামলা চালাব আমরা। যতদিন সফল না হব, এখানে থাকতে হবে তোমাদের।'

'হামলা চালালে এখুনি চালাতে হবে, দেরি করা যাবে না,' ভোঁতা স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'নানুঙ্গু যদি আজকের মধ্যে আমাদের কাছ থেকে সাড়া না পায়, সন্দেহ করে বসবে, সরে যাবে অন্য কোনখানে।'

পুরো একটা মিনিট চুপ করে রইল কমান্ডার। ভাবছে বোধহয় এখুনি আক্রমণ চালানোর মত লোকবল তার আছে কিনা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করার লোভ সামলাতে পারল না। তৈরি হতে আদেশ দিল তার বাহিনীকে।

'সিগন্যাল তাহলে পাঠানো যায় এখন,' কিশোরকে বলল সে। 'কি করতে হবে দেখিয়ে দাও। খবরদার, চালাকি করলে গুলি খাবে।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। প্রজাপতির ডানার ফড়ফড়ানি শুরু হলো আবার পেটের ভেতর। কোন্ বোতামটা টিপতে হবে বলে দিল লোকটাকে। বাইরে কোলাহল, হই-চই। লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তার বাহিনী। একের পর এক ট্যাংকের ইঞ্জিন গর্জে উঠছে। কিন্তু কমান্ডারের মনোযোগ রিমোটের দিকে। গণ্ডারের ইঞ্জিন কখন চালু হয়ে গেল, এত হট্টগোলের মাঝে টের পেল না সে। ট্যাংকটা যে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে তার অফিসের দিকে, তা-ও বুঝতে পারল না।

'এবার ডানেরটা টিপুন,' কিশোর বলল। 'হ্যাঁ, এবার বাঁয়েরটা।' কমান্ডারের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, খোদা, লোকটা যাতে ফিরে না তাকায়।

'হয়েছে,' বলল সে, 'এবার ডায়ালটা পুরো ঘুরিয়ে দিন ডান দিকে। সেখানেই রাখুন।'

'কই, কোন সিগন্যাল পাঠাচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ কমান্ডার। 'আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছ তুমি...'

কথা শেষ হলো না তার। দেয়াল ধসে পড়ার প্রচণ্ড শব্দে থেমে গেল সে।

বুলডোজারের মত গুঁতো মেরে দেয়াল গুঁড়িয়ে দিল গণ্ডার। কিশোরের নির্দেশ মত বোতাম টিপে ট্যাংকটাকে পুরো গতিতে তার অফিসের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে কমান্ডার। শেষ মুহূর্তে ফিরে তাকাল সে। ডাইভ দিয়ে পড়ল একপাশে। তার চেয়ার-টেবিল ভর্তা করে দিয়ে এগিয়ে চলল গণ্ডার। পরের দেয়ালটাও মিশিয়ে দিল মাটিতে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লাফ দিয়ে উঠে ককপিটে চড়ে বসল

কিশোর। রিমোট থেকে ম্যানিউলে নিয়ে এল নিয়ন্ত্রণ। সোজা ছোটাল জেলখানার দিকে।

জেলের মাটির দেয়াল ভাঙতেও বেগ পেতে হলো না। চিৎকার করে সঙ্গীদের বলল, 'উঠে এসো! জলদি!'

নয়

মুসা, রবিন আর মারিসার ওঠার অপেক্ষা করল শুধু কিশোর। তারপর একটা সেকেন্ডও আর দেরি না করে ছুটিয়ে দিল গণ্ডারকে। শিংটা কাজে লাগিয়ে গোঁয়ারের মত অন্যপাশের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে এল এমন ভাবে যেন কাগজের পর্দা ছিঁড়ল।

'দারুণ!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল মুসা, 'দেখালে বটে। কল্পনাই করতে পারেনি কিছু ব্যাটারা।'

'থ্যাংকস,' কিশোর বলল। 'কিন্তু খুশি হওয়ার কিছু নেই। এখনও বেরোতে পারিনি আমরা।'

ফিরে তাকাল কিশোর। মাটির তৈরি বাড়িটায় বিরাট এক ফোকর সৃষ্টি করেছে ট্যাংকটা। সেটা দিয়ে বেরিয়ে আসছে প্রহরীরা। নাকে-মুখে ধুলো-মাটির কণা ঢুকে গিয়ে দম আটকে দিচ্ছে ওদের। কাশতে কাশতে অস্থির। খুব দ্রুত সামলে নিল। চিৎকার করে ক্রমাগত আদেশ দিতে লাগল ওদের কমান্ডার।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'নাও, তোমার জায়গায় তুমি বসো। আমি তোমার মত চালাতে পারব না।'

হুইলে বসে পড়ল মুসা। পুরো গতিতে ট্যাংক ছোটাল। দেখতে দেখতে আউটপোস্টের বাইরে চলে এল। পর্বতের পাশে কোনমতে কেটে রাখা রাস্তাটা খুবই সরু। একপাশে চকচক করছে নদীর পানি।

'এ নদীটার কথাই জোহ্যান্স বলেছিল নাকি আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল মারিসা, 'হ্যাঁ। এটাকে অনুসরণ করে পর্বতের গোড়ায় পৌঁছতে পারলে নানুঙ্গুর ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে যাব। ওখান থেকে আর মাত্র কয়েক মাইল।'

ডানে তাকাল মুসা। গিরিখাত দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা নদী। সরু, তবে যথেষ্ট গভীর বলেই মনে হলো। পাড়টা বেশ খাড়া হয়ে নেমে গেছে। তবে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। টোটাদের আউটপোস্টের বাড়িঘর সব এই ঢালের নরম কাদামাটি দিয়েই বানানো হয়েছে।

'মনে হয় পারব,' আনমনে বিড়বিড় করল সে। নদীটার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সাহস জোগাল, 'পারতে হবে।'

'যা করার জলদি করো!' চিৎকার করে জানাল কিশোর, 'ওরা চলে এসেছে।'

জীপ আর ট্যাংকের একটা মিছিল দ্রুত ছুটে আসছে সরু রাস্তাটা ধরে। দ্রুত কাছে চলে আসছে ওগুলো। যুদ্ধ আসন্ন দেখে তাড়াতাড়ি কামানে গোলা ভরতে শুরু

করল রবিন।

'এক কামান দিয়ে কিছু হবে না,' কিশোর বলল।

'কিন্তু ওরা যে চলে আসছে। বাধা তো দিতে হবে। এবার ধরতে পারলে আর ছাড়বে না। কুকুরের মত গুলি করে মারবে। এমনিতেও মরেছি, ওমনিতেও।'

'ভেতরে ঢুকে পড়ো,' চিৎকার করে বলল মুসা। 'কুইক!'

মুসার মনে কি আছে বুঝতে পারল না রবিন। তবে যা করতে বলা হলো, করল সে। তবে কিশোর বুঝে গেছে মুসার উদ্দেশ্য। মারিসাকে সহ খোলে নেমে সীটে বসে পড়ল। সীট বেল্ট পরে নিল।

গুলি শুরু করল টোটারা।

'বসে থাকো! শক্ত হয়ে!' একটা সুইচ টিপে দিল মুসা।

ভারী দুটো ইস্পাতের খোলসের মত জিনিস দুদিক থেকে বেরিয়ে এসে নৌকার তলার মত করে ঢেকে ফেলল গণ্ডারের নিচের অংশটা। ঢাল বেয়ে পিছলে পড়তে শুরু করল বোট হয়ে যাওয়া ট্যাংক। লাগল দশ মিনিট, কিন্তু গোয়েন্দাদের কাছে মনে হলো অনন্ত কাল ধরে পড়ছে। ঝপাং করে পানি ছিটিয়ে বিরাট একটা পিপার মত পানিতে পড়ল গণ্ডার।

বিপজ্জনক ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ কাত হয়ে হয়ে দুলতে লাগল। কিন্তু ডুবল না।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! সত্যি হচ্ছে না!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল মুসা। 'সত্যি ভাসছে এটা!' প্রবল দুলুনির কারণে সামনেটা স্বাভাবিক দেখতে পাচ্ছে না সে। জিজ্ঞেস করল, 'সবাই ঠিক আছ তো?'

'আছি,' জানাল কিশোর। 'তোমার কাজ তুমি করে যাও।'

পাড়ের ওপরে রাস্তার দিকে তাকাল মুসা। ট্যাংকের কামান ঘুরিয়ে পানির দিকে তাক করছে সৈন্যরা।

পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে রবিনের। পেট ভরা থাকলে বমি করে ফেলত।

'পালাও! পালাও!' কিশোর বলল। দুলুনির চোটে মাথা ঘুরছে ওর। 'দেরি করলে কামান দেগে উড়িয়ে দেবে।'

পটাপট আরও তিনটে সুইচ টিপে দিল মুসা। অনেকগুলো কাজ হলো একসঙ্গে। দু'পাশ থেকে দুটো লম্বা পাইপের মত ভার বেরিয়ে এসে ভারসাম্য ঠিক করে দিল, বন্ধ হয়ে গেল অস্বাভাবিক দুলুনি। পেছন থেকে বেরোল প্রপেলার। শক্তিশালী একটা মোটর বোটের মত পানি কেটে চলতে শুরু করল গণ্ডার।

'আরও জোরে!' সৈন্যদের কামানের ধোঁয়া দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

গোলার আঘাতে ফোয়ারার মত পানি ছিটকে উঠতে লাগল। তবে ততক্ষণে গতি পেয়ে গেছে গণ্ডার। বিপদসীমা পেরিয়ে চলে এল।

'গেছিলাম আজকে!' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল কিশোর। তাকিয়ে আছে পেছন দিকে।

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা দোলাল রবিন।

'বিপদ এখনও কাটেনি,' হুঁশিয়ার করল মুসা। 'নজর রাখো। ডুবো পাথর আছে নাকি কোথাও দেখো। লাগলে বারোটা বাজবে। বিপদ পার করিয়ে এনেছে বটে, কিন্তু অত ভাল চলছে না এটা।'

ওপরে বেরিয়ে এল কিশোর। ককপিট থেকে নেমে সামনের দিকে এগোল, যে জায়গাটা এখন গণ্ডারের গলুইয়ে পরিণত হয়েছে। দ্রুত বইছে নদী। এত তীব্র স্রোতের মধ্যে স্বাভাবিক বোটকে নিয়ন্ত্রণ করাই মুশকিল, আর এটা তো রূপান্তরিত অদ্ভুত এক উভচর যান। চলছে যে এ-ই বেশি।

সামনে দুটো বড় বড় পাথরের চাঙড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী। কি ভাবে যেতে হবে, বাইরে থেকে নির্দেশ দিয়ে চলল কিশোর, মুসা সেভাবে চালাল বোট-কাম-ট্যাংক। বেশ কিছু মারাত্মক পাথর আর বিপজ্জনক মোড় ঘুরে আসার পর সামনে আবার দেখা গেল, পর্বতের পাদদেশ ধরে বয়ে গেছে নদীটা। ঘন জঙ্গল রয়েছে ওদিকে। ওখানে পৌঁছতে পারলে আবার ডাঙায় উঠে নানুঙ্গুর আস্তানার দিকে এগোতে পারবে।

'শুনতে পাচ্ছ?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মারিসা। গলুইয়ে বেরিয়ে এসেছে সে-ও।

কান পেতে শুনতে লাগল কিশোর। মোড়ের ওপাশ থেকে মৃদু একটা চাপা ভারী গর্জন কানে এল মনে হলো।

'থামাও! থামাও!' শব্দটা চিনতে পেরে আচমকা চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'সামনে জলপ্রপাত!'

'পারছি না!' মুসার আতঙ্কিত জবাব শোনা গেল। 'প্রপেলারে টেনে রাখতে পারছে না। স্রোতের জোর অনেক বেশি।'

মোড়টা ঘুরে এল গণ্ডার। সামনে শ'খানেক গজ দূরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে যেন নদীটা। একটা জায়গা পর্যন্ত পানি, তার ওপাশে শূন্য। কিছু নেই।

'সবই তো আছে এটার,' ঢোক গিলে বলল রবিন, 'একটা প্যারাসুটও দিয়ে দিলে ভাল করত। উড়ে যেতে পারতাম।'

'পরের বার দিতে বলব জোহ্যান্সকে।' চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'দেরি কোরো না আর। ওই পাথরগুলোতে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।'

জলপ্রপাতের মুখের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে কতগুলো বড় বড় পাথর পানি থেকে মাথা তুলে রেখেছে। ককপিটে উঠে টপাটপ পানিতে লাফিয়ে পড়ল ওরা। তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাঁতরে চলল পাথরগুলোর দিকে।

'রবিন কোথায়?' শঙ্কিত হয়ে উঠল মুসা। একটা পাথরের কিনার আঁকড়ে ধরেছে। তার সঙ্গে রয়েছে কিশোর আর মারিসা।

প্রপাতের মুখের কাছে চলে গেছে গণ্ডার। জোরে একবার দুলে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল ফেনার মধ্যে।

'রবিন! রবিন! রবিন!'

ডাকতে শুরু করল তিনজনে।

'এই যে আমি এখানে,' জবাব এল।

পাথরটার অন্যপাশ থেকে বেরিয়ে এল রবিন। ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে

কাপড়। হাঁপাচ্ছে সে। গায়ে শক্তি অবশিষ্ট আছে বলে মনে হচ্ছে না।

'আমি তো ভাবলাম গেছ তুমি!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

'গেছিলামই,' কেঁপে উঠল রবিন।

পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে পানিতে প্রায় ঝুলে রয়েছে ওরা। তীর ওখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। বুঝতে পারছে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে এখানে টিকতে পারবে না বেশিক্ষণ।

'কি করব?' জিজ্ঞেস করল মারিসা। রীতিমত কাঁপছে সে। ভয়ে, না ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে, বোঝার উপায় নেই।

নদীর তীরটা ভালমত দেখল মুসা। যথেষ্ট সমতল। বেড়ে ওঠার জন্যে পর্বতের পাদদেশ আর নদীর মাঝখানে অনেকখানি জায়গা পেয়েছে জঙ্গল। পাথরটা থেকে তীরের দূরত্ব কতখানি মনে মনে জরিপ করে নিল সে। তীরের কাছে স্রোত কম। কিন্তু ওখানে পৌঁছানোর আগেই স্রোত ওদের টেনে নিয়ে যাবে প্রপাতের মুখের কাছে।

'তোমরা থাকো এখানে,' বলেই সাঁতরানো শুরু করল মুসা।

দক্ষ সাঁতারু সে। স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে সে যদি তীরে পৌঁছতে না পারে, তাহলে বাকি তিনজনের কেউই পারবে না। দুরুদুরু বুকে তাকিয়ে রইল ওরা।

হঠাৎ ডুবে গেল মুসার মাথা। ভেসে ওঠার অপেক্ষায় রইল তিনজনে। কিন্তু আর ওঠে না। ভয়ে ভয়ে প্রপাতের মুখের দিকে তাকাল কিশোর। সাদা ফেনার মধ্যে মুসার কালো মাথাটা চোখে পড়ল না ওর। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

এই সময় চিৎকার করে উঠল মারিসা, 'ওই যে, পৌঁছে গেছে!'

তীরের অল্প স্রোতের মধ্যে সাঁতরাতে দেখা গেল মুসাকে। ডুব সাঁতার দিয়ে মাঝের স্রোতটা পার হয়ে গিয়ে ভেসে উঠেছে। তীরে উঠে পড়ল সে। যত দ্রুত পারল কতগুলো লম্বা লম্বা লতা পাকিয়ে একটা লম্বা দড়ি তৈরি করে ফেলল। এক মাথা ধরে রেখে অন্য মাথা ছুঁড়ে দিল পাথরটার দিকে। দড়ি ধরে সাঁতরে গেল একজন একজন করে।

ডাঙায় যখন উঠল সবাই, পর্বতের ওপাশে তখন অস্ত যেতে বসেছে সূর্য। দ্রুত নেমে যাচ্ছে তাপমাত্রা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে রইল ওরা। শীত আর ভয়ানক পরিশ্রমে কাঁপছে।

বসে থেকে লাভ নেই। উঠে দাঁড়াল কিশোর। প্রপাতের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ট্যাংকটার আশা খতম।'

যে যানটা এত পথ পার করে এনেছে ওদের, দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্য দুইই দেখিয়েছে, সেটা নিশ্চয় এখন জলপ্রপাতের নিচের পাথরে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

নদীর অন্য তীরের দিকে নজর যেতেই চিৎকার করে উঠল সে, 'মাথা নোয়াও! মাথা নোয়াও!' মুহূর্তে লুকিয়ে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে।

পর্বতের পাদদেশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে টোটাদের জীপ আর ট্যাংকের বহর। জলপ্রপাতের দিকে নজর ওদের। গোয়েন্দাদের ট্যাংকটাকে পানিতে নেমে পড়তে

দেখেও হাল ছাড়েনি। নদীর পাড়ের রাস্তা ধরে ঠিকই এগিয়ে এসেছে, ওরা কোথায় যায় দেখার জন্যে। প্রপাতের নিচে গণ্ডারের ধ্বংসাবশেষের দিকেই তাকিয়ে আছে নিশ্চয় এখন।

'আমাদের দেখেছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মারিসা। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসেছে সবাই।

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'তাহলে ওখানে ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত না। ওরা ভাবছে ট্যাংকটার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নিচে পড়ে মারা গেছি।'

কিশোরের অনুমান ঠিক। কয়েক মিনিট পরেই যার যার গাড়িতে চড়ে ক্যাম্পে ফিরে চলল টোটারা।

'ওদের হাত থেকে তো বাঁচলাম,' কেঁপে উঠল রবিন। 'কিন্তু এ ভাবে কতক্ষণ বাঁচব? শীতে জমে যাচ্ছি।'

'এই প্রপাতটা আমি চিনি,' মারিসা বলল। 'নানুঙ্গুর ক্যাম্প এখান থেকে চার-পাঁচ মাইলের বেশি হবে না।'

'গুড। চলো তাহলে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

আগে আগে পথ দেখিয়ে এগোল মারিসা। নদী পেছনে রেখে ক্রমশ গভীর জঙ্গলে ঢুকে যেতে লাগল ওরা। হাঁটার কারণে গা সামান্য গরম হলো বটে ওদের, কিন্তু রাত যতই এগিয়ে আসতে থাকল, তাপমাত্রা কমতে থাকল আরও। অন্ধকারে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে গিয়ে গতি ধীর হয়ে এল ওদের। বনে নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের ডাক শোনা যেতে লাগল। ঝিঁঝির একটানা কর্কশ ঐকতান ভাঙছে সিংহের ভারী গর্জন। মুসার হাতে একটা বড় লাঠি। জ্বলন্ত কোন চোখের মালিক ওদের দিকে এগিয়ে এলে বাড়ি মারার জন্যে।

'আর বেশি দূরে নেই,' ভরসা দেয়ার চেষ্টা করল মারিসা।

ঘণ্টা তিনেক হাঁটার পর একটা শৈলশিরায় পৌঁছে গেল ওরা। নিচের লুকানো উপত্যকাটা চোখে পড়ে এখানে দাঁড়ালে। ঠেলে বেরিয়ে থাকা মস্ত একটা পাথরের চাঙড়ের আড়াল থেকে টর্চের আলো চুইয়ে বেরোতে দেখা গেল।

'স্বাগতম, মারিসা ওমাঙ্গা!' অন্ধকার থেকে বলে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'আসতে তাহলে পারলে।'

'হাই!' হাসিমুখে আমেরিকান কায়দায় জবাব দিল মারিসা, এত বছর বিদেশে থাকায় দেশী রীতি যেন ভুলে গেছে। কণ্ঠস্বরের মালিককে নানুঙ্গুর প্রহরী মনে করল। 'আসতে পেরে কি যে খুশি লাগছে আমার!'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা।

মারিসার হাসিখুশি ভঙ্গিটা পলকে আতঙ্কে রূপ নিল। 'হাম্বরু!'

দশ

'মৃত' মানুষটাকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে হতবাক হয়ে গেছে মারিসা। মনে হলো মৃত লোকটার প্রেতাত্মা এসে দাঁড়িয়েছে রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে। ভীষণ রোগা, লম্বা, বেতের মত লিকলিকে দেহ। চিতার মত ক্ষিপ্র। শক্তিও নিশ্চয় কম নেই। দু'দিক থেকে গায়ে গায়ে লেগে তাকে পাহারা দিচ্ছে দু'জন রাইফেলধারী দেহরক্ষী।

একটা মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর পিছানো শুরু করল মারিসা। কিন্তু লোকগুলো এগিয়ে আসতে লাগল।

'মারিসা, ভয় পেয়ো না। আমি...'

কৌতূহলে ফেটে পড়ছে তিন গোয়েন্দা। কিন্তু এখন প্রশ্ন করার সময় নয়। সবার আগে নড়ে উঠল মুসা। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল একজন দেহরক্ষীর ওপর। কিশোর আর রবিনও দেরি করল না। আচমকা আক্রমণ চালিয়ে দুই দেহরক্ষীর হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিল।

'পালাও!' মারিসার উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

এ রকম কিছু আশা করেনি লোকগুলো। দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। এই সুযোগে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছুটতে শুরু করল মারিসা। তার পেছনে ছুটছে রবিন। সবার পেছনে মুসা। হুড়মুড় করে এসে ঢুকল ঘন জঙ্গলে। ভাবছে, যে কোন মুহূর্তে গর্জে উঠবে রাইফেল। গায়ে এসে বিঁধবে বুলেট।

কিন্তু এল না।

'আমাদের তো জানানো হয়েছে মরে গেছে লোকটা,' পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছুটতে ছুটতে বলল মুসা।

'মারিসা ওকে চিনতে ভুল করল কিনা কে জানে,' কিশোর বলল।

অন্ধকারে মারিসার ভুল দেখার ওপর গুরুত্ব দিল ওরা। এমনও হতে পারে, যে লোকটাকে হাম্বরু ভেবেছে মারিসা, সে হাম্বরু নয়। চেহারার সঙ্গে মিল আছে এমন অন্য কেউ।

'কিংবা হয়তো সত্যিই হাম্বরু,' মুসা বলল। 'ওর মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারটা স্রেফ বানানো গল্প।'

'নানুঙ্গুর ক্যাম্পের কাছে কি করছে তাহলে? আর ও যে মারিসা, জানলই বা কি করে?'

'তাই তো!'

উত্তেজনা আর চিন্তায় মগজ ভারী, তাই দুটো গাছের মাঝখানে ঝুলে থাকা বিশাল মাকড়সার জালটা চোখে পড়ল না মুসার। গিয়ে পড়ল ওটার মধ্যে।

'খাইছে!' বলে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে জাল ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। সুতোগুলো যেমন শক্ত, তেমনি আঠাল। ছাড়ানো শেষ করার আগেই ঘাড়ের ওপর

কাঁটাওয়ালা পায়ের তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগল।
চটাৎ করে চাপড় লাগল তার ঘাড়ে।
মাকড়সাটা কামড়ে দেয়ার আগেই থাবা দিয়ে ওটাকে ফেলে দিল কিশোর। পা দিয়ে মাড়িয়ে ভর্তা করে দিতে লাগল।
ফিরে তাকাল মুসা। মাটিতে পড়ে থাকা মাকড়সাটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। পা ছড়ানো অবস্থায় আধ ফুটের বেশি, দেহটা ইঁদুরের সমান। এত বড় মাকড়সা আর দেখেনি সে। কোন্ জাতের মাকড়সা ওটা চিনতে পারল না। তবে কামড়টা যে মোটেও সুখকর কিছু হত না, এটা বেশ বুঝতে পারল।
'থ্যাংকস,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল সে।
'ধন্যবাদের দরকার নেই,' হেসে জবাব দিল কিশোর। 'বলা যায় না, এখুনি ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন পড়তে পারে।'
চারপাশে তাকাতে শুরু করল মুসা। আরও মাকড়সার জাল থাকতে পারে। বলল, 'আল্লাই জানে, এরচেয়ে বড় আছে কিনা। হয়তো ওগুলোর কাছে এটা লিলিপুট।'
'আমিও সেই ভয়ই পাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'কি যে ঘটবে বুঝতে পারছি না। যেটাই করতে চাচ্ছি, বাধা আসছে, কিংবা উল্টোটা ঘটছে। মারিসার সঙ্গে আলোচনা করে নেয়া দরকার, নতুন কোন ফাঁদে পা দেয়ার আগেই।'
ঢাল বেয়ে নেমে চলল দুজনে। মারিসা আর রবিনের সন্ধানে। কিন্তু ক্যাম্পের কিনারে পৌঁছে বুঝতে পারল, আলোচনা করে কিছু করার সময় পার হয়ে গেছে। ওদের আগেই পৌঁছে গেছে রবিন আর মারিসা। উল্লসিত সশস্ত্র বাহিনী ঘিরে ফেলেছে ওদের।
'মনে হচ্ছে দুশ্চিন্তা করার আর কিছু নেই,' সেদিকে তাকিয়ে বলল মুসা। মারিসাকে পেয়ে লোকগুলোর খুশি হওয়ার কারণ নিশ্চয় শত্রুকে হাতে পাবার আনন্দে নয়।
কিশোর আর মুসাও এসে ক্যাম্পে ঢুকল। মারিসা ও রবিন তখন বিশালদেহী একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। তার পরনে মিলিটারি পোশাক। মাথাটা পুরো কামানো। আগুনের আলোয় চকচক করছে।
'হাম্বরুকে দেখেছ?' মারিসাকে প্রশ্ন করছে লোকটা। 'সত্যি?' কিশোর আর মুসার সাড়া পেয়ে চোখ তুলে তাকাল সে। ওদের দেখে অবাক হলো মনে হলো।
'হ্যাঁ,' জবাব দিল মারিসা, 'দেখেছি। আপনার ক্যাম্পের একেবারে কাছে চলে এসেছিল।'
জেনারেল নানুঙ্গুর সঙ্গে কিশোর আর মুসার পরিচয় করিয়ে দিল মারিসা। আন্তরিক ভঙ্গিতে ওদের সঙ্গে হাত মেলাল নানুঙ্গু। মারিসাকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার জন্যে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগল। তারপর কয়েকজন লোককে পাঠাল পাহাড়ে গিয়ে হাম্বরুকে খুঁজে বের করার জন্যে।
'দেখামাত্র গুলি করবে,' আদেশ দিয়ে দিল সে।
লোকগুলো জঙ্গলে হারিয়ে গেলে মারিসার দিকে ফিরল আবার নানুঙ্গু। 'বেঈমানটা এখনও বেঁচে আছে!' ভ্রূকুটি করল সে। 'খুব খারাপ কথা! ভাগ্যিস গুলি

করেনি তোমাকে।'

নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে কিশোর। ভাবনা চলেছে তার মগজে। ওরা দেখার আগেই ওদের দেখতে পেয়েছিল হাম্বরু। গুলি করার ইচ্ছে থাকলে সহজেই করতে পারত। ওরা যখন পালাচ্ছে, তখনও পারত। কিন্তু করেনি। মজার ব্যাপার হলো, ওমাঙ্গাভক্তদের কমান্ডার মারিসার কথা বিশ্বাস করেছে। অবাকটা হয়েছে হাম্বরুর কাছাকাছি থাকার কথা শুনে, তার বেঁচে থাকার কথা শুনে নয়।

'ট্যাংকটা কোথায়?' ওদের নিয়ে তাঁবুর দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল নানুঙ্গু।

জলপ্রপাতে পড়ে কি ভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে ওটা, জানাল মারিসা। শুনে খুব দুঃখ পেল নানুঙ্গু।

'ওটা আমার ভীষণ দরকার ছিল,' বলল সে। 'শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খুব কাজে লাগত।' ফুঁসে উঠল হঠাৎ। 'কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

'প্রথমেই যে খারাপটা হয়েছে,' মুখ না খুলে আর পারল না কিশোর, 'সেটা হলো ট্যাংকটাতে চড়ে আমাদের আসতে বাধ্য করা। ওটার কারণে বেশ কয়েকবার জীবন বিপন্ন হয়েছে আমাদের। আপনি কি সেটা বুঝতে পারছেন, জেনারেল নানুঙ্গু?'

'ওটাতে চড়ে আসা অনেক বেশি নিরাপদ ছিল তোমাদের জন্যে,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল নানুঙ্গু। 'রাখতে পারোনি, সেটা তোমাদের অযোগ্যতা।' মারিসাকে পেয়ে খুশি যতটা হয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি রেগে গেছে ট্যাংক হারানোয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'এদিকের সমস্ত জঙ্গল আর পাহাড় চোর-ডাকাতে বোঝাই। তা ছাড়া মানুষখেকো বাঘ-সিংহের অত্যাচার। ট্যাংকে চড়ে আসাতেই শেষ পর্যন্ত তোমরা আসতে পেরেছ। আমার রাগ হচ্ছে তোমাদের বোকামি দেখে। এ রকম জিনিস এ ভাবে কেউ খুইয়ে আসে?'

'চোর-ডাকাত?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ। প্রচুর আছে। কাউকে ছাড়ে না ওরা। আমাদেরকেও না, বিপ্লবীদেরকেও না। পায়ে হেঁটে এলে কোনমতেই এখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারতে না তোমরা। এখন বোঝা যাচ্ছে, চোর-ডাকাতের সর্দারটা কে। ওই হাম্বরু।'

তার কথা মানতে পারছে না মুসা। কিন্তু কিশোরের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল। কিশোর তাকে মুখ না খুলতে ইঙ্গিত করেছে। নানুঙ্গুর নিজের ক্যাম্পে তার বিরুদ্ধে কথা বলে বিপদই বাড়বে শুধু, লাভ কিছু হবে না।

তাঁবুতে ঢুকে খেতে বসল ওরা। বিরোধীদের পরাজিত করে কিভাবে মারিসাকে ভাইস প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসানো যায়, সেই আলোচনায় মাতল নানুঙ্গু। খাওয়ার সময় কোন রকম গোলমাল হলো না। কেবল ফিরে এসে লোকগুলো যখন জানাল হাম্বরুকে পাওয়া যায়নি, তখন সামান্য সময়ের জন্যে নানুঙ্গুর রেগে যাওয়া ছাড়া।

খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে উঠে গেল তিন গোয়েন্দা। তাদের বলল নানুঙ্গু, 'ঢোকার চেয়ে এখান থেকে বেরোনো অনেক কঠিন। ঠিক আছে, যাও, ঘুমাওগে।'

মারিসা রয়ে গেল। তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল নানুঙ্গু।

তিন গোয়েন্দাকে আরেকটা তাঁবুতে নিয়ে গেল একজন গার্ড। তিনটে খালি খাটিয়া পাতা আছে ওখানে। কিন্তু অস্বস্তি বোধটা কোনমতেই যাচ্ছে না ওদের। নানুঙ্গু ওদের এ ভাবে কথা বলল কেন? ঢোকার চেয়ে বেরোনো কঠিন—এটা কি হুমকি?

ঘুম এল না ওদের। বাইরে বেরিয়ে এল। হেঁটে বেড়াতে লাগল সারা ক্যাম্পে। জায়গায় জায়গায় কয়েকজন করে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছে সৈন্যরা। কেউ ইংরেজি জানে না। ফলে কথা বলা সম্ভব হলো না ওদের সঙ্গে। কিছু কিছু জিনিস খটকা লাগল গোয়েন্দাদের। ক্যাম্পে কোন সিভিলিয়ান নেই, সব সেনাবাহিনীর লোক। কিন্তু আসার আগে শুনেছে রাজ্যের সব ধরনের লোক গিয়ে যোগ দিয়েছে ওমাঙ্গাভক্তদের দলে, নানুঙ্গুর নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্যে। আরও একটা ব্যাপার, মারিসার আগমনে কেউ কেউ উত্তেজিত হলেও, বেশির ভাগই নির্বিকার। কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। সবাই গম্ভীর, বিষণ্ণ। সব মিলিয়ে ক্যাম্পের পরিবেশ মোটেও সুবিধের মনে হলো না ওদের কাছে।

'আমার কিছু মাথায় ঢুকছে না,' রবিন বলল। 'দেখে মনেই হচ্ছে না ওরা দেশের হয়ে লড়ছে। কি করছে ওরা এখানে?'

'আমার মনে হয় মার্সিনারি,' চাপা স্বরে বলল কিশোর। 'ভাড়াটে সৈনিক। টাকার জন্যে কাজ করে। সে-জন্যেই কোন কিছু নিয়ে মাথাব্যথা নেই।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বিদীর্ণ করে দিল রাতের অন্ধকারকে।

'কোত্থেকে এল?' মুখ তুলে শিকারী বিড়ালের মত গন্ধ শুঁকতে লাগল যেন মুসা। সৈন্যদের কারও কোন মাথাব্যথা দেখা গেল না এ নিয়ে।

এক প্রান্তের একটা তাঁবু লক্ষ্য করে দৌড় দিল কিশোর। কাছে এসে কানা তুলে ভেতরে উঁকি দিল। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে একজন সৈন্যকে। দেহের ওপরের অংশে কোন কাপড় নেই, কোমর পর্যন্ত খোলা। নিষ্ঠুর ভাবে চাবুক দিয়ে পেটানো হচ্ছে তাকে। চাবুক আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠছে বন্দি। পিঠের চামড়া কেটে নতুন নতুন রক্তাক্ত দাগ সৃষ্টি হচ্ছে।

'হাম্বরুকে যারা খুঁজতে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে দেখেছি একে,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'হাম্বরুকে খুঁজে বের করতে না পারার অপরাধেই বোধহয় পেটাচ্ছে।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওদের। ভীষণ বিরক্তি নিয়ে সরে এল তাঁবুর কাছ থেকে।

'সৈন্যদের গম্ভীর হয়ে থাকার কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল,' কিশোর বলল। 'নানুঙ্গুর নিষ্ঠুরতা পছন্দ করতে পারছে না ওরা।'

'আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে,' মুসা বলল। 'মারিসা কেমন আছে গিয়ে দেখা দরকার।'

'ঠিক বলেছ,' কিশোর বলল।

'হাই!' ওদের দেখে হাসিমুখে হাত নাড়ল মারিসা। এখনও খাবার টেবিলে বসে কথা বলছে নানুঙ্গুর সঙ্গে। 'আমি তো ভাবলাম এতক্ষণে স্বপ্নের জগতে চলে গেছ তোমরা।'

'না, এখনও যাইনি,' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। মারিসাকে ভাল দেখে স্বস্তি বোধ করছে। নানুঙ্গুর দিকে তাকাল, খানিকটা অভিযোগের দৃষ্টিতেই, 'আপনার একজন লোককে দেখলাম বেঁধে চাবকাচ্ছে। হুকুমটা আপনিই দিয়েছেন নাকি?'

রেগে উঠল জেনারেল। 'বড় বেশি ছেলেমানুষ তুমি। আর্মি ডিসিপ্লিন ঠিক রাখার জন্যে কত কি যে করতে হয় কোন ধারণাই নেই তোমার।' ধমকের সুরেই বলল, 'যাও এখন, ঘুমাতে যাও। আমাকে কমান্ডিং শেখাতে এসো না। এটা তোমার লড়াই নয়। দেশটাও তোমার নয়।'

কি প্রশ্নের কি জবাব!

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। হয়তো ঠিকই বলেছে নানুঙ্গু। সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে মাঝে মাঝে কঠোর হতে হয়। কিন্তু এই ক্যাম্পের লোকগুলোর ভাবভঙ্গিতে মোটেও মনে হচ্ছে না ওরা খুব মানসিক শান্তিতে আছে। মোট কথা, স্বাভাবিক নয় কোন কিছু।

'আমার প্রশ্ন করা মোটেও ভাল লাগেনি তার,' খাটিয়ায় শুয়ে বলল কিশোর। 'বেশি কিছু বলতে গেলে মনে হচ্ছে আমাদের ধরেও চাবকাবে।'

মারিসার জন্যেই হয়তো ওদেরকে সহ্য করছে নানুঙ্গু। বাড়াবাড়ি করতে গেলে তখন আর ছাড়বে না।

পরদিন সকালে নাস্তার সময় প্রায় কোন কথাই বলল না তিন গোয়েন্দা। নানুঙ্গু যখন একটা জীপে করে ওদেরকে বের করে দিয়ে আসতে বলল, তখনও চুপ করে রইল ওরা।

'তোমাদেরকে আমি মিস করব,' ওরা জীপে ওঠার আগে মারিসা বলল। 'আবার যখন ক্ষমতায় যাব আমরা, শান্তি আসবে এ দেশে, তোমাদের দাওয়াত করব আমি। দেশটার জন্যে তোমাদের অবদানের কথা ভুলব না কোনদিন।'

স্মৃতি হিসেবে একটা করে হলুদ রুমাল ওদের উপহার দিল মারিসা। নানুঙ্গু দিল অনেক দামী উপহার। এক বটুয়া ভর্তি আকাটা হীরা। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জীপে চড়ল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে উঠল তাদের গাইড। পর্বতের দিকে রওনা হলো গাড়ি।

পথে টোটাদের চিহ্নও দেখা গেল না কোথাও। আবার এসে মরুভূমিতে ঢুকল ওরা। গাইডের ওপর নির্দেশ আছে টোটাদের আস্তানাকে দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে জিবুয়া সীমান্ত পার হয়ে ওদেরকে ওদের ল্যান্ডরোভারের কাছে পৌঁছে দেয়ার।

মরুভূমিতে মাইল বিশেক যেতে না যেতেই পোড়াতে লাগল সূর্য। কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিল গাইড।

'থামলেন কেন?' অস্বস্তি প্রকাশ পেল মুসার কণ্ঠে।

সীটের নিচ থেকে টান দিয়ে একটা পিস্তল বের করল লোকটা। তাক করে ধরল মুসার বুকের দিকে।

এগারো

এতক্ষণে একটা কথাও বলেনি লোকটা। ইংরেজি জানে কিনা তা-ও বোঝা গেল না। তবে তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। হীরাগুলো কেড়ে নিতে চায়। রবিনের কাছে ছিল বটুয়াটা। কেড়ে নিল সেটা। তারপর পিস্তল নেড়ে নামতে ইশারা করল ওদেরকে।

'নামছি, নামছি,' কিশোর বলল। 'গুলি করবেন না।' পানির ক্যান্টিনটা তুলে নিয়ে তপ্ত বালিতে নেমে পড়ল সে। একে একে নেমে পড়ল মুসা আর রবিন।

কিশোর আশা করল, পানি নিতে বাধা দেবে না গাইড। মরুভূমিতে টিকে থাকার একমাত্র উপকরণ। কিন্তু ওটা ফেলে দিতে বাধ্য করল লোকটা। এক গুলিতে ফুটো করে দিল। বেরিয়ে যাওয়া সমস্ত পানি মুহূর্তে শুষে নিল গরম বালি।

নির্বিকার ভঙ্গিতে গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল লোকটা। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'কুবুদ্ধিটা ওর নিজের না নানুঙ্গুর, সন্দেহ হচ্ছে আমার এখন,' রাগে গজগজ করতে লাগল মুসা। তাকিয়ে আছে জীপটার দিকে। ধুলোর মেঘ তুলে ছুটে যাচ্ছে পর্বতের দিকে।

মরুভূমির বিশাল বিস্তারের দিকে অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'কি করে বাঁচব এখন বুঝতে পারছি না।'

গত কয়েক দিনের বিপজ্জনক অভিযান এমনিতেই স্নায়ু টানটান করে রেখেছে ওদের। বেড়ে গেল আরও সেটা। মেঘশূন্য আকাশে আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য। দিগন্তে অদ্ভুত এক ধরনের ঢেউ ঢেউ ঝিলিমিলি সৃষ্টি করেছে গরম বাতাস।

'পর্বতের দিকেই যেতে হবে, আর কোন উপায় নেই,' কপালের ওপর হাত রেখে রোদ আড়াল করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'দিনটা তো যাবেই, রাতেরও অর্ধেকটা লেগে যাবে তাতে। তবে এটাই আমাদের একমাত্র উপায়।'

'উপায়' বলতে যেটা বোঝাতে চেয়েছে মুসা, সেটাকে কোনই উপায় বলে মনে হলো না কিশোরের। এখান থেকে জীবন্ত গিয়ে পর্বতে পৌঁছানো অসম্ভব। আর যদি কোন অলৌকিক উপায়ে পৌঁছাতে পারেও, গিয়ে পড়বে টোটাদের খপ্পরে। তবে মরুভূমিতে রোদে কাবাব হয়ে পানির অভাবে শুকিয়ে মরার চেয়ে সে-ও ভাল।

'ঠিকই বলেছ,' অগত্যা মুসার কথা সমর্থন করল কিশোর। 'তবে সরাসরি না এগিয়ে খানিকটা পশ্চিমে সরে এগোনো যেতে পারে, যাতে বর্ডারে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারি।'

'পানি থাকলে কোন চিন্তাই করতাম না,' শুকনো স্বরে বলল রবিন।

'চিন্তার কোন কারণ নেই,' পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে রসিকতা করল মুসা, 'কয়েক মাইল গেলেই একটা হট ডগের দোকান পাওয়া যাবে। চিলি ডগ আর বরফ দেয়া সোডাও মিলবে। দাম মাত্র এক ডলার।'

শুকনো হাসি ফুটল রবিনের মুখে। সবাই বুঝতে পারছে মোটেও হাসির ব্যাপার নয় এটা। সকাল শেষ হয়নি এখনও, এখনই তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি উঠে গেছে। ভয়াবহ গরমে দুর্বল বোধ করা আরম্ভ হয়ে গেছে তার। পায়ে হেঁটে এই মরুভূমি পাড়ি দেয়া অসম্ভব।

মরুভূমিতে রাতে চলা অনেক বেশি নিরাপদ। তখন গরম থাকে না। রোদও থাকে না। কিন্তু রাত পর্যন্ত টিকে থাকাই সম্ভব নয়। সঙ্গে নেই পানি। খিদেয় না মরলেও পিপাসা সহ্য করতে পারবে না। রাতের বেলা সুবিধে যেমন আছে, একটা বড় সমস্যাও আছে। অন্ধকারে দেখতে পাবে না। হয়তো সকালে উঠে দেখবে লক্ষ্য ঠিক রাখতে না পেরে সারারাত একই জায়গায় ঘুরে মরেছে। সূর্য থাক বা না থাক, এ মুহূর্তে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। দিন থাকতে থাকতে কুড়ি মাইল পথ যদি পাড়ি দিয়ে ফেলতে পারে, রাতের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবে পর্বতের পাদদেশে।

যা থাকে কপালে ভেবে হাঁটা শুরু করে দিল ওরা। দুপুর হতে হতে তাপমাত্রা উঠে গেল একশো পনেরো ডিগ্রিতে। বাতাস ত গরম, ঠোঁটে ফোসকা পড়া শুরু হলো। আগে আগে হাঁটছে মুসা। কিশোর আর রবিন তার পেছনে।

মুসার পায়ের দিকে লক্ষ রেখে একের প এক পা ফেলে চলেছে রবিন। দুটো বাজতে বাজতে ফোসকায় ভরে গেল তার মুখ বালির ওপর দিয়ে কোনমতে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পা দুটো।

মুসা আর কিশোরও দুর্বল হয়ে আসছে। তবে দমছে না মুসা। স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে একদিকে। মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছে রবিন আর কিশোরের দিকে। রবিনের অবস্থা শঙ্কিত করে তুলল ওকে। নিজের দেহটাই বয়ে নিয়ে যাওয়ার অবস্থা নেই, রবিনকে বইবে কি করে!

'ওই দেখো একটা শপিং মল!' আচমকা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন। দৃষ্টি অস্বাভাবিক। পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি ও!

পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা আর কিশোর। প্রচণ্ড গরমে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে রবিনের। এমনিতেই কিছুদিন থেকে মাথায় একটা সমস্যা হয়েছে ওর। সে-জন্যেই বোধহয় এত তাড়াতাড়ি মরীচিকা দেখা শুরু করেছে। কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে মাইলখানেক দূরে যখন ছোট ছোট কিছু কুঁড়ের জটলা চোখে পড়ল ওদের দুজনেরও, নিজেদের মস্তিষ্ক সম্পর্কেও সন্দেহ দেখা দিল।

'শপিং মল!' বলে চিৎকার দিয়ে ঘরগুলোর দিকে ছুটতে আরম্ভ করল রবিন।

'উপজাতীয়দের গ্রাম!' প্রলাপ বকতে শুরু করল যেন কিশোরও।

পা, চামড়া, গলায় যেন আগুন ধরে গেছে। কিন্তু পরোয়া করল না কোন কিছুরই। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ছুটে চলল গ্রামটার দিকে। খাবার আর পানির আশায়। ভুলে গেছে, জিবুয়ায় যাওয়ার সময় গ্রামগুলোর কি অবস্থা দেখেছে। পানি নেই, খাবার নেই। কঙ্কালসার মানুষগুলোর চেহারা মনে পড়ল। খাবারের অভাবে নিজেরাই যেখানে ধুঁকছে ওদের দেবে কোত্থেকে?

তবে আর কিছু না হোক, ছায়া তো আছে। রোদে কাবাব হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে।

গ্রামে পৌঁছে ওদের আশা বাড়ল। আসার সময় দেখা অন্য গ্রামগুলোর মত

ক্ষুধার্ত মনে হলো না এখানকার অধিবাসীদের। কঙ্কালসার পেটে-পিঠে লেগে যাওয়া দেহের বদলে এদের বেশ সুগঠিত স্বাস্থ্য, মেদহীন ছিপছিপে দেহ। পাতলা-সাতলা দেহের অধিকারী ছেলেমেয়েরা এসে কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল গোয়েন্দাদের।

'পানি!' অনুরোধ জানাল মুসা। ইংরেজি বুঝতে পারবে না ওরা ভেবে মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে ইঙ্গিতে জানাল কি চায়।

'পানি?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। 'দাঁড়াও, দিচ্ছি।'

ঘুরে তাকাল ওরা। কয়েকজন বয়স্ক লোক বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে দন্তহীন এক বৃদ্ধ। গায়ে ময়লা আলখেল্লা, পায়ে স্যান্ডেল। ইংরেজিতে কথা বলেছে এই লোকটাই। ওর মুখে ইংরেজি শুনে অবাক হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'আমার নাম আমু,' দন্তহীন হাসি দিয়ে নিজের পরিচয় দিল বুড়ো লোকটা। 'এসো আমার সঙ্গে।'

খাবার পায় কোথায় এরা: প্রশ্নটা খচখচ করতে লাগল কিশোরের মনে, কিন্তু সেটা পরেও করা যাবে। আগে পানি খাওয়া দরকার। গলা পুড়ে যাচ্ছে।

বুড়ো লোকটার পেছনে পা টেনে টেনে এগোল তিন গোয়েন্দা। একটা কুঁড়েতে নিয়ে এল ওদেরকে বুড়ো।

আর দাঁড়াতে পারছে না। মাটিতে বিছানো নলখাগড়ার মাদুরে শুয়ে পড়ল রবিন। দু'জন মহিলা এসে পানি দিয়ে তার ফোসকা পড়া ঠোঁট ভিজিয়ে নরম করে দিল। তারপর অল্প অল্প করে পানি ঢেলে দিতে লাগল মুখের ভেতর; যতক্ষণ না আবার অনুভূতি ফিরতে লাগল রবিনের। মাটির পাত্র ভর্তি পানি নিয়ে অল্প অল্প করে চুমুক দিয়ে খেয়ে চলেছে কিশোর আর মুসা। একবারে বেশি গিলে ফেললে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

'আপনি আমাদের জীবন বাঁচালেন,' অবশেষে বুড়োর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল কিশোর। 'কি করে আপনার ঋণ শোধ করতে পারি, বলুন?'

দন্তহীন মাঢ়ী বের করে হাসল বুড়ো। 'আগে বলো এখানে কেন এসেছ? মরুভূমিতে কি করছিলে?'

সংক্ষেপে তাদের আসার উদ্দেশ্য বুড়োকে জানাল কিশোর। মারিসাকে জিবুয়ায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে ওরা শুনে উল্লসিত চিৎকার করে উঠল আমু, 'মারিসাকে নিয়ে এসেছ? খুব ভাল। খুব ভাল।'

কুঁড়েতে ঢুকেছে আরও কয়েকজন গ্রামবাসী। বাকিরা উঁকিঝুঁকি মারছে দরজায় দাঁড়িয়ে। সুখবরটা নিজেদের ভাষায় তাদের শোনাল আমু। আনন্দে কলরব শুরু করে দিল সবাই। এক সময় শান্ত হয়ে চুপ করল তারা।

আমু আবার জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, 'মারিসা এখন কোথায়?'

'ওমাঙ্গাভক্তদের ক্যাম্পে তাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।' কিশোরের মনে হলো কথাটা বুঝতে পারল না আমু। তখন বলল, 'নানুঙ্গুর ক্যাম্পে।'

হঠাৎ বদলে গেল আমুর চেহারা। আনন্দের চিহ্ন দূর হয়ে গিয়ে তার জায়গায় ঠাঁই নিল ভয়। 'নানুঙ্গু?' উদ্বেগে, উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে হাত নাড়তে শুরু

করল সে, বাতাসে খামচি মারতে লাগল যেন, 'খুব খারাপ! খুব খারাপ!'

খারাপটা কি বুঝতে পারল না গোয়েন্দারা। আবার গ্রামবাসীদের দিকে তাকিয়ে খবরটা জানাল বুড়ো। শুনে আবার হুল্লোড় করে উঠল তারা। এবার আনন্দের বদলে দুশ্চিন্তা দেখা গেল ওদের চেহারায়। শঙ্কিত হয়ে উঠল। ক্রূর চোখে তাকাতে লাগল গোয়েন্দাদের দিকে।

গাঁয়ে ঢোকার পর এই প্রথম অনুভব করল ওরা, শত্রু এলাকায় ঢুকে পড়েছে। হয়তো টোটাদের হয়ে কাজ করে এরা। ওদের গুপ্তচরগিরি করে। সাহায্য-সহযোগিতা করে। বিনিময়ে খাবার আর পানি পায়। সে-জন্যেই ওমাঙ্গাভক্তদের কথা শুনে এমন রেগে গেছে। আরও একটা সম্ভাবনা মনের কোণে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে কিশোরের। ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা। লোকগুলোর তাগড়া দেহ যেটা প্রমাণ করছে। মাংসের কোন অভাব হয় না ওদের। পায় কোথা থেকে?

হয়তো ওরা নরখাদক! ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ খাওয়া শুরু করেছে। শত্রুর গ্রাম থেকে গিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের ধরে এনে খায়।

'নানুঙ্গু খারাপ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ! হ্যাঁ! খারাপ! খারাপ! খুব খারাপ!'

গাঁয়ের আরও কয়েকজন প্রবীণ লোকের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল আমু। মিনিটখানেক পর কিশোরের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা এখানে থাকো। বিশ্রাম করো। যেয়ো না।'

শেষ কথাটা অকারণেই বলেছে। যাওয়ার অবস্থাই নেই। বিশেষ করে রবিনের। ওকে আবার এখন মরুভূমিতে বের করে নিয়ে যাওয়ার অর্থ খুন করা।

নরখাদকের গ্রাম, এই সম্ভাবনার কথাটা মুসা আর রবিনকে জানানো দরকার, ভাবল কিশোর। বুড়ো বেরিয়ে গেলেই জানাবে। আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র খুঁজতে শুরু করল তার চোখ। লাঠিটাঠি পেলেও হয়, কিছুক্ষণ তো অন্তত বাধা দিতে পারবে। মানুষের পায়ের লম্বা হাড় হলেও কুছ পরোয়া নেই, সেটা দিয়েই মাথা ফাটাবে রাক্ষসগুলোর।

বুড়ো বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে কিশোর বলল, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

সতর্ক হয়ে উঠল বুড়োর চোখ। 'কি?'

'আসার পথে যত গ্রাম দেখেছি, সব জায়গায় দুর্ভিক্ষ চলছে। আপনাদেরই শুধু দেখছি খাওয়ার সমস্যা নেই। খাবার পান কোথায়?'

প্রশ্নটা করল বটে, কিন্তু কিশোর জানে, ঠিক জবাব পাবে না। লোকগুলো যদি নরখাদকই হয়ে থাকে, সত্যি কথা বলবে না। কারণ তাহলে গোয়েন্দারাও এখন ওদের খাবার। খাবারের কাছে আসল কথা বলে পালানোর চিন্তা মাথায় ঢোকাবে না। কিন্তু বুড়োর কথা শুনে অবাক না হয়ে পারল না কিশোর।

'খাবার দিয়ে যায় মরুর জিন।'

আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল বুড়ো। জবাবটা ভয় পাওয়ানোর বদলে অনেক বেশি কৌতূহলী করে তুলল কিশোরকে। নরখাদকের জবাবের মত মনে হলো না কথাটা। এ সব এলাকার মানুষ সাংঘাতিক কুসংস্কারে বিশ্বাসী। মরুর জিন বলে কি বোঝাতে চাইল?

'মরুর জিনটা আবার কোন্ ধরনের ভূত?' ভয়ে ভয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

গ্রামবাসীরা সব চলে গেছে। দরজায় পাহারা রেখে গেছে দু'জন লোককে।

'সে-রহস্যের সমাধান অবশ্যই করতে হবে,' গম্ভীর মুখে জবাব দিল কিশোর। 'বুড়োর কথামত এখন খানিক বিশ্রাম নেয়াই উচিত আমাদের। সারাদিনে আরও কত কিছুর মুখোমুখি হতে হবে কে জানে!'

বারো

'অ্যাই, ওঠো। এসো আমার সঙ্গে।'

দুই ঘণ্টা পর ঘুম থেকে ওদের ডেকে তুলল একটা কণ্ঠ। চোখ মেলে দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আমু। গায়ে ময়লা আলখেল্লা। পায়ে স্যান্ডেল।

রবিনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে চাইল কিশোর আর মুসা। কিন্তু নিজে নিজেই দাঁড়াতে পারল রবিন। বিশ্রাম নিয়ে আবার প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে সে। শেষ বিকেল। অনেক কমে গেছে তাপমাত্রা। তাতে আরাম বোধ করছে ওরা।

'আমি ঠিক হয়ে গেছি,' হেসে বলল রবিন। 'কি, শপিং মলটা যে খুঁজে বের করলাম, খুশি লাগছে না?'

সামনে কি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে জানে না ওরা। আমুর সঙ্গে মরুভূমিতে বেরিয়ে এল আবার। পশ্চিমে রওনা হলো। অস্তগামী সূর্যের দিকে।

'বুড়োকে চিৎ করে দিয়ে পালাব নাকি?' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'রবিনও ঠিক হয়ে গেছে। রাতের বেলা পর্বতে পৌঁছানো কঠিন হবে না এখন আর।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বুড়ো কি করে না দেখে যাচ্ছি না আমি। আমার ধারণা মরুর জিনের কাছে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সে। জিনটা যে-ই হোক বা যা-ই হোক।'

'দাঁড়াও!' মাইল তিনেক আসার পর থামতে বলল আমু।

ছোট একটা পাহাড়ের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। ঘন ঝোপঝাড় জন্মে আছে ঢালের গায়ে। দিগন্তের নিচে নেমে গেছে সূর্য। আকাশের রঙ ঘন বেগুনী।

'আমাদেরকে এখানে কেন এনেছেন...?'

মুসার প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই পেছনের ঝোপ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল সাতজন লোক। পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন। বহুকাল দাড়ি কামায় না। কাঁধে ঝোলানো রাইফেল। ঘিরে ফেলল গোয়েন্দাদের।

ডাকাতের দল! বলতে গেল মুসা। বলল না।

ওদের আসার খবর আগে থেকেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল ডাকাতদের, বোঝা গেল সেটা। কিন্তু আমু ওদেরকে এখানে নিয়ে এল কেন? ওদের তিনজনের চোখ বেঁধে ফেলা হলো। রাইফেলের নল পিঠে ঠেকিয়ে ঠেলে নিয়ে চলল কোথায় কে

জানে।

চোখে দেখতে পাচ্ছে না রবিন। কিন্তু গায়ে ঠাণ্ডা লাগার অনুভূতি থেকেই অনুমান করতে পারছে রাত নামার দেরি নেই। এক সারিতে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে বালির ওপর দিয়ে।

'আমাদের কি মরুর জিনের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন?' না জিজ্ঞেস করে পারল না মুসা।

জবাবে পিঠে রাইফেলের নলের প্রচণ্ড এক গুঁতো। কোন প্রশ্ন শুনতে চায় না ডাকাতেরা। আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না মুসার।

কিছুক্ষণ চলার পর অনুভব করল রবিন, তাপমাত্রা হঠাৎ করে নেমে গেছে কম করে হলেও আরও দশ ডিগ্রী। পদশব্দের প্রতিধ্বনি যখন কানে ঢুকতে লাগল, বুঝে গেল কোথায় ঢোকানো হয়েছে ওদের। গুহার মধ্যে।

'লু আব্বা জিন ওয়াসটাগো! ডিবা ওয়ান টিন গোয়েন্ডা!' জিবুয়া ভাষায় কর্কশ কণ্ঠে আদেশ শোনা গেল।

দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো গোয়েন্দাদের। চোখে বাঁধা কাপড়ের ভেতর দিয়ে ম্লান আলো এসে ঢুকছে। কাপড় খুলে দেয়া হলো।

'হাম্বরু!' অবাক না হয়ে পারল না কিশোর। টর্চের আলো থেকে চোখ সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল।

বিশাল গুহার মাঝখানে একটা পাথরের ওপর বসে আছে লম্বা সেই লোকটা, যাকে সেদিন রাতে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ছুটে পালিয়েছিল ওরা। গুহার দেয়ালে গেঁথে দেয়া হয়েছে জ্বলন্ত মশাল। গোটা বিশেক সশস্ত্র লোককে বসে থাকতে দেখা গেল পাথর ঘিরে। সবাই গম্ভীর। নিশ্চুপ।

'আপনিই তাহলে মরুর জিন?' হাম্বরুর চোখে চোখে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করছে মুসা।

লোকটার চোখে কোন রকম আন্তরিকতা দেখা গেল না। 'হ্যাঁ,' ইংরেজিতে জবাব দিল সে। 'আমাকেই মরুর জিন বলে ডাকে ওরা। বসো। এখন থেকে আমিই শুধু প্রশ্ন করব।'

যারা ওদের ধরে নিয়ে এসেছিল, তারাই কাঁধ চেপে ওদেরকে বসিয়ে দিল গুহার মেঝেতে। এতক্ষণে হাম্বরুর পেছনে দাঁড়ানো লোকটাকে চোখে পড়ল কিশোরের।

সেই লোকটা! কপাল কাটা। ওদের অনুসরণ করেছিল যে।

'আপনিই আমাদের পিছু নিয়েছিলেন!' চিৎকার করে উঠল মুসা। সে-ও চিনে ফেলেছে। 'কেন নিয়েছিলেন?'

'বললাম না, এখন থেকে আমিই শুধু প্রশ্ন করব!' ধমকে উঠল হাম্বরু।

সাবধান করে দেয়ার জন্যে মুসার মাথায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে আলতো গুঁতো মারল একজন প্রহরী। মুহূর্তে মাথায় রাগ চড়ে গেল তার। লাফিয়ে উঠে রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে লোকটার মাথায় বসিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল। ব্যথায় গোঙাল না। কথা বলল না। চুপচাপ বসে থাকল।

'তোমাদের কারণে ইতিমধ্যেই অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আমাকে,' হাম্বরু বলল। 'প্রশ্নের জবাব দাও এখন। যা জিজ্ঞেস করব ঠিক ঠিক জবাব দেবে।

মিথ্যে বলার চেষ্টা করবে না। বলো, কেন এসেছ এখানে?'

মিথ্যে বলে পার পাবে না বুঝে গেছে কিশোর। বলার কোন কারণও দেখতে পেল না। গ্লোড়া থেকে জানাল সব। মারিসা ওমাঙ্গাকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে রাবাটুর ওদের নিয়োগ করা থেকে শুরু করল। নানুঙ্গুর ক্যাম্পে ওকে কিভাবে পৌঁছে দিয়েছে জানাল। শেষ করল আমুর গাঁয়ে কিভাবে গিয়ে উঠেছে, সেই কথা দিয়ে। অসংখ্য প্রশ্ন আকুলিবিকুলি করছে মনে। কিন্তু হাম্বরুকে জিজ্ঞেস করতে সাহস করল না।

কিশোরের কথা শোনার পর টানটান পরিবেশটা ঢিল হয়ে এল গুহার। 'তোমাদেরকেও গাধা বানিয়েছে নানুঙ্গু,' কর্কশ ভাবটা চলে গেছে হাম্বরুর কণ্ঠ থেকে। 'তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমরা কেন এসেছ সেটা জানারও খুব প্রয়োজন ছিল। শত্রু পক্ষের লোকও হতে পারতে তোমরা। বিশ্বাস করো, আমি বেঈমান নই। কাউকে খুনও করিনি।

'বিদ্রোহটা হলো যে রাতে, আরও অনেকের সঙ্গে সঙ্গে আমিও পালিয়েছিলাম ওমাঙ্গার প্রাসাদ থেকে। তখন জানতামই না খুন হয়ে গেছে ওমাঙ্গা। পরে জানলাম যখন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো শুরু হলো তাকে খুন করার অভিযোগে।'

'সবাই জানে আপনাকে গুলি করে মারা হয়েছে।' রবিনের প্রশ্ন, 'তাহলে বেঁচে আছেন কি ভাবে?'

হাসল হাম্বরু। 'বেঁচে থাকার জন্যেই এই মিথ্যেটা প্রচার করতে হয়েছে আমাকেই। যাতে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো বন্ধ হয়। জঙ্গলে টোটাদের গুলি করে মেরে রেখে যাওয়া একটা লোককে দেখতে পেয়ে তার গায়ে আমার পোশাক পরিয়ে রাখি। লাশটা যখন পাওয়া গেল পচে গলে বিকৃত হয়ে গেছে, মুখ দেখে চেনার জো ছিল না। ইউনিফর্ম দেখে আমি বলে শনাক্ত করা হয়েছে ওটাকে। সবাই বিশ্বাস করেছে গুলি খেয়ে মারা গেছি আমি। সুযোগটা কাজে লাগালাম। আত্মগোপন করলাম। যারা বিশ্বাস করে আমি নির্দোষ, এমন কিছু মানুষকে নিয়ে দল গড়লাম। টোটা আর বিরোধীদের হাতে ধরা পড়া থেকে বাঁচার জন্যে চোর-ডাকাতের মত পালিয়ে বেড়াতে হয় এখন আমাদের। ধরতে পারলে বিনা বিচারে গুলি করে মারবে।'

'তারমানে চালাকি করে আপনাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হাম্বরু। 'আমি জানি সব কিছুর মূলে নানুঙ্গু। সে-ই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, ওমাঙ্গার বেডরুমে ছুরিটা খুঁজে পেয়েছে বলেছে। সত্যি কথাটা হলো, সে-রাতে প্রাসাদ থেকে পালানোর সময় ছুরিটা ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি। একজন টোটা সন্ত্রাসী তাড়া করেছিল আমাকে। আত্মরক্ষার জন্যে তার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম ছুরিটা। সহজেই ওটা তুলে নিয়ে গিয়ে ওমাঙ্গার ঘরে রেখে আসা সম্ভব ছিল।'

রাবাটু আর নানুঙ্গু ধোঁকা দিক বা না দিক, হাম্বরুর কথায় আর পটতে রাজি না গোয়েন্দারা। অনেক হয়েছে। অত সহজে আর কাউকে বিশ্বাস করতে রাজি না ওরা। কিন্তু হাম্বরুর কথার সঙ্গে মারিসার কথা যে মিলে যাচ্ছে এটাও অস্বীকার করতে পারল না। মারিসা বলেছে যে ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে ওর বাবাকে, ওটার

বাঁট রত্নখচিত ছিল। সুতরাং হাম্বরু যা বলছে সেটা হওয়া খুবই সম্ভব। তাকে দোষী বোঝানোর জন্যে ছুরিটা নিয়ে গিয়ে ফেলে আসা হয়েছে ওমাঙ্গার বেডরূমে। সাজানো কেস।

'আপনি যে নির্দোষ সেটা প্রমাণ করার কোন উপায় আছে?' জানতে চাইল রবিন।

মাথা নাড়ল হাম্বরু। 'কি করে করব? প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে প্রাসাদে ফিরে যেতে পারব না আমি। আর গেলেও কোন লাভ হবে না। সব তছনছ করে ছত্রখান করে দিয়েছে বিদ্রোহীরা। আমার একমাত্র ভরসা এখন মারিসা। ওকে খুঁজে বের করে যদি বোঝাতে পারি, তার বাবাকে আমি খুন করিনি, তাহলে হয়তো দেশবাসীকে বোঝাতে সমর্থ হবে সে। এটাই আমার এখন একমাত্র আশা। সে-জন্যেই আমার পথে কাঁটা হয়েছ ভেবে তোমাদের ওপর এতটা রেগে গিয়েছিলাম আমি।'

আলোচনাটা সরে গেল কপাল কাটা লোকটার দিকে, যে ওদেরকে অনুসরণ করে লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে গিয়েছিল। ওর নাম হারুজা। টোটা বা বিরোধীদের গুপ্তচর নয় সে। হাম্বরুই তাকে পাঠিয়েছিল রাবাটুর ওপর নজর রেখে ওর আগেই মারিসাকে খুঁজে বের করার জন্যে। হারুজা যখন দেখল মারিসাকে খোঁজার জন্যে তিন গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করেছে রাবাটু, গোপনে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকে খুদে ইলেকট্রনিক হোমিং ডিভাইস ঢুকিয়ে রেখেছিল ওঁদের জুতোর গোড়ালিতে। তারপর ওমরের সঙ্গে ওদের কথোপকথন শুনে শিওর হয়ে গিয়েছিল যে কেসটা ওরা নিচ্ছে।

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে মুসা বলল, 'তাহলে এ ভাবেই কর্মটা সেরেছেন আপনারা। কিন্তু কি করে বুঝলেন কোন জুতোটার মধ্যে রাখতে হবে?'

হাসল হারুজা। বেশ গর্বিত দেখাল হাসিটা। 'কিশোরের যত জুতো পেয়েছি, সবগুলোর গোড়ালিতে একটা করে যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম আমি। তাতে যে জোড়াই পরুক না কেন, তোমাদের অনুসরণ করতে আর কোন ঝামেলাই হয়নি আমার। যন্ত্রগুলো চালু হয় কেবল হাঁটার সময়। কাজেই সঙ্কেত দেয় একমাত্র পায়ে পরা জুতোটাই। আর এ ভাবেই তোমাদের পিছে লেগে থাকতে সামান্যতম অসুবিধে হয়নি আমার। রকি বীচ থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস, এমনকি গতরাতে জঙ্গলের মধ্যেও তোমাদের খোঁজ পেয়ে গিয়েছি আমি ওই যন্ত্রের সাহায্যে।'

মনে মনে হারুজার প্রশংসা না করে পারল না কিশোর। কিন্তু ভেবে অবাক লাগল, এত কষ্ট কেন করতে গেল সে? সোজা এসে ওদের বলে দিলেই পারত, সে-ও মারিসাকে খুঁজে বের করতে আগ্রহী। রাবাটুর আগে।

হাম্বরুকে জিজ্ঞেস করতেই জবাব দিল, 'তাহলে কি আর খোঁজাটা চালিয়ে যেতে তোমরা? আমার তো মনে হয় না। কারণ তোমরা তখন দ্বিধায় পড়ে যেতে। বুঝতেই পারতে না কাকে বিশ্বাস করা দরকার, হারুজা নাকি রাবাটু।'

'তা ঠিক,' অস্বীকার করল না কিশোর। 'হয়তো তখন তদন্তটাই বন্ধ করে দিতাম আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল হাম্বরু, 'তাহলেই বোঝো। তোমাদের কাছে রাবাটুর যাওয়ার কারণ হারুজাকে তার লেজ থেকে খসানো। তোমাদের পেছন পেছন তাকে লস

অ্যাঞ্জেলেসে পাঠিয়ে দিতে পারলে তোমরাও অকারণ ঘুরে মরবে, সঙ্গে সঙ্গে হারুজাও, এই সুযোগে রকি বীচের আশপাশ থেকে মারিসাকে খুঁজে বের করে ফেলবে সে। কারণ সে জেনে ফেলেছিল মারিসা ওখানেই আছে।'

'রাবাটু এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে হয়তো নানুঙ্গুর ক্যাম্পে,' জবাব দিল হারুজা।

'মারিসাকে ওরা কি করবে বলে মনে হয় আপনার?' মাথায় বাঁটের গুঁতো খাওয়ার পর এই প্রথম আবার প্রশ্ন করল মুসা।

'খুন করবে, যদি বুঝতে পারে মারিসা জেনে গেছে তার বাবার আসল খুনী কে,' হাম্বরু বলল। 'আর তা না হলে বাঁচিয়ে রেখে ওকে ব্যবহার করবে লোকের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে। মৃত মারিসার চেয়ে জ্যান্ত মারিসা নানুঙ্গুর কাজে লাগবে বেশি।'

'আপনার কি মনে হয়?' রবিন বলল, 'রাবাটুই মারিসার বাবাকে হত্যা করেছে?'

'কোন সন্দেহ নেই আমার। প্রেসিডেন্ট ওমাঙ্গার দলের বিশ্বাসঘাতক ওরা।'

'তারমানে, বোঝা যাচ্ছে, মারিসাকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসাটাই ওর জন্যে নিরাপদ,' মুসা বলল। 'সুতরাং সে-কাজটাই এখন করতে হবে আমাদের।'

'আমি জানতাম তোমরা এ কথাই বলবে,' হাম্বরু বলল। 'তোমাদের সাহায্য পেলে হয়তো আরেকটা সুযোগ আমরা করে নিতে পারব।'

'কিন্তু নানুঙ্গুর উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা চুলকাল হাম্বরু। 'আমি নিশ্চিত না। হয়তো ক্ষমতা। গোপনে বিরোধীদের সঙ্গে কোন চুক্তি করে থাকতে পারে। নানুঙ্গু চিরকালই ক্ষমতালোভী আর নিষ্ঠুর।'

'তারমানে,' মুসা বলল, 'আমাদের সঙ্গে যে গাইডটাকে দিয়েছিল, সে নানুঙ্গুর কথামতই কাজ করেছে। হীরাগুলো আমাদেরকে দান করে দেবার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। ওগুলো দিয়েছে কেবল মারিসাকে বোঝানোর জন্যে।'

'এবং সে জেনে গেছে আমি বেঁচে আছি,' হাম্বরু বলল। 'মরুভূমিতে তোমরা মারা গেলে, সেই দোষটাও আমার ঘাড়ে চাপাত।'

'আর সবার মত মারিসাও সেটা বিশ্বাস করত,' যোগ করল রবিন।

'আরও আছে। জোহ্যান্সকে দিয়ে নানুঙ্গু তোমাদেরকে ট্যাংকে চড়ে যেতে জোর-জবরদস্তি করিয়েছিল যাতে আমি তোমাদের ধরতে না পারি। মারিসা আমার হাতে না পড়ে। টোটারা যদি তোমাদের ধরে আটকে ফেলত, কিংবা শেল মেরে ট্যাংকটা উড়িয়ে দিত, সেটাও তার জন্যে আমার হাতে তোমরা পড়ার চেয়ে ভাল হত। কারণ আমার হাতে পড়লে মারিসাকে আমি বুঝিয়ে ফেলতাম সব নষ্টের মূলে ওই নানুঙ্গু।'

'তারমানে আগাগোড়াই বোকা বানানো হয়েছে আমাদের,' বিরক্তিতে নাক মুখ কুঁচকে ফেলল মুসা। 'এখন আমাদের একমাত্র কাজ মারিসাকে নানুঙ্গুর ক্যাম্প থেকে বের করে নিয়ে আসা।'

'হ্যাঁ, পারলে খুবই ভাল হত,' হাম্বরু বলল। 'সামনাসামনি লড়তে গেলে পারব না। ওর লোকবল আমার চেয়ে অনেক বেশি। একমাত্র উপায় তোমরা গিয়ে যদি মারিসাকে বোঝাতে পারো আমি বিশ্বাসঘাতক নই, আমি নিরপরাধ। তাহলে হয়তো

তখন নানুঙ্গুর বিরুদ্ধে ওমাঙ্গাভক্তদের খেপিয়ে তুলবে মারিসা।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছিল কিশোর। হাত সরিয়ে এনে বলল, 'খুব রিস্কি হয়ে যাবে সেটা। নানুঙ্গু একটা সেকেন্ডের জন্যেও আমাদের সঙ্গে একা ছাড়বে না মারিসাকে। আর আমরাও কোন প্রমাণ ছাড়া তাকে বিশ্বাস করাতে পারব না।'

উঠে দাঁড়াল হাম্বরু। শূন্যে হাত ছুঁড়ে বলল, 'প্রমাণ? কি প্রমাণ জোগাড় করব আমরা? এমনকি যে মারিসা নিজের চোখে তার বাবাকে খুন হতে দেখেছে, সে পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারবে না খুনীকে।'

ঠিক এই সময় উঠে দাঁড়াল আমু। চুপচাপ এতক্ষণ মন দিয়ে সব কথা শুনছিল সে। সামনে এগিয়ে এল। 'সাক্ষী একমাত্র মারিসাই নয়।' চোখের তারায় আলো চকচক করছে তার। 'আরও একজন আছে। কুকু। মারিসার পোষা শিম্পাঞ্জী।'

বুড়োর দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাল হাম্বরু যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকটার। 'বাজে কথা বোলো না! শিম্পাঞ্জী আবার সাক্ষী দেয় কি করে?'

'কেন পারবে না?' আমু বলল। 'শিম্পাঞ্জীর ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। স্মৃতিশক্তিও ভাল। গন্ধ শুঁকেই খুনীকে চিনে ফেলবে।' দন্তহীন মাঢ়ী বের করে হাসল সে।

চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। দুনিয়ার কোন আদালতই কুকুর সাক্ষ্য গ্রাহ্য করবে না। কিন্তু কাউকে দেখে তার মধ্যে যদি ভয়ানক কোন প্রতিক্রিয়া হয়, অবশ্যই বিশ্বাস করানো যাবে মারিসাকে।

'কিন্তু কুকুকে খুঁজে পাব এখন কি ভাবে?' মুসার প্রশ্ন। 'দুই বছর ধরে সে নিখোঁজ। কোথায় আছে কে জানে!'

চওড়া হাসি ফুটল আমুর মুখে। 'সে-ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমার একটা জীপ দরকার। কিছু আপেল, আর প্রচুর লবণ।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না।

অবশেষে হাসি ফুটল হাম্বরুর মুখে। শ্রদ্ধাভরা কণ্ঠে বলল, 'আমু, তুমি না হয়ে অন্য যে কেউই বলত, তাকে আমি পাগল ভাবতাম। কিন্তু তোমার অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা আগেও দেখেছি আমি। পাবে তোমার জীপ, আপেল আর লবণ। কখন বেরোতে চাও?'

তেরো

হাম্বরু তার সীমিত ভাণ্ডার থেকে একটা পুরানো জীপ দিল আমুকে। টোটাদের সঙ্গে একটা খণ্ড লড়াইয়ে ওটা জোগাড় করেছিল হাম্বরু বাহিনী। খানিকটা লবণ আর একটা আপেলও দেয়া হলো।

'সকাল বেলা আমুর সঙ্গে বেরোতে হবে তোমাদের,' হাম্বরু বলল। 'এখন ঘুমাতে যাও।'

জানোয়ারের চামড়ায় তৈরি বিছানায় রাতটা মোটামুটি আরামেই কাটিয়ে দিল

ওরা। জাগল ভোরবেলা, গুহার মুখ দিয়ে যখন গোলাপী আলো চুইয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। দ্রুত নাস্তা সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আমুর সঙ্গে। গুহামুখের কাছে একটা ঝোপের আড়ালে লুকানো রয়েছে জীপটা। ওপর থেকে তেরপল সরিয়ে উঠে বসল। রওনা হলো পুবে। মুসা চালাচ্ছে। পাশে বসে পথ বাতলে দিচ্ছে আমু।

'মরুভূমিতে কোথায় গুপ্ত ঝর্ণা আছে, শিম্পাঞ্জীরা জানে,' আমু বলল। 'গ্রীষ্মকালে, খরার সময় পানির জন্যে ওসব জায়গায় গিয়ে জমা হয় ওরা। আশেপাশেই আস্তানা গাড়ে। খুব সাবধান থাকে, যাতে ওদের গোপন ঝর্ণার খবর মানুষেরা পেয়ে না যায়।'

'ও, তারমানে আপনি ভাবছেন,' রবিন বলল, 'ওরকম কোন ঝর্ণার কাছেই গিয়ে লুকিয়েছে কুকু?'

মাথা ঝাঁকাল আমু। 'হ্যাঁ। পর্বতের ওপারের ভয়ঙ্কর জঙ্গলের বিপজ্জনক পরিবেশে টিকতে পারবে না কুকু, কারণ ছোটবেলা থেকেই মানুষের কাছে বড় হয়েছে সে, জঙ্গলে বাস করার অভিজ্ঞতা নেই। এমন জায়গায় থাকতে চাইবে যেখানে নিজের জাতভাইদের সঙ্গে মোটামুটি নিরাপদ আর শান্তিতে থাকতে পারবে।'

'কিন্তু কি করে বুঝবেন কোন্ ঝর্ণাটাতে আছে সে?' কিশোরের প্রশ্ন। 'তা ছাড়া যত গোপন জায়গাই যদি হয়, খুঁজেই বা বের করবেন কি ভাবে?'

'প্রথমত, যুক্তি দিয়ে,' জবাব দিল আমু। 'যুক্তি কি বলে? প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে প্রাসাদের কাছাকাছিই কোন ঝর্ণার কাছে যাবে সে। দূরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।'

'প্রাসাদের কাছে যাবেন?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'ওখানে তো জানি টোটারা গিজগিজ করছে।'

মাথা ঝাঁকাল আবার আমু। 'কাছাকাছি বললেও যথেষ্ট দূরে থাকব আমরা, মরুভূমির মধ্যে। ওদের নজরে পড়ার মত কাছে যেতে হবে না আমাদের। তারপরেও হুঁশিয়ার তো থাকতেই হবে।'

লবণ আর আপেল দিয়ে কি করবে আমু, জানার জন্যে চাপাচাপি শুরু করল রবিন। কিন্তু কিছুতেই বলল না বুড়ো। ওদের রহস্যের মধ্যে রেখে যেন মজা পাচ্ছে। ফোকলা হাসি হেসে বলল, 'এই কৌশলটা আমি আমার দাদার কাছ থেকে শিখেছি। কি করব, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

একটা শুকনো খালের কাছে এসে গাড়ি থামাতে বলল আমু। নেমে গিয়ে মাটির আর্দ্রতা পরীক্ষা করে ফিরে এল। হাতে করে নিয়ে এসেছে এক তাল মাটি। কাছেই কোথাও ঝর্ণা আছে। এখান থেকেই শুরু করা যাক। পর্বতের ওই দিকটায় নিয়ে গিয়ে কোথাও গাড়ি রাখো।'

পর্বতের দিকে তাকাল গোয়েন্দারা। কিন্তু প্রাসাদ বা রাজধানী শহরের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না।

'ভয় নেই,' হেসে বলল আমু, 'আছে ওখানে। পর্বতের মধ্যে লুকানো।'

হাত থেকে মাটির তালটা ফেলে দেয়ার আগে আরেকবার তাতে আঙুল বোলাল আমু। হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। খুদে একটা নুড়ির মত জিনিস দেখাল।

'দেখো!' তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে টিপে ধরে জিনিসটা বের করে নিল। 'মাছের ডিম!'

কিশোরের দিকে তাকাতে লাগল রবিন। বুড়োর মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে তার।

হেসে ডিমটা রবিনের হাতে তুলে দিল আমু। 'শুকনো খালের পানিতে ডিম পাই আমরা। মাসের পর মাস, এমনকি পুরো বছর ধরে বালির মধ্যে লুকিয়ে থাকে এই ডিম। তারপর বর্ষাকালে যখন পানিতে ভরে যায় খাল, ওই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। খুদে মাছের পোনারা সাঁতার কাটতে শুরু করে খালের পানিতে।'

'খাইছে! বলেন কি?' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল মুসা। 'আপনি বলতে চান শুকিয়ে যাওয়া এই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল আমু, 'মোটেও শুকায়নি এটা। চাইলে পকেটে করে আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারো। পানির পাত্রে ছেড়ে দিলেই দেখবে মুহূর্তে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে এসেছে।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার!' হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল মুসার চোখ। যেন সোনার খনি পেয়ে গেছে। 'এটা দিয়ে খেল দেখিয়ে কোটি কোটি ডলার কামাতে পারব!'

হাসল কিশোর। 'হয়েছে। কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন বাদ দিয়ে এখন ঠিকমত গাড়ি চালাও। কুকুকে খুঁজে বের করা দরকার, ভুলে গেছ?'

পর্বতের দিকে এগিয়ে যেতে বলল মুসাকে আমু। ডিমের কথা ভুলতে পার না মুসা। আমুকে বলল, এ রকম যত ডিম পাবে সব আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে লাভের পঞ্চাশ ভাগ তাকে দিয়ে দেবে কথা দিল মুসা।

'দুজনেই আমরা ধনী হয়ে যাব,' বকবক করেই চলল সে। 'আপনার কাজ ডিম খুঁজে বের করা। আমার কাজ বিক্রি করা। তার ওপর অ্যাকুয়ারিয়ামে ডিম ফোটানোর খেলা তো রয়েছেই।'

উদ্ভট কাজকারবারে মাঝে মাঝেই আগ্রহী হয়ে ওঠে মুসা। তবে সেটা ভুলে যেতেও দেরি হয় না। আবার নতুন কিছু একটা শুরু করে। সামনে বিশাল একটা পিঁপড়ের বাসা দেখে আমু থামতে না বলা পর্যন্ত বকবক করে গেল সে। বাসাটা ছোটখাট একটা টিলার সমান।

'থামব কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'দেখতে পাবে।'

'বাপরে, আরেক কিশোর পাশা। পেট থেকে কথা ছাড়তে চায় না। তফাৎ কেবল বয়েসে।'

গাড়ি থেকে নেমে বাসাটার দিকে এগিয়ে গেল আমু।

রোদে শুকিয়ে ইঁটের মত শক্ত হয়ে গেছে ঢিপিটার কাদা। আট ফুট উঁচু, গোড়ার বেড় পুরানো ওক গাছের সমান। বড় বড় কালো পিঁপড়েরা এক সময় বাস করত এখানে। বহুকাল আগে চলে গেছে। কাদার তৈরি অদ্ভুত বাসাটার ভেতরে জালের মত তৈরি করেছিল অসংখ্য সুড়ঙ্গ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে বুড়োর কাণ্ড দেখছে তিন গোয়েন্দা। বাসাটার চারপাশ ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছে আমু। বিচিত্র ভাষায় তীক্ষ্ণ স্বরে গান গাইছে।

'কি করছে ও?' মাথা চুলকে বলল মুসা। 'এমন আজব কাণ্ড তো আর দেখিনি।'

টিপি থেকে সামান্য দূরে কতগুলো পাতাশূন্য গাছ। সেদিকে হাত তুলে কিশোর বলল, 'ওই দেখো।'

নানা ধরনের নানা প্রজাতির বানর গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে ওগুলোতে। শিম্পাঞ্জীও আছে। স্বভাব-কৌতূহলী বানরের দল আগ্রহী চোখে তাকিয়ে আছে আমুর দিকে। তার অদ্ভুত নাচ-গান দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওদের। বেশি আগ্রহী শিম্পাঞ্জীরা, কারণ তাদের বুদ্ধি বেশি।

উন্মাদ নৃত্য থামল এক সময়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসল মুসা। 'যাক, বুড়ো তাহলে পাগল হয়নি।'

তাকিয়ে থাকা বানরগোষ্ঠীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আপেলটা বের করল আমু। রাখল একটা সুড়ঙ্গমুখের কয়েক ইঞ্চি ভেতরে। তারপর সরে এল জীপের কাছে।

'সরে যাও!' মুসাকে বলল।

কি যে করছে বুড়ো কিছুই বুঝতে পারল না মুসা। স্টার্ট দিয়ে সরে যেতে লাগল টিপিটার কাছ থেকে।

আধ মাইল যাওয়ার পর আর জিজ্ঞেস না করে পারল না সে, 'আপেলটা ওভাবে রেখে এলেন কেন?'

বাতাসে হাত নাচাল আমু। 'একটা শিম্পাঞ্জী ধরব প্রথমে। তারপর এমন পিপাসা পাওয়াব তার, গোপন ঝর্ণাটার কাছে ছুটে যেতে বাধ্য হবে। কে তার পিছু নিল না নিল কেয়ারও করবে না তখন।'

বুড়োর প্ল্যান বুঝে গেছে কিশোর। রবিনও কিছু কিছু বুঝতে শুরু করেছে। কিন্তু মুসা সেই অন্ধকারেই রয়ে গেল।

মিনিট দশেক পর বুড়োর কথামত আবার টিপির কাছে ফিরে এল ওরা। ভুল হয়নি বুড়োর। সত্যি একটা শিম্পাঞ্জী আপেলটা বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। এমন মাপের একটা গর্তে রেখেছে আমু, আপেলটা ধরার পর মুঠো বড় হয়ে যাওয়াতে সেটা আটকে গেছে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে। বের করে আনতে পারছে না শিম্পাঞ্জীটা। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বয়ামের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মুঠো ভর্তি ক্যান্ডি নিয়ে আর হাত বের করতে পারছে না বাচ্চা ছেলে।

'খালি দেখতে থাকো এখন,' মুসার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে চোখ টিপল বুড়ো। তার আসল দর্শক কে বুঝে গেছে। 'এখানেই মানুষের সঙ্গে বানরের বুদ্ধির ফারাক, বুঝলে।' এগিয়ে চলল শিম্পাঞ্জীটার দিকে।

আমুকে দেখে ছুটে পালাতে চাইল শিম্পাঞ্জীটা। হাত বের করে আনার জন্যে পাগল হয়ে উঠে টানাটানি শুরু করল। কিন্তু আপেলটা ছাড়ার কথা মাথায় ঢুকছে না।

কাছে পৌঁছে গেল আমু। একটা দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল গলায়। এতক্ষণে হুঁশ হলো শিম্পাঞ্জীটার। আপেলের লোভ উধাও হলো মগজ থেকে। আপেলটা ছেড়ে দিতেই মুহূর্তে বেরিয়ে এল হাতটা। তবে আর কোন লাভ নেই। ধরা পড়ে

গেছে।

এক মাথা দিয়ে শিম্পাঞ্জীটাকে ছাগলের মত বেঁধে দড়ির আরেক মাথা একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল আমু। তারপর লবণের দলাটা ওটার সামনে রেখে দিয়ে আবার সরে গেল দূরে।

'লবণ খুব ভালবাসে ওরা,' জীপের কাছে ফিরে এসে গোয়েন্দাদের জানাল সে। 'কয়েক ঘণ্টার জন্যে চলে যাব আমরা এখন। আবার যখন আসব, দেখা যাবে এক কণা লবণও নেই।'

চোদ্দ

গাড়ি চালিয়ে এসে একটা ছায়া ঢাকা জায়গা খুঁজে বের করল ওরা। তারপর সঙ্গে করে আনা খাবার দিয়ে লাঞ্চ করতে বসল। খাওয়া শেষ করে আবার ফিরে গেল পিঁপড়ের ঢিপির কাছে। সমস্ত লবণ খেয়ে শেষ করে ফেলেছে শিম্পাঞ্জীটা। পিপাসায় পাগল হয়ে উঠেছে।

'এবার ওকে ছেড়ে দেব,' আমু জানাল। 'কাছের ঝর্ণাটার কাছে আমাদের নিয়ে যাবে ও।'

দড়ি খুলে দিল আমু। কোন দিকে না তাকিয়ে ছুটতে শুরু করল শিম্পাঞ্জীটা ঝর্ণার কাছে নিয়ে চলল ওদের। একবারের জন্যেও ফিরে তাকাল না।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছে কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঙড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল।

'ঝর্ণাটা ওখানেই আছে!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল আমু।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' কিশোর বলল। 'এবার কুকু সম্পর্কে আপনার ধারণা ঠিক হলেই বাঁচি।'

পাথরের চাঙড়ের মাঝের ফাঁক পেরোনোর জন্যে মাথা নামিয়ে ফেলতে হলো ওদের। চাঙড়ের ওপরটা গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলেছে। অন্যপাশে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল পাথরের বেড়ের মাঝখানে অল্প একটু খোলা জায়গা। মাঝখানে একটা খুদে ডোবা। নিচে থেকে ফিনকি দিয়ে পানি বেরিয়ে আসছে ওটাতে। শিম্পাঞ্জীটা এতই তৃষ্ণার্ত, কোনদিকে তাকানোর সময় নেই ওর। পানির কাছে গিয়ে সোজা মুখ ডুবিয়ে খেতে শুরু করল। তবে যেটা দেখার বিষয় তা হলো আরও গোটা তিরিশেক শিম্পাঞ্জী জটলা করছে ওখানে। চিৎকার, চেঁচামেচি, হট্টগোল। মানুষের গন্ধ পেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে।

'ভয় পেয়ো না,' চাপা স্বরে বলল আমু। 'হামলা চালাবে না। চেঁচামেচি করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে শুধু।'

শিম্পাঞ্জীগুলোর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কিশোর, ওগুলোর মাঝে কোন্‌টা কুকু? একটা টিলার কাছে বসে থাকা কয়েকটা বয়স্ক জানোয়ারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ওরা। কারণ কুকু যদি বেঁচে থাকে তার এখন অনেক বয়েস হওয়ার

কথা।

'কুকু!' চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল কিশোর। নামটা নিশ্চয় মনে পড়বে শিম্পাঞ্জীটার। 'কুকু! কুকু!'

কিন্তু একটা শিম্পাঞ্জীও সাড়া দিল না। মানুষ দেখে সব ক'টা অস্বস্তিতে ভুগছে। কোনটাকেই পোষা মনে হলো না, সব বুনো। চেঁচামেচি, কিচিরমিচির করেই চলেছে। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত ঝাঁকিয়ে তাড়াতে চাইছে অনুপ্রবেশকারীদের।

'দেখো! দেখো!' আচমকা একটা জানোয়ারের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'হাতে কি ওটা? আঙটি না!'

আলাদা হয়ে একটা পাথরের ওপর বসে আছে শিম্পাঞ্জীটা। কড়ে আঙুলে আঙটির মত একটা জিনিস।

'মারিসা কি বলেছিল মনে পড়ে?' চিৎকার করে বলল রবিন। 'কুকু তার একটা আঙুল কামড়ে কেটে নেয়। আঙুলে পরা ছিল তার বাবার উপহার দেয়া একটা আঙটি। বানর গোষ্ঠীর সব প্রাণীই মানুষকে নকল করতে ভালবাসে। মারিসার দেখাদেখি আঙটিটা কড়ে আঙুলে পরে ফেলেছে সে। পরে আর খুলতে পারেনি। ওভাবেই রেখে দিয়েছে।'

'ঠিক বলেছ!' একমত হয়ে বলল কিশোর।

সাবধানে ধীরে ধীরে শিম্পাঞ্জীটার দিকে এগোতে শুরু করল দুজনে। বার বার কুকুর নাম উচ্চারণ করতে লাগল মোলায়েম স্বরে।

কিন্তু সাড়া দেয়ার বদলে লাফ দিয়ে টিলার ওপরে উঠে পালানোর চেষ্টা করল জানোয়ারটা।

'দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' কিশোর বলল। 'মুসা, জীপ থেকে মারিসার দেয়া রুমালগুলো নিয়ে এসোগে তো। আমার ব্যাগে আছে। গন্ধ শুঁকে শিম্পাঞ্জীটা চিনেও ফেলতে পারে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল মুসা। হলুদ কাপড়ের টুকরোগুলো কিশোরকে দিয়ে বলল, 'নাও।'

একটা রুমাল নিয়ে দলা পাকিয়ে টিলার দিকে ছুঁড়ে মারল কিশোর। প্রথমে ওটা ছোঁয়ার সাহস করতে পারল না শিম্পাঞ্জীটা। কৌতূহল ঠেকাতে না পেরে অবশেষে তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরল। বার বার শুঁকতে লাগল। আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল ওটার চোখে।

'আই কুকু!' ডাক দিল আমু। তার নিজের চোখও জ্বলছে। আনন্দে। 'আই কুকু!'

পনেরো

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। বুনো জানোয়ারের বন্যতা বাদ দিয়ে আচমকা পোষা সুবোধ প্রাণীতে পরিণত হলো শিম্পাঞ্জীটা। যেন অনুমান করে ফেলল শিম্পাঞ্জীটা

তাকে মারিসার কাছে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা। বাধা তো দিলই না আর, সাগ্রহে হাঁটতে শুরু করল। মুসার হাত ধরে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে এল জীপের কাছে।

'কুকু তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছে,' হেসে উঠল আমু। 'তোমাকে বন্ধু মনে করেছে।'

'জন্তু-জানোয়ারেরা বোঝে, কাকে পছন্দ করতে হবে,' হেসে আমুর কথার জবাব দিল মুসা।

গাড়িতে উঠল সবাই।

কিশোর বলল, 'দেরি না করে গাড়ি ছাড়ো। এতক্ষণ তো নিরা' দেই থাকলাম। কোন্ সময় না জানি আবার হাজির হয়ে যায় টোটারা।'

পশ্চিম মুখো গাড়ি চালাল মুসা।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল হাম্বরুর আস্তানায়। শিম্পাঞ্জীটাকে দেখে খুশি হলো হাম্বরু। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান করতে বসে গেল।

'তোমাদেরকে অবশ্যই নানুঙ্গুর ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে, কুকুকে নিয়ে,' তিন গোয়েন্দাকে বলল হাম্বরু। 'ভান করবে যেন বহু কষ্টে মরুভূমি পেরিয়ে ক্যাম্পে পৌছেছ। নানুঙ্গুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না। খেয়াল রাখবে কুকুর সাথে নানুঙ্গুর দেখা হওয়ার সময় যেন মারিসা আর সৈন্যদের নজর থাকে ওদের ওপর। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল তিন গোয়েন্দা।

'আমার লোকজন নিয়ে কাছাকাছিই থাকব আমি,' হাম্বরু বলল। 'যতটা পারা যায়, সাহায্য করব আমরা। তবে মনে রাখবে, নানুঙ্গুর লোকবল আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।'

দেরি করার কোন মানে হয় না আর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করার তাগিদ অনুভব করল হাম্বরু। তার লোকদের রাইফেল পরিষ্কার করার আদেশ দিল। তিন গোয়েন্দাকে আরেকবার ভাল করে বুঝিয়ে দিল কি কি করতে হবে।

আমুকে 'গুড-বাই' জানিয়ে কুকুকে নিয়ে পর্বতের দিকে রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। জীপে ওদের সঙ্গে চলল হাম্বরু। তার বাহিনী চলল পদব্রজে।

পর্বতের গোড়ায় যখন পৌছুল জীপ, রাত নামছে তখন, দ্রুত নেমে যাচ্ছে তাপমাত্রা। আঁকাবাঁকা রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। এটা দিয়েই আগের বার নানুঙ্গুর ক্যাম্পে গিয়েছিল ওরা।

'বাকি পথটা হেঁটে যেতে হবে তোমাদের,' প্রথম শৈলশিরাটার ওপরে উঠে তিন গোয়েন্দাকে বলল হাম্বরু। 'জীপ নিয়ে আর নিরাপদে এগোতে পারবে না। দিন-রাত রাস্তা পাহারা দেয় নানুঙ্গুর স্কাউট বাহিনী। রাস্তা ধরে না এগিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে আড়াআড়ি চলে যাও। দ্বিতীয় শিরাটা পেরোলে একটা গিরিপথ দেখতে পাবে। সেটা দিয়ে দক্ষিণে এগোবে। তিন-চার মাইলের মধ্যেই নানুঙ্গুর ক্যাম্পের দেখা পাবে। তাড়াহুড়া কোরো না। ধীরে-সুস্থেই এগোও। আমার লোকজনদের গিয়ে পৌছানোর সময় দিতে হবে।'

'আপনার লোকেরা জায়গামত পৌছাল কিনা, কি করে জানব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তা জানার কোন উপায় নেই। সঙ্কেত দেয়া বিপজ্জনক। তবে তোমরা ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে আমরাও কাছে চলে যাব। খুব বেশি তাড়াহুড়া কোরো না, তাহলেই হবে।'

মুসার হাত ধরে হেঁটে চলল কুকু। অন্ধকারে কিচিরমিচির করতে করতে চলল। ঠেকানো যাচ্ছে না ওকে। শব্দ করেই চলেছে। অন্ধকারকে ওর বড় ভয়। হঠাৎ করে যদি আর এখন এগোতে না চায় শিম্পাঞ্জীটা কিছুই করার থাকবে না ওদের। ভাগ্য ভাল, সে-রকম কিছু করল না। পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে এসে গিরিখাতে ঢুকল ওরা।

'এসে গেছি,' নানুঙ্গুর ক্যাম্পের কিনারে পৌঁছে বলে উঠল মুসা। 'খোদাই জানে কি ঘটবে এখন।'

সবে মাত্র রাতের খাওয়া শেষ করেছে নানুঙ্গুর বাহিনী। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আরাম করছে। এ সময় জঙ্গল থেকে টলতে টলতে এমন ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন, যেন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে বহু কষ্টে এসে পৌঁছেছে। কুকুকে নিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইল মুসা। সময় মত বেরোবে।

একটা চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছিল কিশোর, সফল হলো একশো ভাগ। নাটকীয় ভঙ্গিতে মাটিতে পড়ে গেল সে আর রবিন। চমৎকার অভিনয়। মুহূর্তে ওদেরকে ঘিরে দাঁড়াল জনা পঞ্চাশেক লোক।

'কি, হচ্ছে কি এখানে?' বোমার মত ফেটে পড়ল একটা গমগমে কণ্ঠ।

এদিক ওদিক ছিটকে সরে গেল সৈন্যরা। ভিড়ের ভেতরে এসে ঢুকল নানুঙ্গু।

'তোমরা!' প্রচণ্ড বিস্ময় চাপা দিতে না পেরে চিৎকার করে উঠল সে। মাটিতে পড়ে কাতরাতে থাকা দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে আছে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। 'কোত্থেকে এলে তোমরা?'

'আপনার গাইড আমাদের কাছ থেকে হীরাগুলো কেড়ে নিয়ে মরুভূমিতে মরার জন্যে ফেলে এসেছিল,' জবাব দিল রবিন। 'পানি! পানি!'

রাগের ভান করে চিৎকার করে উঠল নানুঙ্গু। 'ওকে আমি গুলি করে মারব!' সৈন্যদের দিকে ফিরে আদেশ দিল সে। 'যাও, যা বললাম করো ওকে!'

কয়েকজন সৈন্য ধরাধরি করে কিশোর আর রবিনকে নিয়ে এল নানুঙ্গুর তাঁবুতে।

'মারিসা কোথায়?' খসখসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, যেন মারা যেতে আর দেরি নেই।

'ঘুমাচ্ছে,' আচমকা কর্কশ হয়ে উঠল নানুঙ্গুর কণ্ঠস্বর। 'পরে দেখা হবে।'

ঝোপের মধ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে কিশোর আর রবিনকে তুলে নিয়ে যেতে দেখল মুসা। কিন্তু মারিসা কোথায়? ওকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

কিশোরের ধারণা ছিল, হই-চই শুনে নানুঙ্গুর সঙ্গে মারিসাও বেরিয়ে আসবে। ও না এলে প্ল্যান মত কাজ করা যাবে না। কারণ মারিসাকে দেখলেই কেবল কুকুকে নিয়ে বেরোনোর কথা মুসার। মারিসা তার পোষা শিম্পাঞ্জীটাকে চিনতে পারবে। নানুঙ্গুকে দেখে প্রতিক্রিয়া হবে কুকুর মধ্যে। তাতে জেনারেল নানুঙ্গুকে অপরাধী প্রমাণ করা যাবে ওমাঙ্গাভক্তদের কাছে।

কিন্তু মারিসাকে দেখা গেল না!

অস্বস্তি বাড়ছে মুসার। হাম্বরু আর তার সৈন্যদেরও পাত্তা নেই। কুকুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কি করব আমরা এখন, বল্ তো?'

কোন একটা গোলমাল হয়ে গেছে বুঝতে পারল বুদ্ধিমান প্রাণীটা। অস্বস্তিতে কিচিরমিচির শুরু করল আবার। নানুঙ্গুর ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে আছে।

'জানি জানি,' মাথা দোলাল মুসা। 'কি ভাবছিস, বুঝতে পারছি।'

তাঁবুর ভেতরে নতুন ফন্দি আঁটছে তখন কিশোর আর রবিন। চোখের ইঙ্গিতে একে অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা করছে কি করতে হবে। ওরা জানত, গোপনে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইবে নানুঙ্গু। দুই গোয়েন্দাকে তাঁবুতে এনে খাটিয়ায় শোয়ানো হলে সৈন্যদের বেরিয়ে যেতে হুকুম দিল সে।

'তোমাদের কালটুস বন্ধুটা কোথায়?' পানি খেয়ে গোয়েন্দারা সুস্থির হতেই জিজ্ঞেস করল নানুঙ্গু।

ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন এখনও কিশোর। এক চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। প্রলাপ বকতে লাগল, 'মরুভূমিতে,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'আসতে পারেনি...মারা গেছে।'

'তাই নাকি? সত্যি আমি দুঃখিত,' দুঃখ পাওয়ার ভান করে বলল নানুঙ্গু, মনে মনে যে হাসছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না দুই গোয়েন্দার। 'তোমাদের অবস্থা মনে হচ্ছে তার চেয়ে সামান্য ভাল।'

লম্বা হয়ে খাটিয়ায় পড়ে আছে রবিন। হাত-পা নাড়াতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল তার খাটিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জেনারেল। গুঙিয়ে উঠল, 'পানি! পানি!'

তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল নানুঙ্গু। রবিনের মুখের কাছ থেকে তার হাঁটু মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। ক্যানটিনের মুখ কাত করে ধরল রবিনের ঠোঁটের ওপর। কিন্তু পানিটা নিল না রবিন। তার বদলে হাতটা লাফিয়ে উঠল ছোবল হানা গোখরোর মত। নানুঙ্গুর কব্জি ধরে জুজিৎসুর কায়দায় প্রচণ্ড এক মোচড় মারল।

নানুঙ্গু চিৎকার করে ওঠার আগেই লাফ দিয়ে খাটিয়া থেকে নেমে পড়ল কিশোর। ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল নানুঙ্গুর ওপর। তার অন্য হাত মুচড়ে ধরে নিয়ে এল পিঠের ওপর। দু'জনে মিলে উপুড় করে ফেলে দিল তাকে মাটিতে। পেছন দিকে হাত মুচড়ে ধরে রাখায় নড়তে পারল না জেনারেল। তার মুখে হাত চাপা দিল রবিন, যাতে চিৎকার করতে না পারে। এত দ্রুত ঘটিয়ে ফেলল ওরা ঘটনাটা, বাধা দেয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ পেল না জেনারেল। তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল চোখে মুখে। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা শুরু করল।

'মারিসাকে কি করেছেন?' কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ওর ঘুমানোর কথা বিশ্বাস করি না আমি। আপনার কোন কথাই বিশ্বাস করি না। সত্যি কথা বলবেন এখন থেকে। গার্ডরা এসে বাঁচাবে আপানাকে, ভুলেও ভাববেন না। তার আগেই ইতিহাস হয়ে যাবেন আপনি। কি, বোঝা গেছে?'

নানুঙ্গুর এক হাতের কব্জি অকেজো করে দিয়েছে রবিন। অন্য হাতটা চেপে ধরে রেখেছে কিশোর। ঘাড়ের একটা বিশেষ জায়গা আঙুল দিয়ে টিপে ধরল

রবিন। এটাও জুজিৎসুর কায়দা। চাপ বাড়িয়ে সহজেই মেরে ফেলতে পারে লোকটাকে।

সেটা নানুঙ্গুও বুঝতে পারছে। মুখের ওপর চাপা দেয়া হাতটা রবিন সরিয়ে নিলে বলল, 'আমি…আমি তো বলেছি, সে ঘুমাচ্ছে!' বেকায়দা ভঙ্গিতে থেকে হাঁসফাঁস করছে জেনারেল। 'তোমরা কি করছ, কেন করছ, বুঝতে পারছি না। তবে কথা দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দিলে শাস্তি দেব না তোমাদের। কিছুই করব না। ছেড়ে দাও এখন। আমিও সব ভুলে যাব।'

হাতের চাপ শক্ত করল আরও কিশোর। আঙুলের চাপ বাড়াল রবিন।

গুঙিয়ে উঠল জেনারেল।

'মারিসাকে কি করেছেন!' বরফের মত শীতল শোনাল কিশোরের কণ্ঠ।

ঠিক এই সময় ভোঁতা একটা থাপ্ থাপ্ শব্দ শোনা গেল তাঁবুর এক কোণ থেকে। যেখানে তেরপল আর গোলাগুলির বাক্স স্তূপ করা রয়েছে।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি একা আটকে রাখতে পারবে?'

মাথা কাত করল রবিন, 'পারব।'

কিশোর নানুঙ্গুর যে হাতটা ধরে রেখেছিল, সেটা ধরল এখন রবিন। ঘাড়ের কাছ থেকে আঙুল সরায়নি।

দেখার জন্যে উঠে গেল কিশোর। জিনিসপত্রগুলো সরাতে শুরু করল। নিচের দিকে বড় লম্বা একটা বাক্স দেখল। শব্দ আসছে সেটার ভেতর থেকে।

'মারিসা!'

জবাবে আবার শব্দ শোনা গেল বাক্সের ভেতর থেকে। ডালা তুলতেই দেখা গেল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার ভেতর পড়ে আছে মারিসা। মুখে কাপড় গোঁজা, যাতে চিৎকার করতে না পারে। ভাগ্যিস বাক্সে বাতাস ঢোকার পথ আছে, নইলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত মারিসা।

তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে বাক্স থেকে বের করে আনল কিশোর। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে মারিসার। হাত দিয়ে ডলে বাঁধনের জায়গাগুলোতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগল।

নানুঙ্গুর ঘাড়ে আঙুলের চাপ বাড়াল রবিন। নানুঙ্গু গুঙিয়ে উঠতেই বলল, 'ঘুমাচ্ছে, তাই না? শয়তান কোথাকার! এই মুহূর্তেই তোমাকে খতম করে দিতে পারলে খুশি হতাম আমি।'

মারিসার দড়িটা ব্যবহার করেই দ্রুত হাতে নানুঙ্গুকে বেঁধে ফেলল ওরা। মুখে কাপড় গুঁজে দিল। এতক্ষণে কথা বলার মত অবস্থা হলো মারিসার। 'ধন্যবাদ,' গলা কাঁপছে ওর। 'আমি ভেবেছিলাম, আমি শেষ, আর কোনদিন বেরোতে পারব না বাক্স থেকে।'

একটা খাটিয়ায় বসে পড়ল সে।

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল রবিন।

'তোমরা চলে যাওয়ার পর নানুঙ্গুর ব্যাপারে সন্দেহ জাগল আমার,' মারিসা জানাল। 'ওর জিনিসপত্র ঘেঁটে বের করে ফেললাম রত্নখচিত ছুরিটা। যেটা দিয়ে আমার বাবাকে খুন করেছে। দেখেই চিনেছি।'

'তাকে ছুরিটার কথা জিজ্ঞেস করেই এই বিপদে পড়েছ, তাই না?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। এখানকার সৈন্যদের চোখ এড়িয়ে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল আমাকে। দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে খুন করত।' কৌতূহলী চোখে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু তোমরা ফিরে এলে কেন?'

সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না। যে কোন মুহূর্তে তাঁবুর ভেতর উঁকি দিতে পারে নানুঙ্গুর লোক। বিপদে পড়ে যাবে তাহলে। কিন্তু মারিসার রক্ত চলাচল স্বাভাবিক না হলে পালাতেও পারছে না। গত দুদিনে কি কি ঘটেছে সংক্ষেপে তাকে জানাল দুই গোয়েন্দা। আমুর কথা বলল, হাম্বরুর কথা বলল, কুকু'র কথা বলল।

'কুকুকে সত্যি পেয়েছ!' হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মারিসার মুখ।

'ক্যাম্পের বাইরে এখন মুসার সঙ্গে বসে আছে ও,' জানাল কিশোর। 'হাম্বরু আর তার বাহিনীও নিশ্চয় চলে এসেছে এতক্ষণে।'

মাথা কামানো জেনারেলের দিকে তাকাল সে। ওদের সব কথাই শুনতে পেয়েছে। নড়তেও পারছে না, চিৎকারও করতে পারছে না, কেবল চোখের আগুনে ওদের ভস্ম করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

'একে কি করবে?' নানুঙ্গুকে দেখাল মারিসা। গায়ে কাঁটা দিল তার। 'এখানে ফেলে যাবে?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'উঁহু। সঙ্গে নিয়ে যাব। জিম্মি হিসেবে। এখান থেকে আমাদের জ্যান্ত বেরোতে হলে ওকে ব্যবহার করা ছাড়া গতি নেই। সৈন্যদের বোঝাতে হবে, আসল অপরাধী কে।'

'কিন্তু ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে?' মারিসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'যদি করেও, নানুঙ্গুর বিরুদ্ধে যেতে চাইবে? ওদের অর্ধেকই তো ভাড়াটে সৈন্য।'

জ্বলে উঠল নানুঙ্গুর চোখ। আশার আলো দেখতে পেয়েছে। বুঝে গেছে, ওদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গোলাগুলির বাক্সের কাছ থেকে একটা পিস্তল বের করে নিয়ে এল কিশোর। জেনারেলের কামানো মাথায় সেটার নল ঠেসে ধরে রবিনকে বলল পায়ের বাঁধন আর মুখের কাপড় খুলে দিতে।

খুলে দেয়া হলো।

'নিন, উঠুন,' আদেশের সুরে বলল কিশোর। 'কিছু করলে খুলি ফুটো করে দেব, মনে রাখবেন। হাঁটুন!'

আগে আগে চলল মারিসা। তার পেছনে জেনারেলকে বের করে নিয়ে এল কিশোর আর রবিন। চত্বরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

ষোলো

কি করবে প্রথমে বুঝতেই পারল না সৈন্যরা। খাওয়া মাত্র শেষ করেছে কাঁচকলা ভাজা আর টিনে ভর্তি হ্যাশ দিয়ে। কুচি করে কাটা মাংস আর সব্জী মিশিয়ে হ্যাশ তৈরি করা হয়। অনেকে এখনও বাসন-পেয়ালা ধুতে ব্যস্ত। অন্যরা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশ ঘিরে আরাম করে বসে কফি খাচ্ছে। ঘটনাটা চমকে দিল সবাইকে। তাকিয়ে আছে জিম্মি হওয়া জেনারেলের দিকে। বিশ্বাস করতে পারছে না। গুঞ্জনটা ধীরে ধীরে শুরু হলো। তারপর বোমা বিস্ফোরণের মত ছড়িয়ে পড়ল আচমকা। যার হাতে যা ছিল সব ফেলে দিয়ে রাইফেল হাতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সৈন্যরা। ঘিরে ফেলল গোয়েন্দাদের। কয়েক ডজন উদ্যত রাইফেলের নল চেয়ে আছে ওদের দিকে।

'গুলি কোরো না! গুলি কোরো না!' চিৎকার করে উঠল মারিসা। 'আমি বলছি সব!'

'গুলি করো! এক্ষুণি! ওরা গুপ্তচর!' চিৎকার করে উঠল নানুঙ্গু। রবিনের হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘাড়ের পেছনে কিশোরের পিস্তলের গুঁতো খেয়ে থেমে গেল।

দীর্ঘ একটা উত্তেজনাকর মুহূর্ত দম আটকে দাঁড়িয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। গুলিতে ঝাঁজরা হওয়ার অপেক্ষায়।

কিন্তু কেটে যাচ্ছে সময়। গুলি করল না সৈন্যরা। তবে রাইফেলও নামাল না।

মারিসা বুঝতে পারছে, সময় খুব কম, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওদের বোঝাতে হবে। উঁচু করে ধরল ছুরিটা। আগুনের আলোয় ঝলমল করে উঠল রত্নগুলো। 'এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে আমার বাবাকে!' সৈন্যদের শুনিয়ে চিৎকার করে বলল সে। 'আমি দেখেছি। ওই সময় আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম।'

'মিথ্যে কথা বলছে!' ষাঁড়ের মত গোঁ-গোঁ করে উঠল জেনারেল।

'না, মিথ্যে আমি বলছি না!' সমান তেজে জবাব দিল মারিসা। 'বাবার বেডরুমে আমাকেও খুন করতে চেয়েছিল সে। মুখে মুখোশ পরা ছিল বলে চিনতে পারিনি তখন। কিন্তু ছুরিটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। এটাই সেই ছুরি, যেটা দিয়ে আমাকেও খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটা কার ছুরি জানো? নানুঙ্গুর।'

রাগত গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে। মারিসা তার কাহিনী যতই এগিয়ে নিয়ে গেল, ততই রাগ বাড়তে লাগল ওদের। দুই দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা। একদল বিশ্বাস করছে মারিসার কথা। আরেক দলের কে ওমাঙ্গাকে খুন করল বা না করল তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা বাড়ছে। ভয়ঙ্কর সে-রাতের কথা বলেই যাচ্ছে মারিসা।

'হাম্বরু খুন করেনি ওমাঙ্গাকে,' ছুরিটা মাথার ওপর তুলে নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে বলল মারিসা। 'করেছে এই লোকটা! এই নানুঙ্গু! ব্যবহার করা হয়েছে

এই ছুরিটা! ওর তাঁবুতে খুঁজে পেয়েছি আমি। ওমাঙ্গাভক্ত বলে তোমাদের সঙ্গে এতদিন মিথ্যে কথা বলে এসেছে নানুঙ্গু। ক্ষমতার প্রতি প্রচণ্ড লোভ ছিল ওর। সে-জন্যে প্রথম সুযোগেই সরিয়ে দিয়েছিল প্রেসিডেন্টকে। জিবুয়া আর এর জনসাধারণের প্রতি কোন দরদ নেই ওর। যত আকর্ষণ প্রেসিডেন্টের চেয়ার। আমাকে আর তোমাদের ব্যবহার করে গদি দখলের ধান্দায় ছিল ও।'

যারা দ্বিধার মধ্যে ছিল, মারিসার এই শেষ কথাটার পর তারাও রইল না আর। ফেটে পড়ল সমস্ত ক্যাম্প। একসঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিল সকলে। বাদ-প্রতিবাদ শুরু হলো। পলকে এক দল আরেক দলের শত্রু হয়ে গেল। বন্দুক তুলে ধরল একে অন্যের প্রতি। অফিসার, সাধারণ সিপাহী–কেউ কারও কথা শুনতে চাইছে না।

ঠিক এই সময় বিচিত্র একটা অমানবিক চিৎকার চিরে দিল যেন রাতের আকাশ।

শব্দের দিকে ঘুরে গেল সবগুলো চোখ। বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল কুকু আর মুসাকে।

আবার চিৎকার দিয়ে নানুঙ্গুর দিকে ছুটে এল শিম্পাঞ্জীটা। ওটার ক্ষিপ্ততা দেখে অবাক হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। প্রায় উড়ে এসে পড়ল জেনারেলের গায়ে। এমন ভাবে আঁচড়ানো খামচানো শুরু করল, নানুঙ্গুকে বাঁচানোই এখন দায় হয়ে পড়ল গোয়েন্দাদের জন্যে।

'কুকু!' চিৎকার করে উঠল মারিসা। 'থাম! কুকু! থাম!'

মারিসার গলা শুনে থমকে গেল শিম্পাঞ্জীটা। নানুঙ্গুকে ছেড়ে দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল মারিসার দিকে। জড়িয়ে ধরে আনন্দে কিচিরমিচির শুরু করে দিল শিম্পাঞ্জীর ভাষায়।

'এবার বুঝলে তো? কুকুও চিনতে পেরেছে খুনীকে,' সৈন্যদের বলল মারিসা। যদি তোমরা তোমাদের দেশকে ভালবাস, দেশের মানুষকে ভালবাস, তাহলে এখনই গ্রেফতার করো এই বেঈমানকে!' নানুঙ্গুর দিকে আঙুল তুলল মারিসা। 'এই নির্দয় খুনীকে!'

'শুনো না, শুনো না! ওর কথা শুনো না!' হই-হট্টগোলকে ছাপিয়ে শোনা গেল একটা নতুন চিৎকার। 'এখুনি গুলি করো ওদের!'

পরিচিত কণ্ঠ শুনে ফিরে তাকাল মুসা। সৈন্যদের ভিড়ে চোখে পড়ল বাটুকে। রাইফেল তুলেছে মারিসাকে লক্ষ্য করে।

এক ধাক্কায় কুকুকে সহ মারিসাকে নিয়ে মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসা।

একটা মাত্র গুলির শব্দ হলো। ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল গুলিটা।

এরপর আরও গুলির শব্দ। বেধে গেল লড়াই। দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে মাঙ্গাভক্ত আর মার্সেনারিরা। একে অন্যকে আক্রমণ করে গুলি চালাচ্ছে।

এ সময় জঙ্গলের দিক থেকেও গর্জে উঠল একাধিক রাইফেল। হাম্বরুর বাহিনীও হাজির হয়ে গেছে।

হাম্বরুর চিৎকার শোনা গেল, 'কিশোর, পালিয়ে এসো তোমরা! জলদি!'

মাথা নিচু করে এঁকেবেঁকে দৌড় দিল কিশোর। নানুঙ্গুকে ছেড়ে দিয়ে রবিন

ছুটল তার পেছনে। মারসাকে টেনে নিয়ে দোড়াচ্ছে মুসা। লাফাতে লাফাতে চলেছে কুকু।

নিরাপদেই বনের ভেতরে পৌঁছে গেল ওরা। গাছের আড়ালে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

মুসা বলল, 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না গোলাগুলি এড়িয়ে জ্যান্ত পালাতে পেরেছি! আমাদের কভার করে না রাখলে পারতাম না। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, হাম্বরু।'

'ধন্যবাদটা তো আসলে তোমাদের দেয়া উচিত আমার,' হাম্বরু বলল কৃতজ্ঞ কণ্ঠে। 'চিরকালের জন্যে আমার দেশের হীরো হয়ে গেলে তোমরা। ইতিহাস। কিন্তু এখন তো তোমাদের যেতে হয়। পালাও সময় থাকতে থাকতে। এটা তোমাদের লড়াই নয়। যা করেছ অনেক বেশি। পাহাড়ের গোড়ায় গেলে জীপটা পাবে। আমু বসে আছে তাতে। টোটাদের অলক্ষে পৌঁছে দেবে তোমাদের গাড়ির কাছে।'

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তার বাহিনী নিয়ে নানুঙ্গুর ক্যাম্প আক্রমণ করতে ছুটল হাম্বরু। পুরোদমে যুদ্ধ চলছে এখন।

'এসো!' মারিসার হাত ধরে টান দিল মুসা। 'গুলি খাওয়ার আগেই পালাই।'

'না, আমি যাব না,' যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চোখ রেখে জবাব দিল মারিসা। 'হাম্বরুর মতই এ লড়াই আমারও লড়াই। আমাকেও যেতে হবে।'

আস্তে করে মুসার হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। এক এক করে তাকাল কিশোর, মুসা, রবিনের দিকে। নিচের চত্বর থেকে আসা আগুনের আভায় চকচক করছে তার চোখ। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, তিন গোয়েন্দা। তোমাদের কথা কখনও ভুলব না আমি।'

'আমরাও মনে রাখব,' বলল আবেগে আপ্লুত মুসা। 'আশা করি ওমাঙ্গাভজদেরই বিজয় হবে।'

'তা তো নিশ্চয়,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল মারিসা। 'দেশের পক্ষে যারা থাকে, বিজয় শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগেই আসে।'

এক এক করে ওদের সঙ্গে হাত মেলাল মারিসা।

মারিসাকে এ ভাবে বিপদের মুখে ফেলে যেতে ইচ্ছে করল না তিন গোয়েন্দার। ওরাও লড়াইয়ে অংশ নেয়ার জন্যে চাপাচাপি শুরু করল।

কিন্তু মানল না মারিসা। বলল, 'দেখো, আমাদের লড়াই আমাদেরকেই করতে দাও। লড়াই করতে গিয়ে যদি তোমাদের একজনও মারা পড়ো, কোনদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না আমি। যাও!' একটানে মুসার হাত ধরে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিল সে।

কিশোর বলল, 'এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের। আমাদের ওরা থাকতে দেবে না।'

আদর করে কুকু'র পিঠ চাপড়ে দিল মুসা। কুকুও তাকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাল। মারিসার মতই তাকেও পছন্দ করে ফেলেছে শিম্পাঞ্জীটা।

আর একটাও কথা না বলে কুকুকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়ে গেল

মারিসা।

দুই সহকারীকে নিয়ে উল্টো দিকে পা বাড়াল কিশোর।

বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। পেছনে গোলাগুলির শব্দ।

মুসাকে বিষণ্ন দেখে তার মন ভাল করার জন্যে কিশোর বলল, 'জন্মদিনে একটা শিম্পাঞ্জী যদি উপহার দিই তোমাকে, কেমন হয়?'

'কুকুকে তো আর এনে দিতে পারবে না,' হাসি ফুটল না মুসার মুখে। 'ওর মত শিম্পাঞ্জী আর একটাও খুঁজে পাবে না কোথাও।'

পাহাড়ের ওপরে উঠতে নিচের উপত্যকায় দেখা গেল জীপটাকে। ঢাল বেয়ে নেমে এল ওরা। এগিয়ে এল আমু।

উত্তরে গাড়ি চালাল মুসা। মরুভূমির দিকে। আমুর ওপর গভীর আস্থা এখন তার। জানে, টোটাদের চোখ এড়িয়ে ঠিক বের করে নিয়ে যাবে ওদেরকে শত্রুর সীমানা থেকে।

-: শেষ :-

ভলিউম ৪৭

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০